হেইনরিখ হারের

সেভেন ইয়ার্স ইন টিবেট

বাংলাবুক.অর্গ

'এ এক মনকাড়া ভ্রমণকাহিনি; একই সঙ্গে নিষেধের ঘোমটায় ঢাকা একটা জনপদের জীবনধারা, আচার এবং রীতির বিশ্বস্ত বর্ণনা।'

- সানডে টাইমস

হেনরিক হারের [হা], বিখ্যাত পর্বতারোহী এবং অলিম্পিক স্কি চ্যাম্পিয়ন, ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার মুহূর্তে আকাশছোঁয়া হিমালয় টপকাচ্ছেন। জাতে অস্ট্রিয়ান হওয়ায় ইংরেজরা ভাবতে বন্দি করল তাঁকে। অমানুষী চেষ্টার পর বন্দি শিবির থেকে বারবার পালালেন তিনি এবং পৌঁছালেন তিব্বতের রাজধানী, নিষিদ্ধনগরী লাসা। পশ্চিমা দুনিয়া থেকে তিনিই প্রথম পা রাখলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের এই পবিত্রভূমিতে।

সাত বছর ধরে ওদের ভাষা শিখলেন হারের, জয় করলেন তিব্বতীদের মন। তবে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি শিশু দালাই লামার বন্ধু এবং শিক হিসেবে স্বীকৃতি। সবশেষে লালচিন হামলা করায় ভারতে পালাবার সময় তাঁর সফরসঙ্গীও হলেন হারের। অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনি; সমৃদ্ধ, রহস্যময় এবং চমকপ্রদ একটা সংস্কৃতির লালনভূমিতে রচিত এক দুঃসাহসিক অভিযানও বটে।

'দু'চারটে বই, দু'চারটে পাহাড়ের মতো, নিঃসঙ্গ এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এটা সেরকম একটা।'

- ইকোনমিস্ট

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সেভেন ইয়ারস ইন তিব্বত

মূল

হেনরিক হারের

রূপান্তর

পুলক হাসান

নাহিদা নাসরিন ছুটি

সম্পাদনা

শেখ আবদুল হাকিম

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আকাশ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০০৮
আকাশ দ্বিতীয় সংস্করণ : একুশে বইমেলা ২০১৭
প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক
ডা. সাদত আলী সিকদার
প্রকাশক
আলমগীর সিকদার লোটন
সুর জাহান পুনম
গ্রন্থস্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

আকাশ
সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্-এর
একটি সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
বিক্রয়কেন্দ্র
৩৪ বাংলাবাজার (২য় তলা)
ঢাকা-১১০০
কম্পোজ : কম্পিউটার ল্যান্ড
৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ
সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্
৩/৬ জনসন রোড, ঢাকা-১১০০
মূল্য : ২৫০ টাকা

প্রতি কপি বই বিক্রির টাকা থেকে আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল ৫ (পাঁচ) টাকা করে অনুদান পাবে।

The Ahsania Misson Cancer Hospital will get a donation of Tk. 5 (Five) from the sale proceeds of each copy of this book.

SEVEN YEARS IN TIBET by Heinrich Harrer,
Translated by Pulok Hasan and Nahida Nasrin Chhuti
Published by Alamgir Sikder Loton and Sur Jahan Punam
Akash (A House of Literary Publication)
38 Banglabazar, Dhaka 1100
Phone : +8801711526970, 01534954537
e-mail : info@akashbooks.com
www. akashbooks.com
USA Distributor : Muktodhara, Jackson Hights, New York
UK Distributor : Sangeeta Ltd. 22 Bricklane. London
Price Taka **250** US$ 15 only

ISBN 984-8728-13-9

উৎসর্গ

প্রিয় ধ্রুব ও অমিয়-কে

THE DALAI LAMA

MESSAGE

Heinrich Harrer and I first met because he and my elder brother, Lobsang Samten, had become good friends and even got up to mischief together. Eventually, I asked him to come and see me on the pretext that he could help me work on the generator for my movie projector. We too soon became good friends.

Now, as we both grow older, we remember those happy days we spent together in a happy country. Harrer was one of the few people living in Lhasa in the twilight years of Tibetan freedom, able to photograph people and scenes from all walks of life. These photographs form a valuable record of Tibet as it was and I am glad that they are being exhibited, so that others may witness the contentment that was ours.

It is a sign of genuine friendship that it does not change, come what may. Once you get to know each other, you retain your friendship and help each other for the rest of your lives. Harrer has always been such a friend to Tibet. His most important contribution to our cause, his book, *Seven Years in Tibet*, introduced hundreds of thousands of people to my country. Even today, he is still active in the struggle for Tibetans' right to freedom and we are grateful to him for it.

মেসেজ

আমার বড় ভাই লবস্যাঙ স্যামটনের খুব ভাল বন্ধু ছিলেন হেনরিক হারের। সেই সূত্রেই ওঁর সাথে আমার পরিচয়। তাঁরা দুজন সারাক্ষণ ছেলেমানুষি দুষ্টামিতে মেতে থাকতেন। একদিন মুভি প্রজেক্টরে কাজ করার সময় জেনারেটারে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় একটা অজুহাত পেয়ে গেলাম হারেরকে ডাকার। এভাবেই শুরু। খুব তাড়াতাড়ি পরস্পরের ভাল বন্ধু হয়ে উঠি আমরা।

এখন আমাদের দুজনেরই বয়স হয়েছে। পুরনো যে সুখময় দিনগুলো আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি তার মধুর স্মৃতি এখনো আমাদের মনে অম্লান হয়ে আছে। তিব্বতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গোধূলিবেলায়, একটানা কয়েকটা বছর, অল্প কজন যারা লাসায় ছিলেন, তাঁদের মধ্যে হারের একজন। লাসার মানুষ এবং জীবনের সবগুলো স্তরের ছবি তুলতে সমর্থ হন তিনি। ওই ছবিগুলো তিব্বতের মূল্যবান দলিল হয়ে ওঠে, এবং আমি আনন্দিত যে এখন ওগুলোর প্রদর্শনীও শুরু হয়েছে–ফলে আমরা যে তৃপ্তিময় পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলাম অন্যেরাও তার সাক্ষি হতে পারছে।

অকৃত্রিম বন্ধুত্বের একটা লক্ষণ হলো, যাই ঘটে যাক, সেটা কখনো বদলায় না। একবার যখন পরস্পরকে জানতে পারবেন, নিজেদের বন্ধুত্ব ধরে রাখবেন আপনারা, তারপর বাকি জীবন প্রয়োজনের সময় সাহায্য করবেন একে অপরকে। হারের চিরকাল তিব্বতের ভাল একজন বন্ধু। আমাদের সংগ্রামে হারেরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান, তাঁর এই বই–'সেভেন ইয়ারস ইন তিব্বত'। কারণ এই বইয়ের জন্যেই হাজার হাজার মানুষ আমাদের তিব্বত সম্পর্কে জানতে পেরেছে। এমন কী আজও, তিব্বতীদের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে সক্রিয় তিনি। সেজন্যে আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

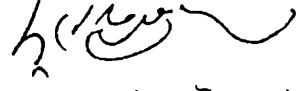

(দালাই লামা)

মুখবন্ধ

তরুণ বয়সেই আমাদের সব স্বপ্ন শুরু হয়। একজন সফল মানুষ কি কি অর্জন করতে পারে তা আমি ছোটবেলাতেই জেনেছি। তবে সেটা বই পড়ে নয়। যারা নতুন ভূমি আবিষ্কারের জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন, কিংবা যে-সব মানুষ খেলাধুলোয় সফলতা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম আর আত্মবিসর্জন দিতে পিছপা হন না, তাঁদের দ্বারা আমি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি। সারাক্ষণ শুধু এই সব সফল মানুষের কথাই ভাবতাম। কল্পনার চোখে নিজেকে তাঁদের জায়গায় দেখতে কি যে ভাল লাগত! এভাবেই, কখন জানি না, আমি আমার জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে ফেলি।

কিন্তু গাইড করবে, এমন কেউ ছিল না আমার। একই সময় বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলোয় মেতে থাকতাম। যার ফলে কোনও খেলাতেই সফলতা অর্জন করতে পারিনি। একসঙ্গে অনেক বিষয়ে মাথা ঘামালে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। ব্যাপারটা বুঝতে বেশ কয়েক বছর নষ্ট হয়ে যায় আমার। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে-চিন্তে মাত্র দুটো ব্যাপারে মনোযোগ দিই—স্কি করা আর পাহাড়ে চড়া। দুটোই আমাকে প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ করে দেয়।

আমার বাল্যকাল কেটেছে আল্পসে। ওই সময় আমি আর দশটা ছেলের মতো স্কুলে যেতাম না। গ্রীষ্মকালটা কাটাতাম পাহাড়ে চড়ে আর শীতে মেতে থাকতাম স্কি নিয়ে। ছোটখাট সাফল্যেই আমি খুব উৎসাহিত বোধ করতাম।

১৯৩৬ সালে অস্ট্রিয়ান অলিম্পিক টিমে ভালো একটা স্থান দখল করেছিলাম। তবে তার আগে আমাকে ট্রেনিং নিতে গিয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়েছে। এক বছর পর 'ওয়ার্ল্ড স্টুডেন্টস চ্যাম্পিয়নশিপ'-এর ডাউনহিল রেসে আমি প্রথম হই।

পাহাড়ে উঠতে গিয়ে একবার ১৭০ ফুট ওপর থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। নিতান্ত ভাগ্যের জোর ছিল, নইলে এতদিনে কবে মরে ভূত হয়ে যেতাম!

এরপর আমি পর্বতারোহণ এবং ভ্রমণ সংক্রান্ত অনেক বই পড়ি। ফলে আর সব পর্বতারোহীর মতো আমার মনেও একটা স্বপ্ন জেগে ওঠে: আমি হিমালয় জয় করব।

তবে, না! তার আগে ইগার, আল্পসের উত্তর দিকের পাঁচিলটা আমাকে জয় করতে হবে। কারণ ওটাই হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু আর বিপজ্জনক।

প্রাচীরটার উচ্চতা ৬৭০০ ফুট। পুরোটাই কঠিন পাহাড়ে মোড়া। বহুবার চেষ্টা করা হলেও এখন পর্যন্ত কেউই ওটার চূড়ায় উঠতে পারেনি। ওই চূড়া জয় করতে গিয়ে বহু পর্বতারোহী প্রাণও হারিয়েছেন। পাহাড়টাকে ঘিরে নানারকম লোককাহিনী শোনা যায়। শেষ পর্যন্ত সুইডিশ সরকার পর্বতারোহীদের জন্য ওটাকে নিষিদ্ধ করে।

কিন্তু আমি এই ধরনের একটা পাহাড়ে ওঠার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। জানতাম, উত্তর প্রাচীর টপকাতে পারলে একটা হইচই পড়ে যাবে। যার পুরস্কার হিসাবে আমি হিমালয়ে ওঠবার অভিযানে ডাক পাওয়ার আশা করতে পারি। জানি প্রায় কোনও সম্ভাবনাই নেই, তারপরও অনেকদিন ওই পাহাড়ে ওঠার চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলাম আমি।

অবশেষে ১৯৩৮ সালে তিন বন্ধুকে নিয়ে ইগার উত্তর দিকের দেওয়ালের চূড়ায়

BanglaBook.org

উঠতে সফল হই। আমার লেখা বিভিন্ন বইতে ওই পাহাড়ে চড়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

এই অভিযানের পর পুরো শরৎকাল আমি প্রশিক্ষণে ব্যস্ত ছিলাম। আগামী গ্রীষ্মে নাঙ্গা পর্বতে ওঠার অভিযান শুরু হবে। মনে মনে সবসময় আশা করেছি ডাকা হবে আমাকে। কিন্তু শীত আসার পরও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না। পাহাড়টার কিছু অংশ কাশ্মীরে পড়েছে। খবর পেলাম লোক বাছাই করা হয়ে গেছে, তারা কাশ্মীরে গিয়ে পাহাড়টা জরিপ করবে।

তারপর একদিন আমি যেন আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে গেলাম! স্কির ওপর একটা ছবি বানানো হবে, হঠাৎ তাতে কাজ করার প্রস্তাব দেওয়া হলো আমাকে। কী আশা করেছিলাম আর কী হচ্ছে!

যাই হোক, ছবিটায় কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে তো ভালো। অন্তত কিছুদিন হয়তো দুঃখটা ভুলে থাকতে পারব।

*

পুরোদমে রিহার্সেল চলছে। এইসময় একটা ফোন পেলাম। ভাবতেই পারিনি এটাই হবে সেই বহুল আকাঙ্ক্ষিত ফোন। নাঙ্গা পর্বত অভিযানে ডাকা হয়েছে আমাকে। হাতে সময় খুব কম–মাত্র চারদিন। তারপরই শুরু হবে অভিযান। তখনও ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারিনি এই অভিযানে অংশ নেওয়ায় আমার জীবনের অনেক কিছুই বদলে যাবে।

ঠিক যেভাবে হঠাৎ আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম, একইভাবে আবার আকাশে ওড়ার অনুভূতি হচ্ছে আমার। নিজেকে ভাবনা-চিন্তার সুযোগই দিলাম না। চুক্তিটা বাতিল করে গ্রাজে নিজের বাসায় চলে এলাম। পুরো এক দিন ব্যয় হলো জিনিস-পত্র গোছগাছ করতে। পরদিন পিটার আফশেনেইটর, লুটস্ চিকেন, হ্যানস লুবেনহোফার আর দলের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে অন্তরীপের পথে রওনা হলাম। আফশেনেইটর তো খুশিতে বাগবাগ। অভিযানের দলনেতা করা হয়েছে ওকে।

যাই হোক, আমাদের এই অভিযানে ২৫,০০০ ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের মাথায় চড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত চারবার চেষ্টা করা হলেও, সফল হয়নি কেউই। ইতিমধ্যে প্রাণও হারিয়েছেন অনেকে।

পরিকল্পনা অনুসারে এবার নতুন রাস্তা ধরে উঠতে হবে পাহাড়ে। সেটা খুঁজে নেওয়ার কাজটাও করতে হবে আমাদেরকেই। প্ল্যান করা হয়েছে চূড়া জয়ের যুদ্ধটা শুরু হবে আগামী বছর।

নাঙ্গা পর্বত অভিযানে যাওয়ার পর হিমালয় যেন আমাকে জাদু করল। দৈত্যাকার পাহাড়গুলোর সৌন্দর্য, ওগুলোর ওপর থেকে যে বিশাল এলাকা দেখা যায়, ভারতের বিস্ময়কর মানুষ, সবকিছুই মনে গেঁথে গেছে আমার।

অভিযানে যাওয়ার পর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। কিন্তু আজও এশিয়ার বাঁধন থেকে নিজেকে আমি মুক্ত করতে পারিনি। সব মিলিয়ে ওখানে কি কি ঘটেছে, কী পেয়েছি, কী হারিয়েছি তার সবই এই বইতে লিখেছি। তবে এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। লেখক হিসেবে আমি মোটেও অভিজ্ঞ নই। তাই এখানে নিজের চোখে দেখা ঘটনা নিরলঙ্কার ভাষায় বর্ণনা করেই আমি তৃপ্ত।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

লেখকের কথা

আমি তিব্বত ছেড়ে চলে আসার পর অর্ধ শতাব্দীর বেশি পার হয়ে গেছে।

টানা দুবছর বিভিন্ন গিরিপথ পার হয়ে আমি আর আফশেনেইটর লাসায় পৌঁছাই। কোনও কোনও সময় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ছ'হাজার মিটার উঁচু গিরিপথও পাড়ি দিতে হয়েছে আমাদের। ফ্রস্টবাইট, হাত-পায়ে ফোস্কা, খিদে আর প্রচণ্ড শারীরিক অসুস্থতাকে সঙ্গী করে লাসায় পা রাখি আমরা।

তিব্বত সরকার আমাদেরকে ইন্ডিয়ার সীমান্তে ফিরে যেতে বাধ্য করলে তাতে বিন্দুমাত্র অবাক হতাম না। কারণ বিদেশিদের জন্য তিব্বত একটা নিষিদ্ধ দেশ। বিশেষ করে পবিত্র নগরীতে ঢোকা তো আরও অসম্ভব। যাই হোক, ঘটেছে কিন্তু ঠিক তার উল্টোটা। তিব্বতীরা সহমর্মিতা দেখিয়ে খাবার, গরম কাপড়, আশ্রয় আর কাজ দিয়েছে। নিজেদের সমাজে স্বাগত জানিয়েছে তারা আমাদেরকে।

লাসার আনন্দমুখর পরিবেশে সময় কাটাবার সময় আমরা কেউ ভুলেও ভাবিনি পৃথিবীর ছাদ নামে পরিচিত এই শান্তিপূর্ণ দেশকে বিদায় জানাতে হবে নিষ্ঠুর এক আগ্রাসনের সাক্ষী হয়ে। ১৯৫১ সালে মহাচিনের রেড আর্মি তিব্বতে হামলা করায় দালাই লামা এবং দশ হাজার তিব্বতী ইন্ডিয়ায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

তুষার ঢাকা এই দেশে এরপর যে-সব ঘটনা ঘটেছে তা আক্ষরিক অর্থেই বর্ণনাতীত। ১.২ মিলিয়ন তিব্বতী তাদের বাসস্থান হারিয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে ছ'হাজার পবিত্র ভবনের প্রায় সবগুলো। বলার অপেক্ষা রাখে না, তিব্বতীদের এখন সাহায্য দরকার। এই সাহায্য আসতে হবে যারা তিব্বতকে ভালোবাসে, তিব্বতীদেরকে ভালোবাসে তাদের তরফ থেকে।

অতীতে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য সংস্থাগুলোর লেকচার আর তিব্বতের পুরনো কিছু ছবির প্রচার–এরমধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তিব্বতকে সাহায্য করার চেষ্টা। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু লাভ হয়নি। এখন খুব কম তিব্বতী নির্বাসনে আছে। যুদ্ধের পর বহু বছর কেটে গেলেও, তিব্বতের সেই চিরচেনা রূপ দেখার সৌভাগ্য হয়নি নির্বাসিতদের।

'সেভেন ইয়ারস ইন তিব্বত' বইটা তিব্বতী ভাষায় ছাপানো হওয়ায় আমি গর্ববোধ করি। তাছাড়া বইটার সাহায্য নিয়ে প্রামাণিক চলচ্চিত্রও বানানো হয়েছে। নির্মাতা আমাকে কথা দিয়েছিলেন ছবিতে চিনা আগ্রাসন আর তিব্বতীদের নিদারুণ কষ্টের প্রতিফলন ঘটবে। আর প্রযোজক জান জ্যাকুস অ্যানাউড সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। যে-কোনও খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনায় তিনি একেবারে সিদ্ধহস্ত। তিব্বত ছবিতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে প্রামাণিক চলচ্চিত্রে চিনা আগ্রাসনের বাস্তব চিত্রটা ফুটে উঠেছে।

BanglaBook.org

ছবির শুটিং চলার সময় চিনারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ওপর চাপ দিতে লাগল। তাদের বক্তব্য, ছবির কলা-কুশলীরা প্রতিবেশী দেশগুলো হয়ে তিব্বতে ঢুকছে, এবং এটা তারা কোনওভাবেই মেনে নেবে না।

বাধ্য হয়ে তিব্বতের হিমালয় থেকে আন্দেজে স্থানান্তর করা হলো শুটিং। চিনাদের দানবতুল্য শক্তির বিপরীতে এই কাপুরুষোচিত আত্মসমর্পণ ১৯৯৬ সালে মানবাধিকার সংস্থার হাস্যকার ভূমিকার কথা মনে করিয়ে দেয়। অন্যান্য ছ'টা দেশকে দায়ী করলেও, অজ্ঞাত কারণবশত চিনকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি সংস্থাটি।

তিব্বত ছাড়ার পর আরও অনেক দেশে ঘোরা হয়েছে আমার। কিন্তু এশিয়ার বাঁধন, বিশেষ করে তিব্বতের বাঁধন থেকে নিজেকে আমি মুক্ত করতে পারিনি। তাই প্রতি বছর হিমালয় আছে এমন সব দেশে ঘোরা শুরু করলাম। শুধু তিব্বতের সীমান্ত ছিল আমার জন্য নিষিদ্ধ। তবে এটাকে ভালো চোখেই দেখেছি আমি।

দুটো বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে একজন ব্রিটিশ অফিসার বলেছিলেন এয়ারক্র্যাফট আবিষ্কার হওয়ার পর পৃথিবীর অনেক কিছুই মানুষের সামনে উন্মোচিত হলেও, শেষ একটা রহস্য এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। পৃথিবীর ছাদে অবস্থিত বিশাল একটা দেশ তিব্বত। দেশটা যেন বিস্ময় আর রহস্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। এখানে সন্ন্যাসীরা শরীর থেকে তাঁদের আত্মাকে বের করে সেটাকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখতে পারেন। এবং জাদুকরেরা পারেন ঘটনাপ্রবাহের গতিপথ ঠিক করে দিতে।

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়গুলো চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে তিব্বতকে। এই রাষ্ট্রের শাসক সৃষ্টিকর্তার একজন প্রতিনিধি। লাল পাথরের তৈরি অতুলনীয় সুন্দর একটা দুর্গে বাস করেন তিনি।

তিব্বত একটা নিষিদ্ধ দেশ। রাজধানী লাসায় সন্ন্যাসীদের কড়া প্রহরা। রোমান্টিকতার ছোঁয়া পেতে চাইলেও তিব্বত আপনাকে হতাশ করবে না। পাহাড়ের গায়ে কিছুটা আড়ালে জন্ম নেওয়া নীল রঙের পপির আকর্ষণ আপনি এড়াবেন কীভাবে!

আজ পর্যন্ত কোনও বিজ্ঞানী, অভিযাত্রী, বুদ্ধিজীবী বা ভবঘুরে মিশনারি তিব্বতের রহস্য আর বিস্ময়ের জাল ছিঁড়বার এতটুকু কৌতূহল দেখাননি।

তিব্বতের ইতিহাস যখন মধ্যগগনে তখন আমি আর আফশেনেইটর দেশটার রহস্য সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এটার পতনও দেখতে হয়েছে আমাদের। সাক্ষী হতে হয়েছে এক হাজার বছরে পুরনো সংস্কৃতির ধ্বংসচিত্র আর ভয়ানকভাবে টেনে-হিঁচড়ে একটা দেশের যবনিকা টানার দৃশ্য।

ছোটবেলা থেকেই অভিযান আর আবিষ্কারের ওপর লেখা বই পড়ার নেশা ছিল। আমার আদর্শ ছিলেন অ্যালেকজান্ডার ভন হামবোল্ট এবং সেভিন হিডেন। এশিয়ার সুইডিশ এক্সপ্লোরারদের মধ্যে সেভিন হিডেন ছিলেন সবার ওপরে। তিব্বতে তাঁর অভিযান আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সেজন্য ক্যাম্প থেকে পালিয়ে প্রথমেই তিব্বতের দিকে রওনা হই আমি। আমার অজানা ছিল না তিব্বত একটা নিষিদ্ধ দেশ। এ-ও জানতাম যে তিব্বতের

BanglaBook.org

দক্ষিণদিকে প্রতিবেশি ব্রিটিশ এলাকাও আমার জন্য নিষিদ্ধ।

প্রথমেই একটা ব্যাপার পরিষ্কার করতে চাই–ব্রিটিশরা আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছে জেনেভা কনভেনশনের রীতি অনুসারে। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ক্যাম্পের পরিবেশটা কখনোই আমাদের কাছে অসহ্য লাগেনি। বরং ওখানে বেশ ভালোই সময় কাটত। পড়াশোনার জন্য বই, খেলাধুলো, প্যারোলে আশেপাশের এলাকায় বেড়ানো আর প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা ছিল ক্যাম্পে। এতসব আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে পালাবার কোনও দারকার ছিল না আমাদের। কিন্তু আমি পালিয়েছি কিছু একটা অর্জন করার জন্য। সম্ভবত স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা। পাহাড়ের প্রতি নিখাদ ভালোবাসাই আমাকে পালাতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

'সেভেন ইয়ারস ইন তিব্বত' বইটা লেখা শেষ হয় বসন্তকালে, ১৯৫১ সালে। এ-সময় তিব্বত আর দালাই লামাকে বিদায় জানাই আমি। তখন নিজের পালানোর ব্যাপার নিয়ে মোটেও চিন্তিত ছিলাম না। ভারত সীমান্ত পার হওয়ার আগে স্বাধীন তিব্বতে দালাই লামার শেষ একটা ছবি তুলি আমি। ১৯৫১ সালের ৭ মে 'লাইফ' পত্রিকার রঙিন প্রচ্ছদে ছবিটা ছাপানো হয়েছিল। এ-সময় পৃথিবীর মানুষ তিব্বতে চিনা হামলা সম্পর্কে জানতে পারে।

এরপর ১৯৫২ সালে অস্ট্রিয়া ফিরে আসি। তখন জানতে পারি দালাই লামা তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে তিব্বতে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি তখনও বিশ্বাস করেন, চিনারা তাদের তৈরি করা চুক্তির সতেরটা পয়েন্ট মেনে চলবে। কিন্তু বাস্তবে ঠিক উল্টোটা ঘটতে দেখা গেল। বিদেশী সৈন্যদের অত্যাচারে জীবন নরকতুল্য হয়ে গেল মানুষের। তারপর ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে চরম বিদ্রোহের মুখে পড়ে চিনা সেনাবাহিনী। এ-সময় দালাই লামা পালাতে সক্ষম হন।

কয়েক সপ্তাহ খুব শোচনীয় অবস্থায় কাটানোর পর ইন্ডিয়ায় পৌছান তিনি। পণ্ডিত নেহরু অভ্যর্থনা জানান এই বিশিষ্ট রিফিউজিকে। দেরাদুন প্রিজন ক্যাম্প থেকে পালাবার ঠিক পনেরো বছর পর আসামের তেজপুরে আমিও তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ পাই। অন্যান্য রিফিউজিদেরকে উদারতার সাথেই থাকার জায়গা দেওয়া হলো। ধর্মশালায় নির্বাসিত হয়ে একটা বেসরকারী সরকার গঠন করল তারা।

পরের কয়েক বছর খুব কঠিন সময় গেছে দালাই লামার। ১৯৬২ সালে তাঁর মা মারা যান। সেই শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতে বড় ভাই লবস্যাঙ স্যামটনকে হারান দালাই লামা। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে মারা যান তিনি। নির্বাসনে থাকার সময় লবস্যাঙের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি সমর্থন পেয়েছেন দালাই লামা।

এখন পৃথিবীজুড়ে দালাই লামা অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। চিনাদের দানবতুল্য শক্তির বিপরীতে তিব্বতীরা এখনও মাথা নত করেনি। বরং ওদের স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা দিন দিন গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। দালাই লামার অসম্ভব জনপ্রিয়তার কারণে পৃথিবীবাসী এখন তিব্বতের মানুষ এবং তাদের দুই হাজার বছরের পুরনো সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারছে। বুঝতে পারছে এই সংস্কৃতি ধ্বংস করায় পৃথিবীর

BanglaBook.org

ছাদ নামে পরিচিত তিব্বত দেশটার কত বড় ক্ষতি করা হচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, ১৯৮৯ সালে পাওয়া শান্তি পুরস্কার নতুন মাত্রা যোগ করেছে দালাই লামার জীবনে।

দালাই লামাকে সম্মান জানানো হলে তাঁর বন্ধু হিসাবে আমার খুব গর্ব হয়। দেশত্যাগী তিব্বতীরা নির্বাসনে থেকে যখন সাফল্য আর জনপ্রিয়তার মুখ দেখে তখনও গর্ববোধ করি আমি। লাসায় পৌঁছাবার পর তারা যেভাবে উদারতার সঙ্গে আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিল সেজন্য এখনও আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি ওদেরকে পুরোপুরি সমর্থন করি।

দালাই লামার সঙ্গে আমার অদ্ভুত এক মিল আছে। আমাদের দুজনের জন্মদিন একই দিনে, ৬ই জুলাই। আমার জন্মস্থান অস্ট্রিয়ার ক্যারেনথিয়া রাজ্যের হুটেনবার্গে। ১৯৫২ সালের ২৫ জুলাই 'হেনরিক হারের জাদুঘর'-এর উদ্বোধন আর উৎসর্গ করার জন্য হুটেনবার্গ এসেছিলেন দালাই লামা। হুটেনবার্গের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটা স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে সেটা।

চিনা আগ্রাসনের পর প্রায় চল্লিশ বছর পার হয়ে গেলেও তিব্বতে এখনও তাদের ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। সম্ভবত পুরনো লাসার মাত্র দুই ভাগ আর অবশিষ্ট আছে। এখন চিনা একটা শহরে পরিণত হয়েছে লাসা। অগুনতি চিনা দোকান, শত শত বার আর জুয়া খেলার ঘর, সেনা সদস্যদের মনোরঞ্জনের জন্য পোটালার চারপাশে গড়ে ওঠা পতিতালয়, বর্বরোচিত হামলার করুণ নিদর্শন, নিপীড়ন, অচল অবস্থা, গণহত্যা, রাজনৈতিক অনুশাসন–কোনও কিছুই তিব্বতীদের স্বাধীন হওয়ার তীব্র ইচ্ছাকে দমাতে পারেনি।

সারা পৃথিবী থেকেই দালাই লামাকে সহমর্মিতা আর সমর্থন দেওয়ার মৌখিক নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাস্তবে এসে মুখ থুবড়ে পড়ছে এ-সব প্রতিশ্রুতি। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে মানবাধিকারের চেয়ে ব্যক্তিগত হিসাব-নিকাশ যেন বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

তারপরও আমি স্বপ্ন দেখি তিব্বত একদিন স্বাধীন হবে। দালাই লামা এবং তিব্বতীদের ভালোবাসে এমন মানুষের ঢল মিছিল করে এগিয়ে যাবে তিব্বতীদের সৃজনশীলতার সেই অদ্ভুত নিদর্শন, সেই অদ্বিতীয় মনুমেন্টের দিকে, পোটালায়।

তিব্বতের সংস্কৃতি হয়তো ধ্বংস করতেই থাকবে চিনারা। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়গুলোকে ধ্বংস করার ক্ষমতা কখনোই হবে না ওদের। তিব্বতকে চারপাশ থেকে ঘিরে থাকা এ-সব পাহাড় দেবতাদের সিংহাসন, আর অতীতের মতো ভবিষ্যতেও ধর্মপ্রাণ তিব্বতীরা উঁচু এ-সব পাহাড়ী পথ দিয়ে যাওয়ার সময় চিৎকার করে উঠবে–'দেবতারা একদিন জিতবেনই!'

BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

এক

বন্দি

আকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা / বন্দিজীবন / দেরাদুন / মারচেজকে নিয়ে পালালাম / গঙ্গা এবং তীর্থযাত্রীদের রাস্তা / ধরা পড়লাম / আবার পালালাম–এবার একা / ভাগ্যের নির্মম পরিহাস–আবার ধরা পড়ে গেলাম

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ, আগস্ট। মাস প্রায় শেষ।

প্রাথমিক জরিপের কাজ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। পাহাড়ে ওঠবার নতুন একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছি আমরা। যে জাহাজে করে ইউরোপে ফিরব সেটা আসতে অসম্ভব দেরি করায় এখন করাচিতে বসে অলস সময় কাটাচ্ছি। এদিকে আকাশে যুদ্ধের কালো মেঘ আরও গাঢ় হচ্ছে।

ইতিমধ্যে খবর পেলাম সিক্রেট পুলিশ আমাদের জন্য চারদিকে জাল পাততে শুরু করেছে। জানতাম এই জাল ছিঁড়ে বের হওয়া বেশ কঠিন। তবে আমরাও কম নাছোড়বান্দা নই। আমি, চিকেন আর লুবেনহোফার, তিনজনের একই সিদ্ধান্ত–যে করেই হোক এই জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। দরকার শুধু একটু ফাঁক। অন্তত চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি!

কিন্তু আফশেনেইটরকে নিয়ে নতুন একটা ঝামেলা দেখা দিয়েছে। করাচি ছেড়ে এক পা-ও নড়তে রাজি নয় ও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করবার অভিজ্ঞতা থাকায় ওর বদ্ধমূল ধারণা, পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে না।

আমাদের প্ল্যান হলো প্রথমে পারস্যে যাওয়া। ওখান থেকে দেশে ফেরবার একটা উপায় বের হবেই। রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম পেছনে ফেউ লেগেছে, তবে খুব সহজেই খসালাম সেটাকে।

মরুভূমির ওপর একটা ভাঙাচোরা গাড়িতে করে এগোচ্ছি। কয়েকশ' মাইল এগোনোর পর লাস বেলা নামে একটা শহরে পৌঁছলাম। শহরটা করাচির উত্তর-পশ্চিমে একটা ছোটখাট রাজ্য।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ হলে যা হয়! কিছু বুঝে ওঠবার আগেই সৈন্যদের হাতে ধরা

BanglaBook.org

পড়ে গেলাম আমরা। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দেওয়ার অজুহাতে গ্রেপ্তার করা হলো আমাদের। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, জার্মানি এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথ কিন্তু তখনও যুদ্ধ শুরু করেনি!

দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, রক্ষীবাহিনী (নাকি শত্রুবাহিনী!) আবার করাচিতে ফিরিয়ে আনল। ঠিক দুদিন পর আমাদের কপালটা আরেকটু পুড়ল, জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ইংল্যান্ড। এরপর সবকিছু একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে চলতে শুরু করল।

যুদ্ধ ঘোষণার কয়েক মিনিট পর রেস্তোরাঁয় বসে আছি। বাগানের ভেতরই ওটা। এমন সময় আপাদমস্তক অস্ত্রে ঢাকা পঁচিশজন ভারতীয় সৈন্য মার্চ করে আমাদের সামনে চলে এলো। পুলিশের গাড়িতে তুলে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা প্রিজন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের। প্রথমে ভেবেছিলাম এটা একটা স্থায়ী ক্যাম্প। কিছুদিন পর বুঝতে পেরেছি স্থায়ী নয়, একটা অস্থায়ী ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের।

ঠিক পনেরো দিন পর বোম্বের কাছে আহমেদনগরের একটা ডিটেনশন ক্যাম্পে এলাম আমরা। জায়গাটাকে ক্যাম্প না বলে মাছের বাজার বলাই বোধহয় ভাল। সারাক্ষণ হই-হট্টগোল লেগে আছে। কোথায় হিমালয়ের আলো ঝলমলে নিরিবিলি পরিবেশ, আর কোথায় এই মাছের বাজার! আমার মতো স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের কাছে এই পরিবেশ আক্ষরিক অর্থেই নরকতুল্য। কাজেই সিদ্ধান্ত নিলাম— পালাব।

বন্দি থাকতে রাজি নয়, ভাগ্যগুণে এমন কিছু সঙ্গী-সাথী জুটল। তাদের সাহায্য নিয়ে কম্পাস, টাকা আর ম্যাপ যোগাড় করলাম। এমন কি, লেদার গ্লাভস আর কাঁটাতারের বেড়া কাটবার যন্ত্রটাও পেয়ে গেলাম সহজেই।

আমাদের সবার ধারণা ছিল যুদ্ধটা বুঝি আর কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তাই সবকিছু যোগাড় করবার পরও কয়েক দিনের জন্য পালানোর চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম আমাদেরকে অন্য ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে।

আহমেদনগর ক্যাম্পে থাকবার সময় আমি আর লুবেনহোফার ঠিক করেছিলাম নতুন কোনও জায়গায় যাওয়ার আগেই আমরা পালাব। কারণ নতুন জায়গা মানেই নতুন সমস্যা। পালাবার কথাটা মাথায় রেখেই কৌশলে লরির একেবারে শেষে বসেছি।

লরির একটা কনভয় আমাদেরকে দিয়োলালি-র দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা আঠারোজন একটা লরিতে আছি। পাহারা দেওয়ার জন্য ট্রাকে মাত্র একজন ভারতীয় সৈনিক আছে। রাইফেলটা চেইন দিয়ে বেল্টের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে সে। কাজেই সেটা ছিনিয়ে নেওয়ার চিন্তাটা বাতিল করতে হলো। সারির শেষ ও শুরুর দিকে দুটো ট্রাক সৈন্যে একেবারে বোঝাই হয়ে আছে।

আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে, কিছুক্ষণ পর পর বাঁক নিচ্ছে রাস্তা। তা ছাড়া

BanglaBook.org

প্রায়ই ধুলোর মেঘ ঢেকে ফেলছে আমাদের। বুঝতে পারলাম পালাতে হলে ধুলো আর রাস্তার বাঁক–এই দুটোকে কাজে লাগাতে হবে। লাফ দিয়ে নিচে পড়েই আশপাশের জঙ্গলে গা ঢাকা দেব–এই হচ্ছে আমাদের প্ল্যান।

গার্ডের হাবভাব দেখে বুঝতে পারছি আমাদের ব্যাপারে তার তেমন কোনও মাথাব্যথা নেই। বেশিরভাগ সময় সে ট্রাকের সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। মাঝে-মধ্যে আমাদের দিকে তাকালেও, দৃষ্টিতে কোনও সতর্কতা নেই।

তারপরও সামান্য হলেও বিপদের ঝুঁকি আছে। মুক্ত হতে হলে এটুকু ঝুঁকি না নিয়ে উপায় কি! সব মিলিয়ে কাজটা সহজই মনে হচ্ছে।

এখন শুধু অপেক্ষা–সবচেয়ে সম্ভাবনাময় মুহূর্তের। কনভয়টা যে রাস্তা ধরে এগোচ্ছে তাতে আর কিছুদূর গেলেই একটা নিরপেক্ষ পর্তুগিজ এলাকা পাব। সিদ্ধান্ত নিলাম সেখানে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দেব লরি থেকে।

দেখতে দেখতে পর্তুগিজ এলাকায় চলে এলাম। চোখে চোখে কথা হলো আফশেনেইটরের সঙ্গে। আমার ইঙ্গিত ধরতে পারল ও। দুজন একসঙ্গে লাফ দিলাম লরি থেকে। তারপর অসম্ভব দ্রুতগতিতে রাস্তা ধরে বিশ গজ যাওয়ার পর একটা ছোট ঝোপের ভিতর নিজেকে ছুঁড়ে দিলাম।

এ-সময় আমাকে আতঙ্কিত করে দিয়ে পুরো কনভয় থেমে গেল। ঝপ ঝপ করে ট্রাক থেকে নেমে গার্ডরা হুইসেল বাজাচ্ছে আর গুলি ছুঁড়ছে। কয়েকজনকে রাস্তা থেকে একটু দূরে ছোটাছুটি করতে দেখলাম। কি ঘটেছে সেটা বুঝতে সময় লাগল না।

কোনও সন্দেহ নেই–লুবেনহোফার ধরা পড়ে গেছে। ও ধরা পড়ায় আবার আমার কপাল পুড়ল। কারণ যে র‍্যাকস্যাকে আমাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছিল সেটা রয়ে গেছে ওর কাছে। আর ওগুলো ছাড়া পালানো অসম্ভব।

ভাগ্যগুণে কোনও সৈন্যের চোখে ধরা না পড়ে আবার ট্রাকে গিয়ে বসলাম। শুধু আমার সঙ্গী-সাথীরা বুঝতে পারল আমি ট্রাক থেকে নেমে গিয়েছিলাম। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তারা কিছু বলল না।

একটু পর লুবেনহোফারকে দেখলাম। সৈন্যদের বাগিয়ে ধরা বেয়োনেটের সামনে হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যর্থ হওয়ায় মনটা হতাশায় ছেয়ে গেল। কিন্তু এর জন্য লুবেনহোফারকে দায়ী করতে পারলাম না। যত নষ্টের গোঁড়া ওই র‍্যাকস্যাকটা! ওর সঙ্গে ভারী র‍্যাকস্যাক থাকায় লাফ দেওয়ার সময় নিশ্চয়ই আওয়াজ হয়েছে। এই আওয়াজই সতর্ক করে দেয় গার্ডকে। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে!

আসলে আমাদের উচিত ছিল যার যার জিনিস আলাদাভাবে নিজের কাছে রাখা। যাই হোক, এই অভিযান থেকে একটা শিক্ষা পেলাম আমরা।

বছর শেষ না হতেই ট্রেন করে ভারতের বিখ্যাত ও.ও.ডব্লিউ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের। জায়গাটা দেরাদুন শহর থেকে কয়েক মাইল বাইরে।

দেরাদুনের অনেক ওপরে একটা পাহাড়ী স্টেশন আছে। জায়গাটার নাম মোসরি।

BanglaBook.org

ব্রিটিশ আর ধনী ইন্ডিয়ানরা এখানে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে আসে। এখানেই আমাদের ক্যাম্প। ক্যাম্পটা সাতটা সেকশনে ভাগ করা। প্রতিটা সেকশন দুই প্রস্থ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। তাছাড়া পুরো ক্যাম্পটাও ঘেরা আছে দুই প্রস্থ তার দিয়ে। মাঝখানে যে ফাঁক আছে, সেখানে সবসময় টহল দিচ্ছে গাড়ি।

নিচে থাকার সময় আমাদের পরিকল্পনা ছিল কোনও নিরপেক্ষ পর্তুগিজ এলাকায় পালানো। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখান থেকে হিমালয়ের তিব্বতী অংশগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি তিব্বতের মধ্যে দিয়ে একের পর এক গিরিপথ পেরুচ্ছি আমি। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে খুব ভাল লাগছিল, কিন্তু যখন মনে পড়ল এখানে আমি বন্দি, তখন থেকে শুধু একটাই চিন্তা মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে–কীভাবে এখান থেকে পালাব।

নিরাপত্তা বেষ্টনী খুব কড়া। কাজেই কাজটা সহজ হবে না এবার। পালাতে হলে বুঝে-শুনে, ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করতে হবে। এদিকে যুদ্ধটাও তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। ইন্ডিয়ার এরকম ঘন-জনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে পালানো প্রায় অসম্ভব। দুটো জিনিস থাকলে এই অসম্ভব কাজটা কিছুটা সহজ হয়ে যেত। এক হলো–প্রচুর টাকা। আর দুই–ইংরেজি ভাষার ওপর দক্ষতা। দুর্ভাগ্য–দুটোর একটাও আমার নেই। তাই তিব্বতের ফাঁকা এলাকা দিয়ে আমাকে এগোতে হবে। আর শেষ পর্যন্ত যদি ধরা পরেই যাই তাতে এমন কি বা এসে যাবে! অন্তত কিছুদিন তো হিমালয়ে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারব।

যাই হোক, সময় নষ্ট না করে তিব্বতী, হিন্দি আর জাপানি ভাষা শেখার জন্য উঠেপড়ে লাগলাম। সেই সঙ্গে এশিয়ার ওপর লেখা ভ্রমণবিষয়ক প্রচুর বইও পড়ছি। যে পথ ধরে আমি পালাব সে-সব এলাকা সম্পর্কে যতটুক সম্ভব জেনে নিচ্ছি বই থেকে। সবকিছু মনে রাখা সম্ভব নয়। তাই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাপ আর তথ্য কপি করে রাখছি। আফশেনেইটরও মুখ বুজে সারাদিন এই কাজ করছে। প্রত্যেকটা জিনিসের দুটো করে কপি করছি আমি। একটা হারিয়ে গেলে ডুপ্লিকেট দিয়ে যাতে কাজ সারা যায়।

আমার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা টাকা। নিজের অপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিস বিক্রি করে দিলাম। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। হিসাব করে দেখলাম আমার হাতে যে টাকা আছে সেটা তিব্বতে চলার জন্য যথেষ্ট নয়। তারপরও প্ল্যান অনুসারে সবকিছু করছি আমি।

এখানে আমার কিছু বন্ধু-বান্ধবের কথা না বললেই নয়। টাকা-পয়সা দিয়ে না পারলেও, নানাভাবে আমাকে সাহায্য করছে তারা। যদিও আমার মতো পালাবার কোনও ইচ্ছা ওদের নেই।

অতি সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট, তাই এবার একাই পালাতে চাই। কিন্তু বন্ধু ম্যাগেনার জানাল একজন ইতালিয়ান জেনারেলও আমার মতো মুক্ত হতে চান।

ভদ্রলোক সম্পর্কে আগেই শুনেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য একদিন রাতে আমি আর ম্যাগেনার কাঁটাতারের বেড়া টপকে পাশের ক্যাম্পে গেলাম। এখানে

BanglaBook.org

চল্লিশজন ইতালিয়ান জেনারেলকে আটকে রাখা হয়েছে।

বাইরে থেকে ভদ্রলোককে একজন সাধারণ ইতালিয়ান বলে মনে হয়। বয়স হবে চল্লিশের একটু বেশি। নাম মারচেজ। গায়ে এক ফোঁটা চর্বি নেই। তাঁর পোশাক-আশাক, আচার-আচারণ দেখে যে কেউ মুগ্ধ হবে। বলিষ্ঠ শারীরিক গঠনটাই সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করল আমাকে।

আলাপ করবার সময় ভাষা একটা বাধা হয়ে দাঁড়াল। দুজনের কেউই কাজ চালাবার মত ইংরেজিও জানি না। তাই একজন বন্ধুর সাহায্য নিয়ে ভাঙা ভাঙা ফ্রেঞ্চ ভাষায় আলোচনা চালিয়ে গেলাম। মারচেজ আবসেনিয়ার যুদ্ধ নিয়ে আমাকে অনেক গল্প শোনালেন। সবশেষে জানালেন তাঁর পালানোর পরিকল্পনা নিয়ে।

কিছুদিন পর হঠাৎ একজন ব্রিটিশ জেনারেলের কাছ থেকে কিছু টাকা পেয়ে গেলেন মারচেজ। বোধহয় ভাগ্য এবার কিছুটা সদয় হয়েছে আমার ওপর। মারচেজ টাকা পাওয়ায় নিমিষেই আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ওই টাকা দিয়ে পালানোর জন্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনলেন মারচেজ। টাকার স্বল্পতার কারণে আমি কখনোই এগুলো কিনতে পারতাম না।

হিমালয় সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা আছে, এরকম কাউকে পেলেই মারচেজ এখন পালাতে পারেন। তাঁর এই অভাবটা পূরণ করে দিলাম আমি। দুজনে একটা জয়েন্ট ফোর্স হিসাবে কাজ ভাগাভাগি করে নিলাম আমরা। যেহেতু হিমালয় সম্পর্কে ভাল জানি, তাই প্ল্যান করবার দায়িত্ব আমার। টাকা আর যন্ত্রপাতির দিকটা দেখছেন মারচেজ।

প্রতি সপ্তাহে কয়েকবার মারচেজের সঙ্গে দেখা করে প্ল্যান-প্রোগাম করছি। কাঁটাতারের বেড়া টপকানো এখন আমার কাছে জলবৎ-তরলং। ধীরে ধীরে কাজটাতে আমি দক্ষ হয়ে উঠেছি।

১৯৪৩ সালের মে মাসে আমাদের সব প্রস্তুতি শেষ হলো। টাকা, প্রয়োজনীয় রসদ, কম্পাস, ঘড়ি, জুতো আর পর্বতারোহীর একটা ছোট তাঁবু–সবকিছু তৈরি। অনেক ভেবে-চিন্তে একটা দিন ঠিক করলাম।

আজ রাতেই পালাব আমরা। মারচেজের ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য বেড়া বেয়ে উঠছি। সেখানে আগেই একটা মই রেখে দিয়েছিলাম। ক্যাম্পে ছোট-খাটো একটা আগুন লেগেছিল, তখন সুযোগ বুঝে মইটা চুরি করতে সময় লাগেনি আমাদের। মইটা একটা কুঁড়েঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখলাম। ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। এখন প্রায় মাঝরাত।

আর দশ মিনিট পর গার্ড বদল হবে। সেন্ট্রিদের হাঁটা-চলায় একটা অলসভাব লক্ষ করলাম, অপেক্ষায় আছে কখন তাদের পালা শেষ হবে। ওরা নির্দিষ্ট একটা দূরত্বে না গেলে আমরা নড়তে পারছি না। একেকটা সেকেন্ড মনে হচ্ছে একেকটা যুগ। সময় যেন স্থির হয়ে আছে। ঠিক এই সময় মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে এলো। আলোটা

BanglaBook.org

পড়েছে ঠিক চা বাগানের ওপর।

ইতিমধ্যে গার্ডরা আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। ঠিক যতটা দূরে আমরা তাদেরকে আশা করছিলাম। এটাই উপযুক্ত সময়। হয় এখন নয়তো কখনই নয়! ঝট করে শোয়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালাম। যত দ্রুত সম্ভব মই নিয়ে বেড়ার কাছে গেলাম আমি। চিন্তা-ভাবনা করার সময় নেই। বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে মই বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। কোনও বিরতি নিচ্ছি না। ওঠা শেষ হতেই কাটতে শুরু করলাম তার।

কাজটা শেষ হতে যা দেরি, বাঁকানো মাথাওলা একটা লাঠি দিয়ে তারের একপ্রান্ত টেনে ধরলেন মারচেজ। ফাঁক গলে বেরিয়ে যাওয়া এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। দ্রুত একটা বাড়ির ছাদে নামলাম আমি।

এবার মারচেজকে সাহায্য করতে হবে। হাত দিয়ে তার টেনে ধরলাম। মারচেজ উঠছেন না বুঝতে পেরে তাকালাম তাঁর দিকে। কিছুক্ষণ বোকার মতো আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। মারচেজ কি ভাবছেন সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। তাঁর ধারণা ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। গার্ডরা ফিরতে পথ ধরেছে অনেক আগেই। এতক্ষণে নিশ্চয়ই অনেক কাছেও চলে এসেছে। ঠিক এই সময় সত্যি সত্যি তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আর সময় নেই, যা করার এখনই করতে হবে। হাত ধরে বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটানে ছাদে টেনে নিলাম তাঁকে।

এত সতর্ক হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে যেন টের পেয়ে গেল ওরা। অ্যালার্ম আর চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। তবে আশার কথা ইতিমধ্যে আমরা জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়েছি।

খুশিতে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে ফেললেন মারচেজ। কিন্তু এখনই খুশি হওয়ার কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না আমি। যে কোনও মুহূর্তে ধরা পড়ে যেতে পারি আমরা। বোমা আর হুইসেলের আওয়াজ বলে দিচ্ছে গার্ডরা আমাদের রাস্তা ধরেই আসছে।

জীবন বাঁচাবার তাগিদে সংক্ষিপ্ত পথ ধরে দ্রুত এগোচ্ছি আমরা। মূল রাস্তা খুব একটা ব্যবহার করছি না। সামনে কোনও গ্রাম পড়লেই সেটাকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছি। আমাদের সঙ্গে যে একটা ব্যাগ আছে সেটা প্রথমদিকে বুঝতেই পারিনি, কিন্তু কিছুদূর যেতেই সেগুলো ভারী লাগতে শুরু করল।

চলতে চলতে হঠাৎ একটা গ্রামে ড্রাম বাজাবার আওয়াজ শুনতে পেলাম। ধক্ করে উঠল বুকটা। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গ্রামের বাসিন্দারা সংকেত দিচ্ছে না তো!

এশিয়ায় আমাদের মত সাদা চামড়ার মানুষকে 'সাহিব' বলা হয়। আর সাহিবরা কখনও হাতে ব্যাগ রাখে না, সেটা যত ছোটই হোক। তাদের সঙ্গে সবসময় একদল চাকর থাকে। দুজন ইউরোপিয়ান ভারী বোঝা নিয়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে হেঁটে

BanglaBook.org

যাচ্ছে–জানা কথা, ব্যাপারটা আদিবাসীরা স্বাভাবিকভাবে নেবে না।

বন্য পশুর কারণে রাতে জঙ্গলে চলাফেরা করতে ভয় পায় ইন্ডিয়ানরা। কারও চোখে ধরা পড়তে না চাইলে রাতে এগোনই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাদের যাত্রা হবে শুধু রাতে। তবে ক্যাম্পে থাকবার সময় খবরের কাগজে মানুষখেকো বাঘ আর লেপার্ডের অনেক গল্প পড়ায় ব্যাপারটা নিয়ে আমরাও খুব একটা স্বস্তিতে নেই।

সারারাত হাঁটার পর দিনের শুরুতে আমরা লুকিয়ে পড়লাম। ওখানেই কেটে গেল সারাদিন। প্রচণ্ড রোদের মধ্যেই সেরে নিলাম খাওয়া আর ঘুম।

ইতিমধ্যে একজন রাখালের দেখা পেয়েছি। ভাগ্য ভাল যে সে আমাদের দেখতে পায়নি। এদিকে নতুন একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। দ্রুত খাবার পানি শেষ হয়ে আসছে আমাদের। এক বোতল পানি দিয়ে সারাদিন চলতে হবে। সন্ধ্যার সময় স্নায়ুগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

যত দ্রুত সম্ভব আবার যাত্রা শুরু করতে চাই আমরা। কিন্তু শুধু রাতে হেঁটে খুব একটা দ্রুত এগোনো সম্ভব নয়। তিব্বতে যাওয়ার জন্য হিমালয়ের মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ ধরতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন এক হপ্তার কঠোর পরিশ্রম।

ক্যাম্প থেকে পালানোর পর সন্ধ্যায় প্রথম রিজটা পার হলাম। ওপরে উঠে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিলাম আমরা। তিন হাজার ফুট নিচে বন্দিদের ক্যাম্পটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। অসংখ্য বাতি মিটমিট করে জ্বলছে। ঠিক দশটা পনেরো মিনিটে সব বাতি নিভিয়ে দেওয়া হলো। শুধু সার্চলাইটটা জ্বলে থাকায় পুরো ক্যাম্পটার বিশাল আয়তন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাচ্ছি।

জীবনে এই প্রথম সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ পেলাম আমরা। পি.ও.ডব্লিউ ক্যাম্পে থাকা দুই হাজার সৈন্যদের কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

কিন্তু এসব চিন্তায় নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। সিদ্ধান্ত নিয়েছি যুমনার উপত্যকা ধরে সামনে এগোব। কিন্তু সেটা খুঁজে পেতে না জানি আরও কত পাহাড়-পর্বত টপকাতে হবে আমাদের।

*

যাই হোক, অনেক চড়াই-উতরাই পার করে শেষ পর্যন্ত যুমনা নদীতে পৌঁছালাম। এই সময় ঝুপ করে রাত নামল। যুমনা নদী ধরেই সামনে এগোচ্ছি।

মারচেজের শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। তবে ধীরে ধীরে মনের জোরে সেটা কাটিয়ে উঠছে ও। আমি অবশ্য পুরোপুরি ফিট। হাঁটছি তো হাঁটছিই, এই হাঁটার যেন কোনও শেষ নেই। তার ওপর নানা রকম ভয় তো আছেই। রাস্তায় কোনও মানুষের সঙ্গে দেখা হলেই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিচ্ছি দুজন একসঙ্গে। তবে সব সময় যে এড়িয়ে থাকতে পারছি, তা না। কেউ কোনও প্রশ্ন করলে বানানো উত্তর

BanglaBook.org

একটাই–আমরা তীর্থযাত্রী।

এত দ্রুত পা চালিয়েও কিন্তু খুব একটা লাভ হচ্ছে না। সবচেয়ে উদ্বেগের কথা, শিডিউল অনুসারে দু'দিন পিছিয়ে আছি আমরা।

আবার যাত্রা শুরু হলো। কিছুদূর যাওয়ার পর ফুলবাগিচার সামনে পড়লাম। পুরো এলাকা জনমানবহীন। বিশ্রাম নিতে হলে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না। সিদ্ধান্ত নিলাম এখানেই লম্বা একটা ঘুম দেব।

তাঁবু খাটাবার কিছুক্ষণ পর কোত্থেকে কে জানে কয়েকজন রাখাল কাছাকাছি চলে এলো। চটজলদি তল্পিতল্পা গুটিয়ে আবার নতুন জায়গা খোঁজা শুরু করলাম আমরা। কৌতূহলী রাখালদের সঙ্গে কোনও কথা হলো না।

পরবর্তী কয়েক রাত বেশ নিশ্চিন্তেই এগোতে পারলাম। পানি না থাকায় পুরো এলাকায় জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। প্রচণ্ড তৃষ্ণায় আমাদের অবস্থা কাহিল।

এই সময় একটা পুকুর দেখতে পেয়ে হাতে যেন চাঁদ পেয়ে গেলাম। কোনও রকম চিন্তা-ভাবনা না করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম পানিতে, আর সেই সঙ্গে নিজের বিপদ ডেকে আনলাম নিজেই। জানা ছিল না ওই পুকুর হচ্ছে মোষদের গড়াগড়ি খাওয়ার আদর্শ জায়গা। আবহাওয়া গরম হলেই এখানে নেমে পড়ে ওগুলো। কিছুক্ষণ পর বমি আর কাশি শুরু হলো আমার।

একে তো তৃষ্ণায় কাতর, তার সঙ্গে আবার যোগ হয়েছে কাশি আর বমি। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এতই খারাপ যে আর এক পাও এগোবার ক্ষমতা নেই। এখনও সকাল হতে ঢের দেরি।

ভোর হতেই পানির খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। সৌভাগ্যই বলতে হবে, কিছুক্ষণ খুঁজতেই পানির ব্যবস্থা হয়ে গেল। পরবর্তী তিন দিন আর তিন রাত মোটামুটি নিশ্চিন্তেই এগোলাম আমরা। বেশিরভাগ এলাকাই জনবসতিহীন। মাঝে মাঝে ইন্ডিয়ানদের দেখা পেলেও তাদেরকে এড়িয়ে চলতে খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না।

ক্যাম্প থেকে পালাবার বারো দিন পর গঙ্গার তীরে পৌঁছালাম আমরা। এতক্ষণে খানিকটা যেন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। এখন আমরা তীর্থযাত্রীদের নির্দিষ্ট রাস্তা ধরে এগোতে পারব। তবে বিপদ হতে পারে এমন কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নই, তাই আগের সিদ্ধান্তেই অটল থাকলাম–আমরা শুধু রাতে এগোব, আর দিনে নেব বিশ্রাম।

বিপদ যেন আমাদের ছায়া হয়ে গেছে। একটা সমস্যা বিদায় নিতে না নিতে আরেকটা সমস্যা উড়ে এসে জুড়ে বসছে ঘাড়ের ওপর। হঠাৎ খেয়াল করে দেখি আমাদের রসদ প্রায় শেষ। বেচারা মারচেজ একেবারে হাড্ডিসার হয়ে গেছেন। তাঁর তুলনায় এখন আমার শারীরিক অবস্থা অনেক ভাল হলেও, খাবার না পেলে কপালে খারাবই আছে আমাদের দুজনেরই।

তবে আশার কথা রাস্তার পাশে বেশ কয়েকটা দোকান চোখে পড়েছে। খেয়াল করে দেখলাম ওগুলো অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। এসব দোকান থেকেই প্রয়োজনীয়

BanglaBook.org

রসদ কিনতে হবে।

মুখে কালি-ঝুলি মেখে যতটুক সম্ভব চেহারাটা ইন্ডিয়ানদের মতো করলাম আমি। প্রথম দোকানে ঢোকার পর পরিষ্কার বুঝতে পারলাম দোকানি আমাকে চোর বলে সন্দেহ করছে। অভিজ্ঞতাটা তিক্ত, তবে নিশ্চিত হলাম ছদ্মবেশ নিখুঁতই হয়েছে।

সেখান থেকে বেরিয়ে পাশের দোকানে ঢুকলাম মুঠো ভর্তি টাকা নিয়ে। সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিজ্ঞতা হলো এবার। আমার হাতের দিকে নজর যেতেই চকচক করে উঠল দোকানির চোখ। ওখান থেকে দশজন মানুষের মতো রসদ কিনলাম।

অবশেষে পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা হলো আমাদের। এখন অনেকটা নিশ্চিত মনে সামনে এগোতে পারব।

কিন্তু আমাদের কপালে মনে হয় ভাল কিছু নেই। পরের যাত্রাবিরতিতে নতুন এক সমস্যায় পড়লাম।

প্রচণ্ড গরমে অর্ধনগ্ন হয়ে মাটিতে শুয়ে আছেন মারচেজ। তিনি এতই শুকিয়ে গেছেন যে তাঁর হাড়গুলো একটা একটা করে গোনা যাচ্ছে।

এমন সময় কাঠ খুঁজতে এল কয়েকজন ভারতীয়। আমাদেরকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তীর্থযাত্রীদের বেশভূষার সঙ্গে আমাদের পোশাক-আশাকের কোনও মিল নেই। কাজেই সন্দেহ করা স্বাভাবিক।

খুব বিনয় দেখিয়ে আমাদেরকে ফার্মহাউজে থাকার প্রস্তাব দিল ওরা। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। অজুহাত হিসাবে বললাম, আমার সঙ্গী খুব অসুস্থ। আমার কথা শুনে ফিরে গেল তারা। ভাবলাম যাক, উটকো ঝামেলার হাত থেকে বাঁচা গেল।

কিন্তু যা আশা করিনি, ঘটল ঠিক তাই। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এল ওরা। পরিষ্কার বুঝতে পারছি পলাতক আসামী ধরে নিয়েছে আমাদেরকে।

কোনও ভূমিকায় না গিয়ে সরাসরি ব্ল্যাকমেইল শুরু করল ওরা। পাশের গ্রামে আটজন সৈন্যসহ এক ইংরেজ নাকি দুজন পলাতক আসামীকে খুঁজছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন আসামীদের ব্যাপারে কেউ কোনও তথ্য দিতে পারলে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। ইন্ডিয়ানরা প্রতিশ্রুতি দিলো কিছু টাকা দিলে ওই ইংরেজকে আমাদের কথা তারা জানাবে না।

ভিতরে ভিতরে ভয় পেলেও সেটা ওদেরকে বুঝতে দিলাম না। দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে কাশ্মীরের একজন ডাক্তার বলে পরিচয় দিলাম। ওষুধের একটা বাক্সও দেখালাম প্রমাণ হিসাবে।

মারচেজের অকৃত্রিম গোঙানি আর আমার দৃঢ়তা দেখে ইন্ডিয়ানরা ফিরে গেল। একজন ইংরেজ অফিসারকে নিয়ে এই বুঝি ফিরে এলো ইন্ডিয়ানরা–এই ভয়ে সারারাত আর ঘুম হলো না আমাদের। কিন্তু ওরা আর ফিরে এলো না।

আরও কয়েক রাত নির্ঘুম হাঁটার পর উত্তর কোশীতে পৌঁছালাম আমরা। এখানে অসংখ্য মন্দির আছে। এরপর তীর্থযাত্রীদের রাস্তা ধরে এগোতে হবে আমাদের। কিন্তু

BanglaBook.org

সেটা খুঁজে পেতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে!

খেয়াল করে দেখলাম সব মন্দিরেই সন্ন্যাসীদের ভিড় লেগে আছে। এক মন্দির থেকে আরেক মন্দিরে যাচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের চোখ এড়িয়ে রাস্তা খুঁজতে হচ্ছে আমাকে। প্রায় একঘন্টা পর রাস্তাটা খুঁজে পেলাম।

এখানেও কোথাও কোনও মানুষের চিহ্ন নেই। নিশ্চিন্ত মনে এগোচ্ছি। দিনের বেলা লুকাবার জায়গা পেতেও খুব একটা সমস্যা হলো না।

ইতিমধ্যে আমরা সাত হাজার ফুট ওপরে উঠে পড়েছি। রাতে আবার যাত্রা শুরু করলাম। এ-সময় ভুটিয়া সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটা ক্যাম্প চোখে পড়ল আমাদের। এরা তিব্বতী ব্যবসায়ী গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ তিব্বতে এসে ব্যবসা করে, তারপর শীতকালে চলে যায় ভারতে। গরমের সময়ে দশ হাজার ফুট ওপরে একটা গ্রামে গিয়ে বার্লি চাষ করে ওরা।

একদিন রাতে একটা ভুটিয়া গ্রামে পৌঁছালাম আমরা। লোকজন শুধু গ্রীষ্মকালে এখানে বসবাস করে। বাড়িগুলোর ছাদ পাথরের তৈরি। তখনও বুঝতে পারিনি সামনে খারাপ সময় অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

হঠাৎ করে একটা নদী দেখতে পেলাম। তীর উপচে পড়ছে পানিতে। নদীর চারপাশের জায়গা জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। এককথায় এটা পার হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সিদ্ধান্ত নিলাম এখন বিকল্প রাস্তা খুঁজব না। দিনের আলো না ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম তীর্থযাত্রীরা নদী পার হয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সামনে অসংখ্য গাছ থাকায় আমরা দেখতে পেলাম না তাদের কৌশলটা কী ছিল।

পরদিন দুপুরবেলা আবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনও উপায় বের করতে পারলাম না। এই নদী পার হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একটা না একটা উপায় তো থাকেই।

হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। তুষার আর বরফ গলা পানিতে নদীটা ভরা। আমার ধারণা দুপুর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত টই-টুম্বর থাকে নদী। খুব সকালে হয়তো নেমে যায় পানি।

আমার ধারণাই সত্যি। খুব সকালে উঠে নদীর কাছে যেতেই গাছের গুড়ি দিয়ে বানানো একটা ডুবন্ত সেতু দেখতে পেলাম। ভালভাবেই পার হলাম সেতুটা। কিছুদূর যেতেই আরেকটা সেতু পড়ল আমাদের সামনে।

এবার সেতু পার হতে গিয়ে পা পিছলে পানিতে পড়ে গেলেন মারচেজ। ভাগ্য ভাল, পড়ে যাওয়ার পরও গাছের গুড়ি আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। নইলে স্রোতের টানে অনেক দূরে চলে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না।

যাই হোক, কোনও রকমে সেতুটা পার হলাম আমরা। মারচেজের শারীরিক

BanglaBook.org

অবস্থা আগে থেকেই খারাপ ছিল। সেতু থেকে পড়ে গিয়ে অবস্থা আরও নাজুক হয়ে গেছে। আর এক পাও নড়তে রাজী নন তিনি। তাঁকে বললাম একটা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে বিশ্রাম নেব। কিন্তু তিনি আমাকে একা চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। অগত্যা আমিও তাঁর সঙ্গে বসে পড়লাম। আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাই ঘটে যাক, শুরু যেহেতু দুজন একসঙ্গে করেছি শেষও করব একসঙ্গে।

এই সময় একজন ভারতীয় লোকের সঙ্গে দেখা হলো আমাদের। মাটিতে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ইউরোপিয়ান জিনিসের দিকে এক পলক তাকিয়ে আমাদেরকে প্রশ্ন করল সে।

এতক্ষণে মারচেজের মাথায় ঢুকেছে আমরা কতটা বিপদের মধ্যে আছি। তাড়াতাড়ি নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিলেন তিনি।

কিন্তু দু'পাও যেতে পারিনি, এই সময় আরেকজন ভারতীয় এসে বাধা দিল আমাদের। খেয়াল করলাম তার সঙ্গে দশজন সৈনিক আছে। নিখুঁত ইংরেজিতে আমাদের পাস দেখতে চাইল সে। তার কথা না বোঝার ভান করে বললাম আমরা কাশ্মীর থেকে আসা তীর্থযাত্রী।

ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল লোকটা। তারপর এমন এক সমাধান বের করল যার ফলে তখনই পালাবার সব আশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম আমরা। সামনেই দুজন কাশ্মীরীর বাসা আছে। আমরা যদি নিজেদের কথা তাদেরকে বোঝাতে পারি তাহলে সে আমাদের ছেড়ে দেবে।

যাই হোক, দুই কাশ্মীরীর সামনে যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম এবার আমাদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে কিছুই করার নেই।

পরিচয় দেওয়ার ব্যাপারে মারচেজের সঙ্গে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলছি। সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিয়ানটাও ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলে উঠল। এবার আমাদের প্যাকেটগুলো খুলতে বলল সে। ব্যাগে একটা ইংরেজি-তিব্বত ডিকশনারি দেখে আমাদের আসল পরিচয় জানতে চাইল। স্বীকার করতে বাধ্য হলাম—আমরা পলাতক আসামী।

তবে এখনও নিজেদের জাতীয়তা প্রকাশ করিনি।

বেশ খাতির করে একটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের। কিছুক্ষণ পর চা-ও দেওয়া হলো। আমরা ক্যাম্প থেকে পালানোর পর সতেরো দিন পার হয়ে গেছে। কী পরিকল্পনা ছিল আর কী হচ্ছে। মনটা তিক্ততায় ভরে গেল আমার। আমাদেরকে যিনি প্রশ্ন করছেন তিনি তেহরি-ঘরওয়াল, বন বিভাগের চিফ। ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, আর জার্মান স্কুলে পড়াশোনা করায় এই তিন ভাষাতেই তিনি দক্ষ।

ভাগ্য যতই আমাকে নিয়ে খেলুক না কেন, ধরা পড়ার পর পালাবার কথা একবারও মাথা থেকে বের করিনি। তবে মারচেজের শারীরিক অবস্থা এত খারাপ যে দ্বিতীয়বার পালাবার কথা তিনি চিন্তাই করতে পারছিলেন না।

ধরা পড়ার আগে খুব অল্প খাবারে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে আমাদের। তবে এখন

BanglaBook.org

আর যাই হোক, অন্তত পেটপুরে খেতে পাচ্ছি আমরা। স্বীকার করতেই হবে, খাবারের ব্যাপারে বন বিভাগের চিফ খুব উদার। একটু পর পরই আমাদেরকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে, এইভেবে কিছু খাবার র‍্যাকস্যাকে লুকিয়ে ফেললাম।

সন্ধের দিকে চিফকে বললাম আমাদের ঘুম পেয়েছে। বেডরুমে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিলেন তিনি। যথেষ্ট চালাকির পরিচয় দিয়ে নিজের খাটটা রাখলেন আমাদের জানলার ঠিক বাইরে।

কিন্তু আমাদের ঘটেও বুদ্ধি আছে। কিছুক্ষণের জন্য নিজের খাট ছেড়ে একটু বাইরে গেলেন তিনি। এই সময় পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে আমি আর মারচেজ মিছিমিছি ঝগড়া করার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। মারচেজ একাই চেঁচাচ্ছেন। কখনো আস্তে, কখনো উচ্চস্বরে কথা বলে আমার সঙ্গে ঝগড়া চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। আমি অবশ্য ব্যস্ত পালাবার পথ খুঁজতে।

তাঁকে ঝগড়া চালিয়ে যাবার ইঙ্গিত দিয়ে জানালা লক্ষ করে লাফ দিলাম আমি। ভারী র‍্যাকস্যাক সহ পড়লাম চিফের বেডের ওপর। এখনও ঝগড়া চালিয়ে যাচ্ছেন মারচেজ। বলা যায়, একেবারে পাকা অভিনেতা।

একদৌড়ে পার হয়ে গেলাম বারান্দা। ইতিমধ্যে অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেছে। আড়াল থেকে দেখলাম সৈন্যরা বাড়ির কর্ণার থেকে সরে গেল।

এখন আর কে পায় আমাকে! বারো ফুট নিচে মাটিতে লাফ দিলাম। মাটি শক্ত হওয়ায় একটু আওয়াজও হলো। কাজে কোনও বিরতি দিচ্ছি না। তাড়াতাড়ি উঠে বাগানের দেয়াল টপকে গাঢ় অন্ধকার বাগানের ভিতর ঢুকে পড়লাম।

আমি আবার স্বাধীন!

যাত্রা শুরু হলো আমার। কিছুদূর যেতেই ভেড়ার পালের সামনে পড়লাম। আর এগোনো সম্ভব নয় বুঝতে পেরে ফিরতি পথ ধরতে যাব, এইসময় একটা কুকুর তাড়া করল আমাকে। দৌড়ে সেটার হাত থেকে বাঁচলাম।

কিন্তু কুকুরের হাত থেকে বাঁচতে দৌড়াতে দৌড়াতে অত্যন্ত ঢালু একটা জায়গায় এসে পড়েছি আমি। এই ঢালু রাস্তা এখন পার হই কী করে! আর কোনও উপায় না পেয়ে আবার ভেড়ার পালের দিকে গেলাম। অনেক কষ্টে ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে অন্য একটা রাস্তা ধরলাম আমি।

কিন্তু মাঝরাতের দিকে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম ভুল পথে এগোচ্ছি। অগত্যা কয়েক মাইল পিছিয়ে যেতে হলো। লক্ষ্যহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানোয় পুরো চার ঘন্টা সময় নষ্ট হয়েছে আমার। ভোর হতে আর বেশী দেরি নেই।

একটা বাঁক ঘুরলাম। সঙ্গে সঙ্গে ধক করে উঠল বুকের ভিতরটা। বিশ গজ দূরে একটা ভালুক দাঁড়িয়ে। ভাগ্য ভাল যে আমার দিকে নজর না দিয়ে নিজের রাস্তায় চলে

BanglaBook.org

গেল ভালুক মহাশয়।

এখন পর্যন্ত গ্রামটাতে লোকবসতির কোনও চিহ্ন দেখতে না পেলেও, দিনের আলো পুরোপুরি ফুটতেই আবার গা ঢাকা দিলাম। আমি জানি তিব্বত সীমান্তে পৌঁছাতে হলে প্রথমে নির্দিষ্ট একটা গ্রাম পার হতে হবে আমাকে। গ্রামটার ওপারেই আমার জন্য অপেক্ষা করছে স্বাধীনতা।

অন্ধকার গাঢ় হতেই যাত্রা শুরু করলাম। হাঁটলাম সারারাত। ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম কেন কাঙ্ক্ষিত গ্রামটাতে পৌঁছাতে পারিনি।

আমার নোট অনুযায়ী গ্রামটা থাকবার কথা নদীর ওপারে। নদী যেখানে সরু হয়ে গেছে সেখানে একটা ব্রিজ আছে। ভয় হচ্ছে ইতিমধ্যে গ্রামটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাইনি তো। কিন্তু নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম গোটা একটা গ্রাম আমার চোখ এড়িয়ে যাবে কীভাবে!

সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন থেকে দিনের বেলাতেও হাঁটব। যেহেতু আশপাশে লোকবসতি আছে বলে মনে হচ্ছে না, তাই সতর্ক হওয়ার তেমন প্রয়োজনবোধ করছি না।

ভুলটা এখানেই করলাম আমি। অসংখ্য বোল্ডারের একটা স্তূপ ঘুরতেই বিদ্যুৎচমকের মতো নিজেকে একটা গ্রামের সামনে আবিষ্কার করলাম। আমার দিকে তাকিয়ে উত্তেজিতভাবে কথা বলছে কিছু লোক।

হায়, আমার পোড়া কপাল! আবার ভুল জায়গায় এসে পড়েছি। ম্যাপের নকশায় যে ভুল আছে সেটা আগে কেন বুঝলাম না! এটা আমার সেই কাঙ্ক্ষিত গ্রাম নয়। কাঙ্ক্ষিত গ্রাম চুলোয় যাক! এখন তো আবার ধরা পড়ে গেলাম আমি। আমার দিকে তাকিয়ে লোকগুলোকে উত্তেজিতভাবে কথা বলতে দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছি।

নিজের ভুলেই অনেক সময় নষ্ট করেছি, এখন সুদে-আসলে সেটার খেসারতও দিতে হচ্ছে। লোকগুলো মুহূর্তের মধ্যে ঘিরে ফেলল আমাকে। একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছি। কিছুক্ষণ পর বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে।

দুই রাত আমাকে এই গ্রামে রাখার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। গ্রামটার নাম নেল্যাঙ। এখনও পালানোর ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছি। তবে শারীরিকভাবে খুব দুর্বল আর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় আমার চিন্তাভাবনা বাস্তবে রূপ দিতে পারছি না।

যাই হোক, আবার ফিরতি পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে। মারচেজের সঙ্গে দেখা হলো। সে এখনও চিফের ব্যক্তিগত বাংলোয় অতিথি হিসাবে আছে। আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো সেখানে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, কোত্থেকে কে জানে দুদিন পর আফশেনেইটর আর ক্যালেনবার্গকেও নিয়ে আসা হলো ওখানে। ওরাও আমার সঙ্গে পি.ও.ডব্লিউ ক্যাম্প

BanglaBook.org

থেকে পালিয়েছিল।

কীভাবে পালানো যায় তা নিয়ে আবার মাথা ঘামাতে শুরু করলাম। ইতিমধ্যে একজন ইন্ডিয়ান কুককে আমার বন্ধু বানিয়ে ফেলেছি। তার কাছে আমার ম্যাপ, টাকা আর কম্পাস জমা রাখলাম। জানি ক্যাম্পে গেলেই আমাদেরকে সার্চ করা হবে। তখন এসব জিনিস লুকাব কোথায়! রাঁধুনিকে বললাম, বসন্তের সময় আবার আসব আমি। সে কথা দিল জিনিসগুলো যত্নের সঙ্গে রাখবে।

সবাইকে আবার ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মারচেজ শারীরিকভাবে এখনও অসুস্থ হওয়ায় একটা ঘোড়া দেওয়া হয়েছে তাকে। কিছুদিন পরই আবার ক্যাম্পে ফিরে এলাম আমরা।

টানা আটত্রিশ দিন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। এ কদিন শরীরের ওপর কম অত্যাচার হয়নি। ক্যাম্পে ফেরার পথে একটা উষ্ণ ঝরনায় গোসল করার সময় দেখলাম মাথায় হাত দিলেই গোছা গোছা চুল উঠে আসছে। ইন্ডিয়ানদের ছদ্মবেশ নেওয়ার জন্য চুলে যে ডাই ব্যবহার করেছিলাম সেটা নিশ্চয়ই ভাল কিছু ছিল না।

মাথায় চুল না থাকায় এবং আরও ছোট-খাট কিছু পরিবর্তন হওয়ায় ক্যাম্পে যাওয়ার পর অনেক বন্ধু আমাকে চিনতেই পারল না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দুই

আবার পালিয়েছি

আগের রাস্তা ধরেই এগোচ্ছি / বিদেশীদের ওরা স্বাগত জানায় না / ফিরতি পথ ধরে আবার আমরা ভারতে

'যেভাবে পালালেন–সত্যিই আপনি খুব দুঃসাহসী মানুষ। কিন্তু আমি দুঃখিত। আপনাকে আরও আটাশ দিন থাকতে হবে এখানে,' আমি ক্যাম্পে ফেরার পর বললেন ইংরেজ কর্নেল।

আটত্রিশ দিন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেছি আমি। এখন পালানোর শাস্তি হিসাবে আবার আটাশ দিন বন্দি অবস্থায় থাকতে হবে।

খবর পেলাম অন্য একটা ক্যাম্পে মারচেজকেও একই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন পর তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম। এবার নিজে না পালালেও, কথা দিলেন সবরকম সহযোগিতা করবেন আমাকে।

যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে বের হতে হবে আমাকে। কাজেই আবার চিন্তা-ভাবনা শুরু হলো।

ম্যাগনার আর হিনস ভন হ্যাভ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা এবার আমার সঙ্গে পালাবে। দুজনেই ইংরেজিতে খুব ভাল। ওদের কাছ থেকে জানতে পারলাম আরও তিন-চারজন আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাইছে।

১৯৪৪ সালের ২৯ এপ্রিল মোট সাতজন ক্যাম্প থেকে পালালাম। সাতজনের মধ্যে দুজন নিজেদের পরিকল্পনা অনুসারে অন্য রাস্তা ধরে চলে গেল। অল্পকিছু কথা বলে তাদেরকে বিদায় জানালাম। আমাদের পাঁচজনের গন্তব্য তিব্বত। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার পরিকল্পনা মিলছে না। তাই যার যার পরিকল্পনা মাফিক সবাই নিজেদের রাস্তা ধরে চলে গেল। আমি আগের মতোই যুমনা আর অ্যাঙ্গলার উপত্যকা ধরে এগোবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

যাই হোক, নানারকম চড়াই-উতরাই আর অনেক ভীতিকর ঘটনার সাক্ষী হয়ে দশ

BanglaBook.org

হাজার ফুট উঁচু নাগ তিব্বা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছালাম আমি। এখন আমাকে এই পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে হবে।

পাহাড়ী রাস্তা ধরে হাঁটছি, এ-সময় জীবনে প্রথম চিতার মুখোমুখি হলাম। ভয়ে আমার আত্মা খাঁচাছাড়া হবার যোগাড়! কী দিয়ে ওটার সঙ্গে যুদ্ধ করব! ছুরি হচ্ছে আমার একমাত্র হাতিয়ার। একটা মোটা গাছের ডালে বসে আছে বাঘ, ভঙ্গিটাই বলে দিচ্ছে লাফ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। ওটার সঙ্গে যুদ্ধ করে জেতা অসম্ভব। আমি যে ভয় পেয়েছি সেটা বুঝতে না দিয়ে স্রেফ নিজের রাস্তা ধরে হেঁটে গেলাম। আশ্চর্য! কিছু ঘটল না। তবে পরবর্তী কয়েক ঘন্টা আমার শুধু মনে হচ্ছিল পিছনে বোধহয় কিছু একটা আছে।

এখনও নাগ তিব্বার রিজ ধরে এগোচ্ছি। আর কিছুদূর হাঁটার পর রাস্তায় এসে পড়লাম। বেশিদূর যাইনি, এ-সময় হঠাৎ কিছু মানুষকে শুয়ে থাকতে দেখলাম রাস্তার ওপর। কাছে যেতে দেখি আফশেনেইটর আর তার তিন বন্ধু নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। ঠেলা মেরে ঘুম ভাঙালাম ওদের।

নিজেদের মধ্যে অনেক আলোচনা আর তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক করল তিব্বতেই যাবে ওরা।

বন্ধুদের সঙ্গ পেয়ে ভালই লাগছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্রাম নিলাম। এবার রওনা হতে হয়। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করতে রাজী নয় ওরা। কী আর করা, আবার আমাকে একাই যেতে হলো।

সেই রাতেই গঙ্গায় পৌঁছে গেলাম আমি। ক্যাম্প থেকে পালানোর পর ইতিমধ্যে পাঁচদিন কেটে গেছে।

উত্তর কাশীতে পৌঁছাবার পর দুজন লোক পিছু নিল। কোনও রকমে তাদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচলাম।

হাঁটতে হাঁটতে একটা ফার্মহাউজের কাছে চলে এসেছি। এই ফার্মহাউজেই আমার সেই রাঁধুনি ইন্ডিয়ান বন্ধু থাকে। আমাকে দেখে খুব খুশি হলো সে। জিনিস-পত্র সব বুঝে পেলাম তার কাছ থেকে।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা ওখান থেকে বের হলাম। ইন্ডিয়ান বন্ধু আমাকে এগিয়ে দিতে এসে আর ফেরার নামই নিচ্ছে না। আমি বারণ না করলে হয়তো যেতেই থাকত। বারবার বলাতে ফিরে গেল সে।

আবার একা হয়ে গেলাম। এখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। এ-সময় হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে একটা ভালুক দেখলাম। আমার দিকে তাকিয়ে গর্জন করছে। ভয় পেলেও সেটা চেপে রাখতে পারলাম। ভালুকের বুকের দিকে একটা বর্শা তাক করে এক পা এক পা করে পিছাচ্ছি। তারপর একটা বাঁক ঘোরা শেষ হতেই তাড়াতাড়ি একটা লাঠিতে আগুন জ্বাললাম। লাঠিটা সামনে ধরে নাড়তে নাড়তে এবার সামনে এগোচ্ছি।

BanglaBook.org

বাঁক পার হয়ে দেখলাম ভালুকটা চলে গেছে। পরে তিব্বতী কৃষকদের কাছ থেকে জেনেছি ভালুকরা শুধু দিনের বেলা আক্রমণ করে। রাতে হামলা করতে ওরা ভয় পায়।

দশদিন হাঁটার পর নেল্যাঙ গ্রামে পৌঁছালাম আমি। গত বছর এখানেই দুর্ভাগ্যের শিকার হই। এবার অবশ্য একমাস আগেই এসে পড়েছি।

এখনও গ্রামটা জনমানবশূন্য। তবে নিয়তি আবার আমাকে যারপরনাই বিস্মিত করল। হঠাৎ আবার চার বন্ধুকে দেখতে পেলাম। ইন্ডিয়ান বন্ধুর বাসায় থাকায় আমার চেয়ে এগিয়ে এসেছে ওরা। একটা খালি কোয়ার্টারে রাতটা কাটিয়ে দিলাম আমরা।

এরপর টানা সাতদিন হাঁটার পর টিরপানি পৌঁছালাম। সেখান থেকে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে, আর অনেক বিপদকে পাশ কাটিয়ে ১৯৪৪ সালের ১৭ মে পৌঁছালাম স্যাঙচোকলা গিরিপথে। ম্যাপ বলছে আমরা এখন সতেরো হাজার দুশো ফুট ওপরে আছি।

এটা ভারত আর তিব্বত সীমান্তের মাঝামাঝি একটা জায়গা। এই প্রথম আনন্দে গা ভাসিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা হলো আমাদের। কারণ এখন আর কোনও ইংরেজ আমাদেরকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। যদিও আমরা জানি না তিব্বতীদের কাছ থেকে কি রকম ব্যবহার পাব বা আশা করা উচিত। তবে যেহেতু আমাদের দেশের সঙ্গে তিব্বতের কোনও শত্রুতা নেই, তাই আশা করা যায় আমাদেরকে তারা অতিথি হিসাবেই গ্রহণ করবে।

তবে সব মিলিয়ে পরিস্থিতি কোনওভাবেই আমাদের অনুকূলে নেই। তিব্বতী ভাষা জানি না বললেই চলে। সঙ্গে টাকা-পয়সাও না থাকার মতো। তার ওপর আবার প্রচণ্ড খিদে। যত দ্রুত সম্ভব বসতি খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়। প্রথমে এখান থেকে যেতে হবে পবিত্র কৈলাস পর্বত। তারপর ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ ধরে পুব তিব্বত।

যাই হোক, পরদিন দুপুরে প্রথম একটা তিব্বতী গ্রামে ঢুকলাম আমরা। গ্রামটার নাম ক্যাসাপুলিং। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এখানে মাত্র ছ'টা বাড়ি। অনেকক্ষণ গেট ধরে ঝাঁকাঝাঁকি করার পরও বাড়ি থেকে কেউ বের হলো না। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করতে রহস্যটা পরিষ্কার হলো। গ্রামবাসী সবাই বার্লি বোনার কাজে ব্যস্ত।

এদের কাছ থেকে কী রকম ব্যবহার পাব কে জানে! হয়তো আমাদেরকে শত্রু হিসাবে দেখবে তারা। কিন্তু নিজেদের কাজে ওরা এতই ব্যস্ত যে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের দিকে ফিরেও তাকাল না। কোনও রকম ইতস্তত না করে একটা বাড়ির পাশে ক্যাম্প করলাম আমরা।

একটু রাত হতেই মাঠ থেকে ফিরে আসতে শুরু করল লোকজন। কোনও রকম ভূমিকায় না গিয়ে সরাসরি টাকার বিনিময়ে তাদের ভেড়া অথবা ছাগল কিনতে চাইলাম। কিন্তু রাজি হলো না ওরা। একটু ভাবতেই কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল আমাদের কাছে।

তিব্বতে কোনও সীমান্ত চৌকি না থাকায় বিদেশিরা অহরহ দেশটাতে ঢুকে পড়ে।

BanglaBook.org

এ কারণে বিদেশিদের প্রতি তিব্বতীদের মনে একটা বিতৃষ্ণা জন্ম নিয়েছে। শুধু তাই নয়, কেউ কোনও বিদেশিকে কিছু বিক্রি করলে তাকে শাস্তি পেতে হয়।

কিন্তু আমাদেরও তো দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। খাবার না পেলে স্রেফ মারা পড়ব। বাধ্য হয়ে ওদেরকে ভয় দেখালাম বিক্রি না করলে জোর করে ভেড়া বা ছাগল নিয়ে যাব।

কাজ হলো এ-কথায়। অসম্ভব চড়া দামে একটা ভেড়া বিক্রি করল তারা। বুঝতে পারছি, ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে, তবু কিছু বললাম না। যেহেতু তিব্বতেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাই এদেশের মানুষের সঙ্গে ভাল একটা সম্পর্ক রাখতে হবে আমাদের।

ভেড়া জবাই করে রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। খিদেতে মনে হচ্ছে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি সব বেরিয়ে আসবে। রান্না যখন শেষ হল তখন প্রায় মাঝরাত। তারপরও মাংসটা আধা সেদ্ধ রয়ে গেছে। কিন্তু সেটাই অমৃত মনে হলো আমাদের কাছে।

পরদিন সকালে কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলাম আমরা। পরের গ্রাম ডুশ্যাঙেও একই রকম ব্যবহার পেলাম।

ভাষা না জানার কুফলটা ভালই টের পাচ্ছি। আফশেনেইটর নানারকম ভাষা ব্যবহার করে গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে। আমরাও চুপ করে বসে নেই। বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টা করছি। কিন্তু বিফলে গেল সব। আমাদের কোনও ভাব বা ভঙ্গি তারা বুঝতে পারছে না।

এই প্রথম একটা আশ্রম দেখতে পেলাম। কোনও সরকারী কর্মকর্তাকে দেখতে পেলে তাঁর কাছে এখানে থাকবার আবেদন করতে পারতাম। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম এখানে কোনও সরকারী অফিসার নেই।

যাই হোক, পরদিন সকালে আবার নিজেদের পথে রওনা হলাম। আমি আর কোপ সামনে আছি। আফশেনেইটর আর ট্রিপেল আছে আমাদের চেয়ে একটু পিছনে।

একসময় ঘন্টার আওয়াজ শুনতে পেলাম আমরা। কিছুক্ষণ পর দেখি দুজন ঘোড়সওয়ার আমাদের দিকে আসছে। ঘোড়া থেকে নেমে স্থানীয় ভাষায় আমাদেরকে ভারতে ফিরে যেতে বলল তারা। জানি কথা বলে কোনও লাভ হবে না, তাই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম ওদেরকে। ভাগ্য ভাল যে নিজেদের অস্ত্র বের করেনি ওরা। সন্দেহ নেই ওরা ভেবেছে আমাদের কাছেও অস্ত্র আছে। আরও কয়েকবার হালকাভাবে আমাদের পথ আটকাবার চেষ্টা করল তারা। কিন্তু তাতে শুধু সময়ের অপচয় ছাড়া আর কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হলো না আমাদের। কিছুক্ষণ পর হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেল লোক দুজন।

ইতিমধ্যে পরবর্তী গন্তব্য, স্যাপর‍্যাঙ পৌঁছে গেছি আমরা। আশা করছি এখানে স্থানীয় সরকারের দেখা পাওয়া যাবে। একটু খোঁজ নিতেই জানতে পারলাম স্থানীয়

BanglaBook.org

সরকার গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনের জন্য শাংগস্তে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম আমরা।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এই গ্রামে আসার আগে যে দুজন লোক আমাদের পথ আটকেছিল এই স্থানীয় সরকার তাদের মধ্যে একজন। এবারও তাঁর কাছ থেকে আমরা ভাল ব্যবহার পেলাম না।

অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে একরাত থাকবার অনুমতি পেলাম। আমাদেরকে একটা গুহা দেখিয়ে দিলেন তিনি। একটু পর পর মনে করিয়ে দিচ্ছেন, যে রাস্তা ধরে এসেছি সেই রাস্তা ধরেই তিব্বত ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে।

তাঁকে বোঝালাম তিব্বত একটা নিরপেক্ষ দেশ এবং তাদের উচিত আমাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া। কিন্তু কিছুতেই তাঁর মন গলানো যাচ্ছে না। জানালেন এই ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই। তখন আমরা প্রস্তাব দিলাম ব্যাপারটা কোনও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক।

তিনি জানালেন পাঁচ মাইল দূরে থুলিং নামে একটা গ্রাম আছে। সেখানে উঁচু পদে আছেন এরকম একজন কর্মকর্তাকে পাওয়া যাবে। তিনি একজন সন্ন্যাসী।

পরদিন থুলিঙের উদ্দেশে রওনা হলাম। কিন্তু এখানেও হতাশ হতে হলো। কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে লাভ হলো না। আমাদেরকে পুব তিব্বতে যেতে দিতে চাইছেন না তিনি। শুধু তাই নয়, আমরা পুব তিব্বতে যেতে চাই এটা শোনার পর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো খাবারও বিক্রি করতে রাজী হচ্ছেন না। তাঁর শিগাতসেতে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব মেনে নিতেই কিছু খাবার জুটল ভাগ্যে।

শিগাতসেতে যাওয়ার জন্য চারটে গাধা দেওয়া হলো আমাদের। কিন্তু সেখানে গিয়েও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পেলাম না। কোনওভাবেই আমাদেরকে তিব্বতে থাকতে দিতে রাজী নন তাঁরা। স্যাপর‍্যাঙ অথবা শিপকি গিরিপথ হয়ে ভারতে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে।

ওঁদেরকে জানালাম এখানে কিছুদিন থেকে শিপকি হয়ে ইন্ডিয়ায় চলে যাব আমরা। প্রথমে খাবার বিক্রি করতে রাজী হচ্ছিলেন না। কিন্তু প্রস্তাবটা মেনে নিতেই চড়া দামে আমাদের কাছে খাবার বিক্রি করলেন।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম আফশেনেইটর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আগের দিন রাতে তামার বাটিতে মাংস রান্না করেছিলাম আমি। সম্ভবত সেটার বিষক্রিয়াতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে।

এদিকে আজকেই শিগাতসে ছেড়ে চলে যেতে হবে আমাদের। স্থানীয় সরকার প্রধানকে অনুরোধ করলাম আমাদেরকে আরও কিছু সময় দেওয়ার জন্য। এ-সময় তাঁর আসল রূপ দেখলাম। অসম্ভব খারাপ ব্যবহার করলেন তিনি আমার সঙ্গে। আমিও ছাড়লাম না। সাংঘাতিক বাক-বিতণ্ডা হলো। অবশেষে ওদের কাছ থেকে আফশেনেইটরের জন্য একটা ঘোড়া আদায় করে ছাড়লাম। সেই সঙ্গে আমাদের

BanglaBook.org

ব্যাগগুলো বহন করবার জন্য দুটো ষাঁড়ও দিতে বাধ্য হলেন ওঁরা।

এগারোদিন পর শিগাতসে থেকে সীমান্ত ঘেঁষা শিপকি গ্রামে পৌঁছালাম আমরা।

আজ জুন মাসের নয় তারিখ। তিন সপ্তাহ হলো আমরা তিব্বতের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ইতিমধ্যে তিব্বত সম্পর্কে অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে আমাদের। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি সরকারী অনুমতি ছাড়া তিব্বতে থাকা সম্ভব নয়।

শিপকিতে একরাত থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। অনেক কষ্টে-সৃষ্টে একটা গাধা কিনলাম ৮০ রুপি দিয়ে। তিব্বতের ভিতরের কোনও গ্রামে কোনওভাবেই এটা সম্ভব হতো না। গ্রামটা সীমান্তের খুব কাছে হওয়ায় কপালে ওই গাধাটা জুটল।

সীমান্তে যেতে হলে গিরিখাদের ওপর দিয়ে পথ চলতে হবে আমাদেরকে। সেখানে ইন্ডিয়ান অথবা তিব্বতীদের কোনও সীমান্ত চৌকি নেই। সীমান্তের কাছে গিয়ে একটা মাইলফলক দেখতে পেলাম আমরা। সেখানে লেখা : সিমলা ২০০ মাইল।

আবার ভারতে এলাম। তবে কোনওভাবেই এখানে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ক্যাম্প অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য–এটা ভুলে যাবার মতো বোকা কেউ আমরা নই।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তিন

তিব্বতের অভ্যন্তরে

গারটোক-এ উষ্ণ অভ্যর্থনা / এই প্রথম ভাইসরয়ের দেখা পেলাম / ট্রাডুন–আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেল কোপ

যে কোনও উপায়ে আবার তিব্বতেই ফিরে যেতে হবে। এতদিন যে-সব কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেছি তাঁরা কেউই উঁচু পদের নন। এবার উঁচু পদে আছেন এমন কারও কাছে ধরনা দিতে হবে। এজন্য প্রথমে যাওয়া চাই গারটোক-এ। গারটোক পশ্চিম তিব্বতের রাজধানী। ভূগোল পড়ে জেনেছি ওটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু শহর। দেখবার মতো নাকি অনেক কিছুই আছে ওই শহরে। ঠিক করেছি গারটোকের সবকিছু ঘুরে-ফিরে দেখব।

অনেক গ্রাম-গঞ্জ পেরিয়ে গারটোক পৌঁছালাম। আশা করছি এখানে একজন ভাইসরয়কে পাব। কিন্তু শহরের বিখ্যাত সব জায়গা দেখতে গিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ার অবস্থা হলো আমাদের। যাবাবরদের তাঁবু, কাদা-ইঁটের তৈরি কিছু ঘর–এই হচ্ছে গারটোক। ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো কয়েকটা কুকুর ছাড়া জীবন্ত কিছু চোখে পড়ল না।

এখানেই তাঁবু খাটালাম। গ্রামবাসীর দেখা পেলাম কিছুক্ষণ পর। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তারা জানাল এখানে দুজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আছেন। তবে এই মুহূর্তে তাঁরা কেউই শহরে নেই। শুধু দ্বিতীয় ভাইসরয়ের প্রতিনিধি আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে পারবেন। সিদ্ধান্ত নিলাম তাঁর কাছেই আবেদন করব আমরা।

অফিসে গিয়ে দেখি ভাইসরয়ের প্রতিনিধি অবিকল গৌতম বুদ্ধের ভঙ্গিতে মেঝেতে বসে আছেন। লক্ষ করলাম তাঁর বাঁ কানে ছয় ইঞ্চি লম্বা রিং ঝুলছে। সম্ভবত নিজের পদমর্যাদা বোঝবার জন্য এটা পরেছেন তিনি। একজন মহিলাকেও দেখতে পেলাম। তিনি সম্ভবত অনুপস্থিত ভাইসরয়ের স্ত্রী।

BanglaBook.org

খুব বিনয় দেখিয়ে আমাদের বসতে বললেন তাঁরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুকনো মাংস, পনির, মাখন আর চা পরিবেশন করা হলো। বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি আর ইংলিশ-তিব্বতীয়ান ডিকশনারির সাহায্যে আলোচনা চলছে। তাঁদেরকে জানালাম আমরা জার্মান থেকে পালিয়ে এসেছি। তিব্বত যেহেতু একটা নিরপেক্ষ দেশ তাই আমরা আশা করি এখানে আমাদেরকে আশ্রয় দেওয়া হবে। উত্তরে তখনি কিছু জানালেন না তাঁরা। কোনওরকম সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হলো আলোচনা।

পরদিন ভাইসরয়ের প্রতিনিধিকে কিছু ওষুধ পাঠালাম। তিনি খুব খুশি হলেন এতে। জানতে চাইলেন কীভাবে ওষুধগুলো ব্যবহার করতে হয়। সুযোগ পেয়ে প্রশ্ন করলাম তিনি কি আমাদেরকে ট্রাভেল পারমিট দেবেন। জানালেন এ ব্যাপারটা চিফের ওপর নির্ভর করছে। তিনি এখন তীর্থযাত্রায় মাউন্ট কৈলাসে আছেন। আশা করা হচ্ছে কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন।

কৌশলে প্রতিনিধির সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেললাম আমরা। প্রায়ই নানারকম জিনিস পাঠাচ্ছেন তিনি। কিন্তু চিফের আসার সময় ঘনিয়ে আসতেই হঠাৎ নিজেকে আমাদের কাছ থেকে গুটিয়ে নিলেন। এমন কি বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো কিছুদিন পর আমাদেরকে খাবারও দিতে চাইলেন না। ভাগ্য ভাল যে, কিছু ইন্ডিয়ান ব্যবসায়ীকে পেয়েছিলাম। তারা খুশি মনেই খাবার বিক্রি করল আমাদের কাছে। তবে দাম নিল আকাশছোঁয়া।

একদিন খবর পেলাম দুজন ভাইসরয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এসেছেন। তিব্বতে তাঁদেরকে বলা হয় গারপোন।

আমরা তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী এটা জানিয়ে সংক্ষেপে একটা চিঠি লিখল আফশেনেইটর। কিন্তু কোনও উত্তর না আসায় দুপুরের সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সবিস্তারে আমাদের সমস্যার কথা জানালাম তাঁকে। ধৈর্য ধরে সব কথা শুনলেন তিনি। তারপর বললেন এ-ব্যাপারে তিনি তাঁর সহকারীর সঙ্গে আলোচনা করবেন।

কিছুদিন পর আবার আলোচনায় বসলাম আমরা। এবার তিনি একা নন, সঙ্গে তাঁর সহকারীর প্রতিনিধিকেও দেখতে পাচ্ছি। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে নাগরি প্রদেশে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে পরিবহন আর পাস দেবেন তাঁরা। তবে কোনওভাবেই আমাদেরকে তিব্বতের ভেতরের দিকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তাড়াতাড়ি নিজেদের মধ্যে কিছুটা আলোচনা সেরে নিলাম। তাঁকে জানালাম আমরা নেপাল সীমান্তে যেতে চাই। এজন্য ট্র্যাভেল পারমিট দরকার। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, লাসার সরকারকে ব্যাপারটা জানাবেন তিনি। তবে সেখান থেকে খবর আসতে কমপক্ষে কয়েক মাস লেগে যাবে।

তবে এতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। এখনও পুবদিকে যাওয়ার আশা

BanglaBook.org

ছাড়িনি। যে কোনও মূল্যে আমরা সেখানে যাবই।

গারপোন তাঁর অতিথি হিসাবে কয়েকদিন গারটোকে থাকার অনুরোধ জানালেন। তিনদিন পর ট্র্যাভেল পাস হাতে পেলাম। সেটা পড়ে জানতে পারলাম কি কি জায়গা পাড়ি দিতে হবে আমাদের। নাগা-খই, সিরসোক, মোন্টসি, বারখা, টোরচেন, লুলঙ, স্যাম-শেঙ, ট্রুকস্যাম আর গ্যাবন্যাক–এগুলো পার হয়ে যেতে হবে নেপাল সীমান্তে।

জুলাই মাসের ১৩ তারিখে গারটোককে বিদায় জানালাম আমরা। তবে পনপো আমাদের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছেন যে আমরা এখান থেকে তিব্বতের রাজধানী লাসায় যাব না। আমাদের ছোট্ট কাফেলায় এখন অনেক কিছু আছে। দুটো ষাঁড়, আমার গাধা, আর একজন গাইড–এই হচ্ছে আমাদের কাফেলা।

আবার যাত্রা শুরু হলো। এবার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

আমাদেরকে দেখে ইউরোপিয়ান বলে চিনতে পারবে–সে সাধ্য কার! যাযাবরের মতো জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। টানা তিন মাস খোলা আকাশের নিচে ঘুমাচ্ছি। স্থানীয় মানুষের চেয়েও খারাপভাবে জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। সবসময় কঠিন সংগ্রাম করে কোনও রকমে টিকে আছি।

যাই হোক, অবশেষে টেরাডুন এসে পৌঁছালাম। কয়েকজন চাকর আমাদেরকে কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে এলো। সেখানে আশাতীত ভাল ব্যবহার পেলাম। প্রথমেই নানারকম খাবার পরিবেশন করা হলো। খাওয়ার সময় কেউ কোনও প্রশ্ন করছে না। খাওয়া শেষ হতেই ট্র্যাভেল পারমিট দেখতে চাইলেন তাঁরা। কিছুক্ষণ খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখলেন সেটা। ভাব দেখে মনে হচ্ছে আমাদের ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত হতে পারছেন না।

একটু পর ব্যাগ থেকে সব জিনিস বের করা হলো। তাঁদের ধারণা আমাদের কাছে অস্ত্র আছে। কিন্তু ব্যাগ থেকে সেরকম কিছু না পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন তাঁরা। তবে তিব্বতী গ্রামার আর ইতিহাসের বই দুটো সন্দেহ জাগিয়ে তুলল তাঁদের মনে।

ট্র্যাভেল পারমিটে লেখা আছে আমরা নেপালে যাব। এটা দেখে বেশ খুশি হলেন তাঁরা। কথা দিলেন আমাদেরকে সবরকম সাহায্য করবেন। জানালেন কাল সকালে রওনা হলে প্রথমেই কোরেলা গিরিপথ পার হতে হবে আমাদের। তারপর সেখান থেকে নেপাল মাত্র দু'দিনের পথ। কিন্তু আমরা তো নেপালে যেতে চাই না। যে করেই হোক, তিব্বতেই থাকতে হবে আমাদের।

আলোচনা শেষ হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে তাঁদেরকে সোজাসুজি বললাম টেরাডুনে কিছুদিন থাকতে চাই। উত্তরে তখনি কিছু জানালেন না তাঁরা।

পরদিন সকালে চাকর এসে বলল, একজন পনপো আমাদেরকে মধ্যাহ্নভোজের দাওয়াত দিয়েছেন। তিব্বতে অনেক উঁচু পদের প্রতিনিধিকে পনপো বলা হয়।

BanglaBook.org

এখানেও আমাদের সঙ্গে ভদ্রোচিত ব্যবহার করা হলো। চাইনিজ নুডুলস খেতে দেওয়া হয়েছে। হাসি-ঠাট্টায় সময়টা খুব সুন্দর কেটে যাচ্ছে। খাওয়া শেষ হতে বিয়ার পরিবেশন করা হলো। খেয়াল করলাম সন্ন্যাসীরা ওটা স্পর্শ করছে না।

ধীরে ধীরে প্রসঙ্গ বদলে গেল। প্রসঙ্গ এখন আমরা। ওদের কাছ থেকে জানতে পারলাম কর্তৃপক্ষ লাসায় একটা চিঠি পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা যে তিব্বতে থাকতে চাই সেটা চিঠিতে লেখা থাকবে। সুযোগ পেয়ে জানালাম আমরাও ইংরেজিতে দুটো চিঠি লিখতে চাই। কেউ কোনও আপত্তি করল না।

একটা ব্যাপার ভেবে খুব ভাল লাগছে আমার। আমাদের লেখা চিঠি দুটোর উত্তর না আসা পর্যন্ত টেরাডুনেই থাকতে হবে। সিদ্ধান্ত নিলাম ঘুরে-ফিরে সময়টা উপভোগ করব।

কিছুদিন পর নেপালের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কিন্তু একজন তীর্থযাত্রীর মতোই কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথা বলে চলে গেলেন তিনি।

আমরা ভেবেছিলাম তিনি হয়তো আমাদের নেপালে যাওয়ার ব্যাপারটা মেনে নেবেন না। কিন্তু সেটা ভুল প্রমাণিত করে জানালেন, কাঠমন্ডুতে আমাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হবে। সেখানে ইচ্ছামতো কাজও করতে পারব। এখানেই শেষ নয়, নেপালে যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করবে প্রশাসন।

ইতিমধ্যে হাত খরচ হিসাবে আমাদেরকে তিনশো রুপি করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর প্রস্তাব সত্যিই লোভনীয়। সম্ভবত একটু বেশিই লোভনীয়। আমরা জানি এশিয়ায় ব্রিটিশদের খুব খাতির করা হয়। কিন্তু এতো কিছুর পরও তাঁর প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য তো তিব্বতে থাকা, নেপালে যাওয়া নয়।

কিন্তু তিন মাস পার হওয়ার পর আমাদের ধৈর্যে চিড় ধরল। ইতিমধ্যে কোপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে একাই নেপালে চলে যাবে। আর আফশেনেইটরের কথা কী বলব! হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই চারটে ভেড়া কিনে চ্যাঙহ্যাঙের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল সে।

আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম লাসা থেকে কোনও উত্তর না আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করব। কিন্তু সেখান থেকে ভাল কোনও খবর আসার সম্ভাবনা খুব কম। মূলত এই কারণেই যে যার রাস্তা মাপা শুরু করেছে। কোপ নেপালে যাচ্ছে দেখে কর্তৃপক্ষ খুব খুশি হলো। কিন্তু আফশেনেইটরের আচরণে বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছেন তাঁরা।

যাই হোক, পরদিন সকালে আফশেনেইটর ফিরে এলো। নেকড়ের হামলায় তার দুটো ভেড়া মারা গেছে। বাধ্য হয়ে আবার ফিরে এসেছে সে। আবার তিনজন একসঙ্গে রাত কাটালাম আমরা।

পরদিন সকালে আমাদেরকে বিদায় জানিয়ে নিজের পথে রওনা হয়ে গেল কোপ।

BanglaBook.org

চার

কাইরঙ–সুখী একটা গ্রাম

কাইরঙে যাবার নির্দেশ/ যুদ্ধ শেষ / নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা / মাউন্ট এভারেস্ট

আবহাওয়া এখন ঠাণ্ডা। লাসা থেকে চিঠি আসুক আর নাই আসুক, এখন টেরাডুনকে বিদায় জানাব আমরা।

চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, এ-সময় চিঠি এলো লাসা থেকে। যা ভয় করেছিলাম, ঠিক তাই ঘটেছে। কোনওভাবেই তিব্বতের ভিতরে যেতে পারব না। নেপালে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনও পথ খোলা নেই। চিঠিতে বলা হয়েছে তিব্বতের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রাস্তা ধরে আমাদের নেপালে যেতে হবে। এজন্য খুব বেশি হলে তিব্বতের কাইরঙ পর্যন্ত যেতে পারব আমরা। কাইরঙ থেকে আট মাইল গেলে নেপাল সীমান্ত পৌঁছে যাব। আর সেখান থেকে সাত মাইল হাঁটলে চলে যাব রাজধানী কাঠমন্ডুতে।

ডিসেম্বর মাসের ১৭ তারিখে টেরাডুনকে বিদায় জানালাম আমরা। এখানে টানা চার মাস ছিলাম।

এক সপ্তাহ হাঁটার পর ডিজংঘা পৌঁছালাম। এখানে বেশিদিন থাকার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তুষার পড়তে শুরু করায় বাধ্য হয়ে একমাস থাকতে হলো।

একমাস পর আবার যাত্রা শুরু করলাম আমরা। একের পর এক গ্রাম পার হয়ে যাচ্ছি। টানা এক সপ্তাহ হাঁটার পর শেষ পর্যন্ত কাইরঙ পৌঁছালাম। ডিজংঘা থেকে কাইরঙ আসলে তিন দিনের পথ। কিন্তু রাস্তা খারাপ হওয়ায় পুরো এক সপ্তাহ সময় লাগল আমাদের। কাইরঙের পরেই নেপালের সীমান্ত।

কাইরঙ শব্দটার অর্থ 'সুখী গ্রাম'। এখানে নয় মাস থাকার পর আমরা বুঝতে পারলাম কাইরঙ সত্যি একটা সুখী গ্রাম। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় জীবনের গোধূলী বেলায় আমি কোথায় থাকতে চাই। তাহলে নিঃসন্দেহে আমি কাইরঙের নাম বলব।

BanglaBook.org

মোট আশিটা বাড়ি আছে কাইরঙে। এর আগে কোনও ইউরোপিয়ান এই গ্রামে আসেনি। তাই প্রথমদিকে গ্রামবাসীরা হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকত।

প্রতিটি বাড়ির নিচতলায় গরু আর ঘোড়া রাখবার জন্য আস্তাবল আছে। থাকবার জন্য খুব ছোট্ট একটা ঘর দেওয়া হয়েছে আমাদের। এতই ছোট যে সেখানে থাকা এক কথায় অসম্ভব। পাশের একটা গোলাঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু সেখানেও শান্তি নেই। পোকা, ইঁদুর আর ছারপোকার সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হলো আমাদের।

ইতিমধ্যে রান্না করার জন্য আমাদেরকে চাকর দেওয়া হলেও ঘরে ফায়ার প্লেস থাকায় নিজেরাই রান্না করে নিচ্ছি।

কাইরঙের মূল খাবার সাম্বা। এটা তৈরি করার পদ্ধতিটা অদ্ভুত। প্রথমে একটা লোহার চাটুতে কিছু বালি রেখে সেটা প্রচণ্ড উত্তপ্ত করা হয়। তারপর তাতে ছেড়ে দেওয়া হয় কিছু যবের দানা। গরম বালিতে পড়ে দানাগুলো বিস্ফোরিত হতে থাকে। কিছুক্ষণ পর একটা ছাঁকনির সাহায্যে যবের দানাগুলো বালি থেকে আলাদা করা হয়। এরপর দানাগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো করে সেটার সঙ্গে মাখন দিয়ে তৈরি চা বা দুধ মিশিয়ে পেস্টের মতো করা হয়। ব্যস, সাম্বা এখন খাওয়ার জন্য তৈরি।

কিছুদিন পর এক জেলা কর্তৃপক্ষকে ফোন করলাম। তিনি একজন পনপো। তাঁর ধারণা কিছুদিনের মধ্যে নেপালের উদ্দেশে রওনা দেব আমরা। তাঁকে জানালাম আরও কিছুদিন কাইরঙে থাকতে চাই। সহজভাবেই সেটা মেনে নিলেন তিনি।

ভালই সময় কাটছে। প্রথমে কাইরঙ ছেড়ে খুব বেশি দূর আমাদের যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। কিন্তু এখন গ্রাম ছেড়ে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারি। গ্রামবাসী আমাদের দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে নতুন বছরের উৎসব শুরু হলো। তিব্বতে লুনার ক্যালেন্ডার দিয়ে হিসাব করে নতুন বছরের দিন ঠিক করা হয়। এ-সময় বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে হাসি-আনন্দে মেতে ওঠে তিব্বতীরা। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই পার্টি হয়। অনেক বাড়ি থেকে আমন্ত্রণ জানানো হলো আমাদের।

সবকিছু ভালভাবেই চলছিল। কিন্তু একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল আমাদের মেজবানের বাসায়। হঠাৎ একদিন মেজবান আমাকে তাঁর ছোট বোনের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের ভিতর গাঢ় অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এ-সময় হঠাৎ কেউ আমার হাত ধরে ফেলল। বুঝতে পারলাম হোস্টের ছোট বোন। অন্ধকার সয়ে যাওয়ার পর তার দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলাম আমি। দুদিন আগেও মেয়েটা সুস্থ ছিল। এখন তাকে দেখে চেনাই মুশকিল। এক নজর দেখেই বুঝতে পারলাম তার স্মল পক্স হয়েছে। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে ভালভাবে গোসল করলাম। তার এই অসুখ সারবার নয়। এখন অসুখটা মহামারি আকার ধারণ না করলেই হয়। আফশেনেইটরও তাকে দেখতে গিয়েছিল। সেও বুঝতে পেরেছে মেয়েটার স্মল পক্স

BanglaBook.org

হয়েছে। ঠিক দুদিন পর মেয়েটা মারা গেল।

নতুন বছরের উৎসবের পর পরই তিব্বতীদের কবর দেওয়ার অনুষ্ঠানে সামিল হতে হলো আমাদের। ছাদে একটা নকশা করা পাইন গাছ ছিল। সেটা নামিয়ে নেওয়া হলো। সকালে মৃতদেহটা বাড়ির বাইরে নিয়ে গেল পেশাদার লাশ বহনকারীরা। তার আগে লাশটাকে একটা সাদা কাপড়ে জড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। শোকাতুর লোকদের পিছু নিলাম আমরা। সংখ্যায় তারা মাত্র তিনজন। গ্রামের কাছেই একটা উঁচু জায়গায় গোরস্থান আছে। সেখানে গিয়ে দেখি আকাশে অসংখ্য চিল আর কাক উড়ছে।

লাশটা গোরস্থানে নিয়ে যাওয়ার পর তিনজনের মধ্যে একজন লোক কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে মৃতদেহটা টুকরো টুকরো করে ফেলল। দ্বিতীয়জন বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছে আর একটা ড্রাম বাজাচ্ছে। তিন নম্বর লোকটা ভয় দেখিয়ে কাক আর চিলকে খেদাবার চেষ্টায় ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পর অন্য দুজন লোককে চা দিল সে। কাক আর চিল যাতে সহজে খেতে পারে সেজন্য মৃতদেহের হাড় পর্যন্ত টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে। তারা চাইছে না লাশের কোনও চিহ্ন থাকুক।

তিব্বতীরা ধর্মীয় রীতি-নীতি মানতে গিয়ে এরকম বর্বরভাবেই শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। আত্মা না থাকায় মৃতদেহের কোনও দাম নেই তাদের কাছে। সেজন্য তিব্বতীরা মৃতদেহের কোনও চিহ্ন রাখতে চায় না। তবে উচ্চবিত্ত আর লামাদের লাশ পোড়ানো হয়। ছিন্ন-ভিন্ন করা হয় শুধু সাধারণ মানুষদের মৃতদেহ। সামান্য কিছু খরচও হয় এতে। কিন্তু যাদের এই সামান্য খরচ যোগাবারও ক্ষমতা নেই তাদের লাশ ফেলে দেওয়া হয় নদীতে। লাশ ছিন্নভিন্ন করার কাজটা তখন মাছেরাই করে দেয়। সংক্রামক রোগে কোনও গরীব মানুষ মারা গেলে একজন সরকারী লোক তার লাশের ব্যবস্থা করে।

যাই হোক, আরও বেশ কয়েকজন স্মল পক্সে আক্রান্ত হলো। তবে তাদের মধ্যে মারা গেল দু'একজন। ভাগ্য ভাল যে রোগটা মহামারি আকার ধারণ করেনি। টানা ঊনপঞ্চাশ দিন শোক পালন করা হলো মেজবানের বাসায়। তারপর আগের মতো মগডালে প্রার্থনা পতাকা বাঁধা একটা গাছ বসানো হলো ছাদের ওপর। এ-সময় একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তিব্বতে কেউ মারা গেলে তার শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান পালন করার জন্য যে খরচ হয় সেটার যোগাড় করতে আপনজনেরা অনেক সময় তাদের অলঙ্কার কিংবা মূল্যবান জিনিস বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়।

ঘুরে-ফিরে ভালোই সময় কেটে যাচ্ছে আমাদের। হঠাৎ একদিন শুনলাম ডিজংঘায় মহামারি আকার ধারণ করেছে আমাশয়। মহামারি থেকে বাঁচতে জেলা কর্মকর্তা ওয়াংডুলা তাঁর পরিবার নিয়ে কাইরঙে চলে এসেছেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, কাউরঙে এসেও তাঁর চার ছেলেমেয়ের একজনও বাঁচল না। শেষ ছেলেটাকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম আমরা। কিন্তু ডাক্তারের চেয়ে সন্ন্যাসীর দেওয়া চিকিৎসায় ওয়াংডুলার বেশি ভরসা থাকায় তাকেও আর বাঁচানো গেল না। দশ দিন

BanglaBook.org

মৃত্যুর সঙ্গে যুঝে হার মানল সে।

এই কয়দিনে ওয়াংডুলার সঙ্গে খুব ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে আমার। বাইরের বিশ্ব সম্পর্কে জানতে খুব আগ্রহী তিনি। তাঁর স্ত্রীর বয়স বাইশ বছর। হিন্দি বলায় পটু।

ইতিমধ্যে গ্রীষ্মকাল এসে পড়েছে। এ-সময় হঠাৎ কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে কাইরঙ ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলো। ইতিমধ্যে জেনেছি যুদ্ধ থেমে গেছে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের জানা আছে। কোনও সন্দেহ নেই যুদ্ধ থেমে গেলেও, এখনও সুযোগ পেলেই আমাদেরকে ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তাই কর্তৃপক্ষকে বললাম আমাদেরকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দিলে শরৎকালে আমরা কাইরঙ ছেড়ে চলে যাব। রাজী হলেন তাঁরা।

কাইরঙের মানুষের জীবনযাত্রা খুব বৈচিত্র্যময়। গ্রীষ্মের সময় ধান পাকার পর নেপালি নারী-পুরুষ দলে দলে বাস্কেট বোঝাই করে কাইরঙে ধান নিয়ে আসে। এ-সময় মিছিলের মতো একের পর এক কাফেলা আসতে থাকে কাইরঙে। নেপালিরা ধানের বদলে লবণ নিয়ে যায়। তিব্বতে যেসব দ্রব্য রপ্তানি করা হয় সেগুলোর মধ্যে লবণ অন্যতম। এই লবণ কাইরঙে আনা হয় চ্যাংহ্যাঙের অনেকগুলো লেক থেকে। লেকগুলো থেকে লবণের অফুরন্ত ভাণ্ডার পেয়েছে তিব্বতীরা।

রাস্তা খুব সরু হওয়ায় কাইরঙ থেকে নেপালে যাওয়ার জন্য কোনও পরিবহন ব্যবস্থা নেই। কুলির মাধ্যমে নেপাল থেকে পণ্য আনা-নেওয়া করা হয়। অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার হচ্ছে বেশিরভাগ কুলিই মহিলা।

নেপালিরা তিব্বতের মধু নেওয়ার সময় একটা নাটকীয় ঘটনার সাক্ষী হলাম আমরা। তিব্বতে মধু সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ করেছে সরকার। কারণ তাদের ধর্ম পশু-পাখির নিজস্ব খাবার কেড়ে নেওয়াকে বৈধতা দেয় না। কিন্তু পৃথিবীর সব জায়গার মতো এখানেও আইন ভাঙা হয়। তবে এক্ষেত্রে তিব্বতীরা সরাসরি আইন ভাঙে না। নেপালিরা যখন মধু সংগ্রহ করে তখন তারা শুধু তাদের মৌন সমর্থন দিয়ে যায়। এমন কি পনপোরাও ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে নেপালিদের কাছ থেকে এসব মধু আবার কিনে নেয় তিব্বতীরা।

যাই হোক, কাইরঙে প্রায় নয় মাস থাকলাম। এ-সময় তিব্বতীদের অনেক রীতি-নীতি সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছি। এই নয় মাসে অনেক তিব্বতীর সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

কীভাবে নয় মাস কেটে গেল সেটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় হঠাৎ একদিন বুঝতে পারলাম শরৎকাল এসে পড়েছে। এখন কাইরঙকে বিদায় জানাতে হবে। এবার শুধু

BanglaBook.org

রাতে এগোবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। এজন্য একটা ল্যাম্প দরকার।

তবে কীভাবে জানি না গ্রামবাসীর ধারণা হয়েছে আমাদের উদ্দেশ্য ভালো না। এজন্য সারাক্ষণ আমাদের ওপর নজরদারি করছে ওরা। ল্যাম্প বানাবার কাজটা গোপনে সারতে চাই। গ্রামবাসীর নজরদারি থেকে বাঁচার জন্য একদিন আফশেনেইটরকে নিয়ে একটু দূরে হাঁটতে গেলাম। কেউ পিছু নেয়নি বুঝতে পেরে লণ্ঠন বানাবার কাজ শুরু করলাম আমি। কিছুক্ষণ পর চলনসই একটা লণ্ঠন তৈরি করে ফেললাম।

ইতিমধ্যে সব প্রস্তুতি শেষ হয়ে গেছে আমাদের। তিব্বতীদেরকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিলাম আমি। সেটা পেলেই এবার নিজেদের পথে যাত্রা শুরু করতে পারব।

*

১৯৪৫ সাল, নভেম্বর ৬। সকালবেলা গ্রামবাসীদের চোখের সামনে দিয়ে রওনা হয়ে গেল আফশেনেইটর। আগে থেকেই এরকম পরিকল্পনা করা ছিল। ও চলে যেতেই টাকা উদ্ধারের কাজে লেগে গেলাম। কিন্তু তিব্বতীরা আমার টাকা ফেরত দিতে চাইছে না। আফশেনেইটরকে এভাবে চলে যেতে দেখে তাদের সন্দেহ হয়েছে। এমন কি কর্তৃপক্ষও কিছুটা আন্দাজ করতে পারছে যে আমরা তিব্বতের ভিতরদিকে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছি। কোনওভাবে যদি তিব্বতের ভিতরে আমরা ঢুকতে পারি, তাহলে তার সব দায় বর্তাবে কাইরঙ কর্তৃপক্ষের ওপর। এজন্য গ্রামবাসীকে আমার ওপর খেপিয়ে তুলছে কর্তৃপক্ষ।

একটু পর বুঝতে পারলাম আফশেনেইটরকে খোঁজার জন্য লোক পাঠানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ আমাকে জেরা শুরু করে দিয়েছে। তাঁদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম আফশেনেইটর দূরে কোথাও যায়নি। কিছুদিন পরেই সে ফিরে আসবে। কিন্তু তাঁরা আমার কথা মানতে নারাজ।

পরদিন সকালে আবার টাকা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সামান্য কিছু টাকা পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো আমাকে। ইতিমধ্যে বুঝে গেছি আফশেনেইটর না আসা পর্যন্ত আমার সব টাকা ফেরত দেবে না ওরা।

যাই হোক, নভেম্বর মাসের এগারো তারিখ। আজ সন্ধ্যেবেলা বিদায় জানাব কাইরঙকে। কিন্তু গ্রামবাসীর আচরণ ভালো ঠেকছে না আমার। লক্ষ করলাম বাসার চারদিকে স্পাইয়ের মতো তিব্বতীরা ঘোরা-ফেরা করছে। এমন কি আমি যে বাসায় আছি তারাও কড়া নজর রাখছে আমার ওপর। কোনওভাবেই আমাকে যেতে দেবে না তারা।

রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। কিন্তু অবস্থার কোনও পরিবর্তন হলো না। পালাতে হলে চালাকির আশ্রয় নিতে হবে। অভিনয় শুরু করলাম আমি। চিৎকার করে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললাম, 'ঘরের ভেতর যে পরিবেশ তাতে আমি ঘুমাই কীভাবে! বাধ্য হয়ে এখন জঙ্গলে রাত কাটাতে হবে!' কথাটা বলেই জিনিস-পত্র

BanglaBook.org

গোছাতে শুরু করলাম।

এ-সময় বাসার মালিক আর তার মা আছাড় খেয়ে পড়ল আমার সামনে। হাত-পা ধরে অনুরোধ করছে আমি যাতে না যাই। আমি চলে গেলে তাদেরকে নাকি গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হবে। কিন্তু আমাকে গলাতে না পেরে চিৎকার দিয়ে কান্না জুড়ে দিল ওরা। ভাগ্য খারাপ হলে যা হয়। ভাবতেই পারিনি এরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হবে। বাইরে থেকে পরিষ্কার তাদের কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই কিছু একটা করতে হবে আমাকে।

জানালা দিয়ে কয়েকজন মঙ্গোলিয়ানকে দেখতে পেলাম। কান্নার আওয়াজ শুনে টর্চের আলো ফেলছে তারা। কিছুক্ষণ পরই হাঁপাতে হাঁপাতে দু'জন মেয়র এলেন। পনপোর কাছ থেকে একটা ম্যাসেজ নিয়ে এসেছেন। ম্যাসেজে লেখা আছে সকালে আমাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে দেওয়া হবে, কিন্তু রাতে নয়। বুঝতে পারলাম কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। উত্তরে মেয়রকে কিছুই বললাম না। সবকিছু তুচ্ছ জ্ঞান করে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে বাসার বাইরে। বিস্ফোরিত চোখে আমাকে চলে যেতে দেখছে তারা। কয়েকজন চিৎকার করে উঠল, 'সে চলে যাচ্ছে, সে চলে যাচ্ছে!' কিন্তু ওই পর্যন্তই। সরাসরি কেউ বাধা দিতে আসছে না।

দ্রুত পা চালিয়ে নেপাল সীমান্তের দিকে যাচ্ছি। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটলাম। কেউ আমার পিছু নিয়ে থাকলে আমাকে নেপালের দিকে যেতে দেখে এতক্ষণে নিশ্চয়ই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। আরও কিছুক্ষণ হাঁটার পর ঘুরপথে কাইরঙকে পাশ কাটালাম। সকালে আফশেনেইটরের সঙ্গে দেখা হলো। দিনের বেলা লুকাবার জন্য ভালো একটা জায়গা খোঁজা শুরু করলাম আমরা।

*

টানা কয়েক রাত হাঁটার পর ডিজংঘাকে পাশ কাটিয়ে নতুন একটা গ্রামে পৌঁছালাম। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ব্রহ্মপুত্র নদী। কিন্তু নদীটা কীভাবে পার হব সে ব্যাপারে খুব চিন্তায় আছি। আশা করছি সেখানে আমরা যখন পৌঁছাব তখন হয়তো নদীর পানি জমে বরফ হয়ে থাকবে।

দুটো ব্যাপার সব সময় মাথায় রাখতে হচ্ছে। এক, যত দ্রুত সম্ভব এগোতে হবে আমাদের। দুই, কর্তৃপক্ষ আছে এমন গ্রাম এড়িয়ে চলতে হবে।

যাই হোক, আরও কয়েক দিন হাঁটার পর জনবসতি দেখতে পেলাম। গ্রামবাসী আমাদেরকে ইন্ডিয়ান ধরে নিয়েছে। খুশিমনেই রসদ বিক্রি করল ওরা। এমন কি থাকবার জায়গা পেতেও খুব একটা বেগ পেতে হলো না। এখানে পুরো একদিন থাকলাম। স্থানীয় পনপো আমাদের ব্যাপারে মোটেও কৌতূহল দেখালেন না। এখান

BanglaBook.org

থেকে একটা ষাঁড়ও কিনলাম আমরা।

একদিন বিশ্রাম নেওয়ার পর আবার যাত্রা শুরু। কিছুদিন হাঁটার পর চাকাইউংলা পাহাড়ে পৌঁছালাম। রাস্তায় কারও সঙ্গে দেখা হলো না।

তিন দিন হাঁটার পর মেনখ্যাপ মে নামে একটা গ্রামে পৌঁছালাম। নিজেদেরকে আবার ইন্ডিয়ান বলে পরিচয় দিলাম আমরা। গ্রামবাসীর কাছ থেকে কিছু খড় আর সাম্বা কিনলাম। এখানকার মানুষ খুব কষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন করে। যব আর মসুর ডালের খেতগুলো পাথরে ভরা থাকায় সামান্য পরিমাণ ফসল ফলাতেও অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় ওদের। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করায় এমনিতেই মেজাজ খিটখিটে থাকার কথা। কিন্তু আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করল তারা। সন্ধ্যের সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে বসে বিয়ার খেলাম।

মেনখ্যাপ থেকে বিদায় নিয়ে টানা এক ঘন্টা হাঁটার পর টিংগ্রি সমতল ভূমিতে পৌঁছালাম। পিছনে ফেলে এসেছি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়–মাউন্ট এভারেস্ট।

প্রথমে পাহাড়টা দেখে নিজেদের অজান্তেই শ্বাস বন্ধ করে ফেলেছিলাম। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাউন্ট এভারেস্টের স্কেচও আঁকা হয়েছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে পাহাড়টা দেখছি নিশ্চিতভাবে বলা যায় এর আগে কোনও ইউরোপিয়ান এভারেস্টকে এই অবস্থান থেকে দেখেননি।

আরও কিছুক্ষণ থাকবার ইচ্ছা ছিল ওখানে। কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব আমাদের পরবর্তী গন্তব্য আঠারো হাজার ফুট উঁচু কোরা পাহাড়ে উঠতে হবে। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় জানাতে হলো মাউন্ট এভারেস্টকে।

এই মুহূর্তে আমরা পর্বতের পাদদেশে খরজি নামে একটা ছোট গ্রামে আছি। এখনই পাহাড়ে ওঠার কোনও ইচ্ছা নেই আমাদের। ঠিক করলাম রাতটা বিশ্রাম নেব।

পরদিন দুপুরের মধ্যে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়লাম। খুব দ্রুত পা চালিয়ে সেদিনই পৌঁছে গেলাম ব্রহ্মপুত্র নদীতে। আশা করেছিলাম বরফ জমে গেলে খুব সহজেই নদীটা পার হতে পারব। কিন্তু সে আশায় গুড়ে বালি। পানি একেবারে টইটম্বুর হয়ে আছে নদীতে। তারপর হঠাৎ ওপারে কয়েকটা আশ্রম দেখতে পেলাম আমরা। ক্ষীণ একটা আশার আলো জেগে উঠল মনে। ওপারে যেহেতু আশ্রম আছে, কাজেই পারাপারের একটা উপায় না থেকে পারে না। কিছুক্ষণ পর একটা ঝুলন্ত সেতু চোখে পড়ল আমাদের।

টানা দুদিন হাঁটার পর স্যাঙস্যাঙ যেভু পৌঁছালাম। এরপর গারটোক থেকে লাসা যাওয়ার যে কাফেলা রোড আছে সেটা ধরে এগোলাম। এখন চিনে যেতে চাইলে কমপক্ষে কয়েক হাজার মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে আমাদের। কিন্তু আমাদের হাতে মাত্র আশি রুপি থাকায় চিনে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। যাওয়ার ইচ্ছেও যে আছে, তাও নয়–কাজেই লাসাই হতে যাচ্ছে আমাদের গন্তব্য।

BanglaBook.org

*

পি.ও.ডব্লিউ ক্যাম্পে থাকার সময় লাসার ওপর লেখা যত বই পেয়েছি সব গোগ্রাসে গিলেছি। সবগুলো বইয়ের লেখকই ইংরেজ। একটা বই থেকে জানতে পেরেছি ১৯০৪ সালে অল্প কিছু সদস্য নিয়ে একটা কষ্টকর অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল। দলটা তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যন্ত যায়। শুধু তাই নয়, গত বিশ বছরে অনেক ইউরোপিয়ান লাসায় গেছেন। ওই সময় পৃথিবীর মানুষ লাসা সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানত না। দালাই লামার বাড়ি নিয়ে অদম্য কৌতূহল ছিল মানুষের মনে।

আমরা এখন সেই নিষিদ্ধ, রহস্যঘেরা শহর লাসা থেকে খুব একটা দূরে নই। যাই ঘটে যাক, আর কোনও বাধাই আমাদের লাসায় যাওয়া ঠেকাতে পারবে না।

কিন্তু কোন রাস্তা ধরে লাসায় যাব সেটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছি। হাইরোড হয়ে গেলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লাসায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু তাতে আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি। শিগাতসে হচ্ছে তিব্বতের দ্বিতীয় বড় শহর। এখানে তিব্বতী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই শহরটাকে না হয় পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। কিন্তু তারপর? এরপর যে-সব জায়গা পড়বে সেখানেও কর্তৃপক্ষের কারও না কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। এত বড় ঝুঁকি নেওয়ার কোনও মানে হয় না।

অনেক ভাবনা-চিন্তা করে ঠিক করলাম উত্তরদিকের সমতলভূমি চ্যাঙথ্যাঙ হয়ে এগোব আমরা। এই জেলায় অনেক যাযাবর থাকে।

যাই হোক, ১৯৪৫ সাল, ২ ডিসেম্বর স্যাঙস্যাঙকে বিদায় জানালাম আমরা। এখানে থাকার সময় কিছু শেরপার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। তিব্বতে তাদের ডাক নাম 'পাহাড়ের বাঘ'। আমরা কীভাবে পরবর্তী গন্তব্য পৌঁছাব সে ব্যাপারে নানারকম উপদেশ দিল তারা। যদিও আমাদের আসল পরিকল্পনা সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না।

স্যাঙহ্যাঙ থেকে চলে আসার দশদিন পর ডিসেম্বর মাসের ১৩ তারিখে ল্যাবর‍্যাঙ ট্রোভা পৌঁছালাম আমরা। এই দশদিনে যাবাবরদের বিচিত্র জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

গ্রামটাতে মাত্র একটা বাড়ি। ভিতরে ঢুকে যাযাবরদের সঙ্গে কথা বললাম। জানতে পারলাম বাড়িটা ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কাছাকাছি ওঁদের তাঁবুও আছে। তাঁবুতে গরম বেশি বলে বেশিরভাগ সময় এখানেই থাকেন ওঁরা।

যাই হোক, ওঁদের কাছ থেকে জানতে পারলাম এখানে সরকারী কর্মকর্তার বাড়ি আছে। ভাইয়ের হাতে সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কিছুদিনের জন্য ল্যাবর‍্যাঙ ট্রোভার বাইরে গেছেন তিনি।

এতক্ষণ হালকা আলোচনা হচ্ছিল। হঠাৎ আমাদের পরবর্তী গন্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইলেন ওঁরা। নিজেদের পরিচয় দিলাম তীর্থযাত্রী বলে। আমাদের কথা শুনে খুশিই হলেন সবাই। আমরা যে লাসায় যাচ্ছি এ-কথাও গোপন করলাম না। মনে

BanglaBook.org

করেছিলাম একথা শুনে ওঁদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে।

কিন্তু আমাদেরকে অবাক করে দিয়ে ব্যাপারটা ওঁরা স্বাভাবিকভাবেই নিলেন। জানতে চাইলেন কোন রাস্তা ধরে আমরা লাসায় যেতে চাই। আমরা কাফেলার পথ ব্যবহার করব না, এ-কথা শুনেই আতঙ্কিত হয়ে মাথা নাড়লেন ওঁরা। জানালেন দ্রুত এবং সহজে লাসায় যেতে চাইলে শিগাসটি হয়ে যেতে হবে। আমার উত্তর তৈরিই ছিল। বললাম যাত্রাটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমরা কঠিন পথ ধরেই যেতে চাই। আমার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে কিছু উপদেশ দিলেন ওঁরা।

দু'ভাবে আমরা লাসায় পৌঁছাতে পারি। প্রথমটা খুব কঠিন। অসংখ্য পাহাড় আর জনমানবহীন গ্রাম পার হয়ে যেতে হবে। আর দ্বিতীয়টা সহজ হলেও যেতে হবে 'খাম্পা'দের গ্রামগুলোর ভিতর দিয়ে।

এই খাম্পা নামটা আমাদের কাছে একটা রহস্য। যাযাবরদের কাছে আগেই এই নামটা শুনেছি। খাম্পা প্রসঙ্গ এলেই সবাই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। অশুভ একটা ব্যাপার তো আছেই। কিন্তু সেটা কী তা আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

আমাদের মেজবানও খাম্পা নামটা বলার সময় কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ এ-ব্যাপারে আলোচনা করার পর অবশেষে আমরা বুঝতে পারলাম আসলে খাম্পা হচ্ছে ডাকাত দল।

যাই হোক, ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আমরা লাসায় যাওয়ার জন্য সহজ পথটাই বেছে নিলাম। দুদিন মেজবানের বাসায় থেকে আবার যাত্রা শুরু হলো আমাদের।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পাঁচ

অভিযানের সবচেয়ে কষ্টকর সময়

ডাকাতদের ফাঁদে আটকা পড়লাম / বাধ্য হয়ে আবার ফিরতে হলো মেজবানের আশ্রয়ে / নতুন রাস্তা ধরে রওনা হলাম / কাফেলার সঙ্গে পথচলা / অবশেষে গাইড পেলাম/ অসম্ভব খারাপ আবহাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ / এগিয়ে যাচ্ছি সেই নিষিদ্ধ শহরের দিকে–লাসায়।

কিছুদিন নির্বিঘ্নেই এগোলাম। তারপর একদিন হঠাৎ অদ্ভুত পোশাক পরা এক লোকের সঙ্গে দেখা হলো। সে জানতে চাইল আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাচ্ছি। স্থানীয় যাযাবরদের সঙ্গে তার ভাষার কোনও মিল নেই। সংক্ষেপে জানালাম, আমরা তীর্থযাত্রী। এ-কথা শুনে নিজের পথে চলে গেল সে। ইতিমধ্যে আমাদের সন্দেহ হয়েছে সে একজন খাম্পা হতে পারে।

কয়েক ঘন্টা পরে একই ধরনের পোশাক পরা আরও দুজন লোককে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখলাম। এখনও তারা আমাদের কাছ থেকে বেশ দূরে। পরিস্থিতি ভালো বলে মনে হচ্ছে না। তাদের প্রতি কোনও রকম আগ্রহ না দেখিয়ে নিজেদের পথে হেঁটে যাচ্ছি। আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ওরা।

আরও কয়েক ঘন্টা হাঁটার পর একটা তাঁবু দেখতে পেলাম। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা পার হয়ে রাত নেমে এসেছে। ভাগ্য ভালো যে তাঁবুতে একটা যাযাবর পরিবারের দেখা পেলাম। আমাদের সঙ্গে ভালোই ব্যবহার করলেন ওঁরা।

সন্ধ্যার সময় ওঁদের সঙ্গে ডাকাত প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করলাম। ডাকাতদের হামলা এখানে একটা নিয়মিত ব্যাপার। আমাদের মেজবান অনেকদিন ধরে এই এলাকায় থাকায় ডাকাতদের সম্পর্কে এত কিছু জানেন যে ইচ্ছা করলে অনায়াসে একটা মহাকাব্য লিখে ফেলতে পারবেন। গর্ব করে ডাকাতের কাছ থেকে পাওয়া একটা মেনলিচার রাইফেল দেখালেন। তবে এর জন্য তাঁর অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। একটা বা দুটো নয়, এই রাইফেলের বদলে গুণে গুণে পুরো পাঁচশো ভেড়া হারাতে হয়েছে

BanglaBook.org

তাঁকে। তবে এরপর ডাকাতরা আর কখনো তাঁকে বিরক্ত করতে আসেনি।

মেজবানের কাছ থেকে ডাকাতদের হামলার ধরন সম্পর্কে জানতে পারলাম। প্রথমে একটা নির্দিষ্ট এলাকায় গিয়ে সেখানে তিন-চারটা তাঁবু টাঙিয়ে ঘাঁটি গাড়ে খাম্পারা। তারপর সেখান থেকে রাইফেল আর তলোয়ার নিয়ে সদলবলে হামলা চালায় যাযাবরদের তাঁবুতে। প্রতিবার একটা করে তাঁবুতে হামলা করে ওরা। আতঙ্কিত হয়ে নিজেদের সব সহায়-সম্পত্তি ডাকাতদের হাতে তুলে দেয় যাযাবররা। ডাকাতরা পেট ভরে খায়, পকেট ভারী করে খোলা একটা জায়গায় চলে যায়। সংশ্লিষ্ট পরিবারটিকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে যায় ওরা। এভাবে এলাকার সব তাঁবুতে আক্রমণ শেষ করার পর আবার অন্য জায়গায় গিয়ে ঘাঁটি গাড়ে ওরা। সঙ্গে কোনও অস্ত্র না থাকায় এভাবে নিঃস্ব হওয়াকে নিজেদের নিয়তি বলে মেনে নিয়েছে যাযাবর সম্প্রদায়। আর এসব এলাকা শহর থেকে অনেক দূরে হওয়ায় সরকারও এক্ষেত্রে নিরুপায়। আমাদের মেজবান জানালেন, খাম্পারা অনেক সময় খুন করতেও পিছপা হয় না।

জানি পরবর্তী গন্তব্যে যেতে হবে ডাকাতদের এলাকা হয়ে, কাজেই আলোচনাটা আমাদের জন্য সুখপ্রদ নয়। কোনওভাবে যদি তাঁর রাইফেলটা কিনতে পারতাম! মনে মনে ভাবলাম আমি। কিন্তু এই আশার বিপরীতে শুধু একরাশ হতাশা গ্রাস করল আমাকে।

রাইফেল কেনা তো দূরের কথা, পকেটে খাবার পয়সাই নেই। দুধের সাধ ঘোল দিয়ে মেটাতে চাইলাম, অর্থাৎ সঙ্গে যে তাঁবুর খুঁটি আছে সেটাকে অস্ত্র ধরে নিয়ে মনকে কিছুটা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মন এতোটা অবুঝ হবে কেন যখন সে জানে ওই খুঁটি একটা পোষ-মানা কুকুরের মনেও কোনও ভয় জাগাতে পারবে না!

যাই হোক, মনে শঙ্কা নিয়েই পরদিন সকালে রওনা হলাম আমরা। কিছুক্ষণ হাঁটার পর পাহাড়ের ওপরে পিস্তল হাতে একটা লোককে দেখতে পেলাম। ভয়ে আত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে গেল আমাদের। তবে লোকটাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে স্রেফ নিজেদের পথে হেঁটে গেলাম। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম রহস্যময় লোকটা আমাদের পিছু নিয়ে আসছে না।

সন্ধ্যের দিকে কিছু তাঁবু চোখে পড়ল। প্রথম তাঁবুর কাছে গিয়ে ডাকাডাকি শুরু করলাম আমরা। কিছুক্ষণ পর একটা যাযাবর পরিবার বেরিয়ে এলো তাঁবু থেকে। চোখে-মুখে আতঙ্ক নিয়ে হাত ইশারায় অন্য তাঁবুতে যেতে বলছে। ওখান থেকে চলে এলাম আমরা। ওদের এরকম আচরণের কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না।

যাই হোক, পরের তাঁবুতে গিয়ে ডাকাডাকি করতে কিছু মানুষ বেরিয়ে এলো। দেখে মনে হলো এরা আমাদেরকে হতাশ করবে না। কিন্তু এরপর ওরা যা শুরু করল তাতে শুধু অবাক না, কিছুটা সন্দেহও হলো আমাদের। তাড়াতাড়ি আমাদের ব্যাগগুলো

BanglaBook.org

তাঁবুর ভিতরে নিয়ে গেল ওরা। এর আগে কোনও যাযাবর এরকম করেনি। ভিতরে ঢুকে বুঝতে পারলাম যাযাবর নয়, বাঘের খাঁচার ভিতর ঢুকে পড়েছি। আমাদের অবস্থা এখন ফাঁদে আটকা পড়া ইঁদুরের মতো। তাঁবুর ভিতরে দুজন পুরুষ, একজন মহিলা আর একটা ছোট ছেলে আছে। এরা খাম্পা।

এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যেভাবেই হোক আমাদেরকে শান্ত থাকতে হবে। জানি চেষ্টা করলে সময়মতো এখান থেকে বের হওয়ার একটা উপায় ঠিকই পেয়ে যাব।

তাঁবুর ভিতর আগুনের পাশে বসে আছি। কিছুক্ষণ পর আশপাশের তাঁবু থেকে অনেক যাযাবর আসতে শুরু করল। আমাদের ব্যাপারে তাদের কৌতূহলের কোনও সীমা নেই। ছোট-বড় নানারকম ব্যাগ আছে আমাদের সঙ্গে। ব্যাগগুলো একসঙ্গে রাখার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর ডাকাতদের জানালাম, আমরা তীর্থযাত্রী, এখান থেকে লাসায় যেতে চাই। কথাটা শুনে তাদের একজনকে গাইড হিসাবে নেওয়ার জন্য চাপাচাপি শুরু করল ওরা। নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছে গাইড নিলে অনেক সহজে আমরা লাসায় পৌঁছাতে পারব।

গাইডের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলাম কৌশলে সে আমাদেরকে দক্ষিণদিক দিয়ে লাসায় নিয়ে যেতে চাইছে। তার চালাকি ধরতে পেরে আমি আর আফশেনেইটর চোরাচোখে দৃষ্টি বিনিময় করলাম। এই প্রথম ভালোভাবে তাকালাম লোকটার দিকে। বেঁটে হলেও, অত্যন্ত শক্তিশালী। বেল্টের সঙ্গে আটকানো বিশাল তলোয়ারটাও আমাদের চোখ এড়াল না। ডাকাত না হয়ে সে যদি সত্যি গাইড হতো!

যাই হোক, এখন আমরা ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি। কাজেই ওদের প্রস্তাব মেনে না নিয়ে কোনও উপায় নেই। বিরোধিতা করলে খুন হয়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

ধীরে ধীরে ভিড় কমতে শুরু করল তাঁবু থেকে। কিছুক্ষণ পর শোয়ার প্রস্তুতি নিলাম। এই পরিস্থিতিতে ঘুমানো সম্ভব নয়। তবে বিছানায় শুয়ে কিছুটা বিশ্রাম তো নেওয়া হবে।

কিন্তু সেটাও সম্ভব হচ্ছে না একজন ডাকাত বিরক্ত করায়। আমার র‍্যাকস্যাকটা ধরে টানাটানি শুরু করল সে। বালিশ হিসাবে ব্যবহার করবে ওটা। তবে আমিও নাছোড়বান্দা! কিছুতেই র‍্যাকস্যাক দেবো না তাকে। ওরা হয়তো সন্দেহ করছে ওটার ভিতরে পিস্তল আছে।

চিন্তাটা মাথায় আসতেই অভিনয় শুরু করলাম। এমন আচরণ করছি যাতে ওদের সন্দেহ আরও গভীর হয়। পিস্তল থাকা মানুষকে সহজে আক্রমণ করার সাহস পাবে না ওরা। কিছুক্ষণ পর হাল ছেড়ে দিল লোকটা।

সারারাত ঘুমালাম না। তবে এরজন্য খুব একটা কষ্ট করতে হলো না। কারণ একজন খাম্পার স্ত্রী চড়া গলায় প্রার্থনা করল রাতভর। আমার মনে হলো কাল সকালে তার স্বামী আমাদের সঙ্গে যে অঘটন ঘটাবে সেটার জন্য আগে থেকেই সৃষ্টিকর্তার কাছ

BanglaBook.org

থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে সে।

সকাল হতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। তাঁবুর পরিবেশটা শান্তই মনে হচ্ছে। পকেট আয়নার বিনিময়ে ষাঁড়ের মগজ কিনলাম। সকালের নাস্তা হিসাবে ভালোই লাগল খেতে। এবার যেতে হয়।

খারাপ কিছু ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় অস্থির হয়ে আছি। তবে সেটা চেপে রাখতে পারলাম। ব্যাগ গোছানো শুরু করতেই আমাদের দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকাল একজন ডাকাত। মুখে কিছু না বললেও ভয় হচ্ছে শেষ মুহূর্তে খারাপ কিছু করে বসতে পারে সে। ইতিমধ্যে আফশেনেইটর তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেছে। ব্যাগগুলো তাকে দেওয়ার জন্য আমিও বের হতে যাচ্ছি। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম রাগে বিকৃত হয়ে আছে ডাকাতটার চেহারা। বুঝতে পারছি যখন-তখন হামলা হতে পারে আমার ওপর।

যাই হোক, তাকে পাত্তা না দেওয়ার ভান করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। ষাঁড়ের পিঠে ব্যাগগুলো রেখে গাইডের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকালাম। কিন্তু কোথাও তার টিকিটিরও দেখা পেলাম না। কিছুটা স্বস্তিবোধ করছি।

খাম্পাদের পরিবার আমাদেরকে দক্ষিণ দিক দিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিল। ওখানে একদল যাযাবর ক্যারাভ্যান নিয়ে লাসায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদেরকে কথা দিলাম দক্ষিণ দিক দিয়েই লাসায় যাব আমরা।

কিছুদূর যাওয়ার পর হুঁশ হলো কুকুরটা সঙ্গে নেই। কখনো ডাকতে হয় না, রওনা হলেই আমাদের পিছু নেয় সে। কুকুরের খোঁজে চারপাশে তাকাতেই পিছনে তিনজন ডাকাতকে দেখতে পেলাম। এতক্ষণ আমাদেরকে অনুসরণ করছিল তারা। আমাদের ধারণা ছিল এরকম কিছু একটা ঘটবে। তাই খুব একটা প্রতিক্রিয়া হলো না। স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে যাচ্ছি।

কিছুক্ষণ পর কাছে এসে ডাকাতরা জানাল, আমাদের মতো তারাও যাযাবরদের তাঁবুতে যাচ্ছে। হাত ইশারায় জায়গাটা দেখাল। সেদিকে তাকিয়ে দেখি আকাশে ধোঁয়া উঠছে। ধক করে উঠল বুকটা। ব্যাপারটা কোনওভাবেই স্বাভাবিক নয়। আগে কোনও যাযাবরের তাঁবুর ওপরে ধোঁয়া উঠতে দেখিনি।

কোথায় যাচ্ছি আমরা? ওখানে কি আদৌ যাযাবররা আছে! কুকুরটার কথা জানতে চাইলাম। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, তাদের তাঁবুতে আছে ওটা। ইচ্ছা করলে আমাদের মধ্যে যে-কোনও একজন নিয়ে আসতে পারে ওটাকে।

এবার ওদের প্ল্যানটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। আমাদের দুজনকে একসঙ্গে আক্রমণ করবার সাহস পায়নি ডাকাতরা। তাই ইচ্ছা করে কুকুরটাকে তাঁবুতে আটকে রেখেছে। আফশেনেইটর আর আমাকে আলাদা করতে চাইছে। আর যে জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠছে সেখানে সম্ভবত তাদের সঙ্গী-সাথীরা আছে। একবার ওখানে নিয়ে যেতে পারলে হয়, হাসতে হাসতে আমাদেরকে খুন করবে ওরা। কেউ

BanglaBook.org

কোনওদিন জানতে পারবে না কীভাবে আমরা গায়েব হয়ে গেলাম।

এর আগে যে যাযাবরের তাঁবুতে ছিলাম তারা আগেই আমাদেরকে সতর্ক করেছিল। কিন্তু তাদের কথা কানে তুলিনি। এখন সুদে-আসলে সেটার খেসারত দিতে হবে।

যেন কিছুই বুঝতে পারিনি, এরকম একটা ভাব করে সামনে এগোচ্ছি আমরা। আফশেনেইটরের সঙ্গে অনবরত কথা বলে যাচ্ছি। দুজন ডাকাত এখন আমাদের দু'পাশে হাঁটছে। আর ছেলেটা আছে একটু পিছনে। যে-কোনও মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে। দু'পাশে একনজর তাকিয়ে আমাদের সম্ভাবনা কতটুকু সেটা বোঝার চেষ্টা করলাম। ছুরির আঘাত থেকে বাঁচার জন্য ডাকাতরা দুই পরত ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে বানানো পোশাক পরে আছে। দুজনের বেল্টেই ঝুলছে লম্বা তলোয়ার। চেহারটা এমন নিরীহ করে রেখেছে যে দেখে মনে হচ্ছে ভাজা মাছটাও উল্টে খেতে জানে না।

এবার কিছু একটা ঘটবে। আফশেনেইটর রেগেমেগে বলল, এভাবে জেনেশুনে ফাঁদে পা দেওয়ার কোনও মানে হয় না। এখনই গন্তব্য পরিবর্তন করা উচিত আমাদের। ও বলতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরতি পথ ধরলাম। এখনও অনবরত কথা বলে যাচ্ছি ওর সঙ্গে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে কয়েক সেকেন্ডর বেশি লাগল না ডাকাতদের। ঘুরে আমাদের পথ আটকাল তারা। তারপর কঠিন সুরে জানতে চাইল কোথায় যাচ্ছি। দ্রুত এবং সংক্ষেপে বললাম কুকুরটাকে ফিরিয়ে আনব।

সম্ভবত আমার কথা বলার ধরন দেখে কিছুটা ভয় পেল ওরা। বুঝতে পারছে তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা যে-কোনও জায়গায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজেদের রাস্তা ধরে চলে গেল ওরা। হয়তো দলের অন্য সদস্যকে ব্যাপারটা জানাবে।

তাঁবুর কাছাকাছি যেতেই ডাকাতের স্ত্রী দড়ি দিয়ে বাঁধা কুকুরটাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। ডাকাতের সহধর্মিনী হলেও, আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করল সে। বুঝতে পারলাম স্বামীর পেশাকে মোটেও ভালো চোখে দেখে না সে।

যাই হোক, আবার রওনা হলাম। এখান থেকে সামনে এগোবার কোনও উপায় নেই। তাই যে রাস্তা ধরে আমরা ডাকাতদের এলাকায় এসেছি আবার সেই রাস্তা ধরেই ফিরে যাচ্ছি।

খুব দ্রুত পা চালিয়ে সন্ধ্যের সময় আবার সেই যাযাবরের তাঁবুতে ফিরে এলাম। ঠিক দুই রাত আগে এদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। আমাদের অভিজ্ঞতার কথা জানালাম তাদেরকে। এখনও সুস্থ আছি দেখে খুব অবাক হলো ওরা। গত কয়েকদিন খুব কঠিন সময় পার করতে হয়েছে। বাঘের খাঁচা থেকে পালিয়ে এরকম একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে রাত কাটাতে পারছি–অকৃতজ্ঞ হতে না চাইলে ভাগ্যকে একটা

BanglaBook.org

ধন্যবাদ দিতেই হবে।

পরদিন সকালে কোন দিক দিয়ে লাসায় যাব সে-ব্যাপারে মাথা ঘামাতে শুরু করলাম। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম লোকবসতি নেই এমন এলাকা ধরে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। যাযাবরের কাছ থেকে বেশি করে মাংস কিনলাম। রওনা হওয়ার পর সম্ভবত সাতদিন কোনও মানুষের দেখা পাব না আমরা।

ল্যাবরঙ ট্রোভা যাব না, তাই পাহাড়ের ওপর সংক্ষিপ্ত রাস্তা ধরলাম। উঁচু-নিচু হওয়ায় এগোতে খুব কষ্ট হচ্ছে। আশা করছি এই রাস্তা ধরে ঠিকভাবে এগোতে পারলে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে খুব বেশি সময় লাগবে না।

চারপাশটা ভালোভাবে দেখার জন্য এক জায়গায় একটু থামলাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম দুজন লোককে। আবার সেই খাম্পা! ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল। কিছুটা দূর থেকে অনুসরণ করছে। কী ঘটেছে বুঝতে সময় লাগল না। যাযাবরের তাঁবুতে গিয়ে আমরা কোন দিক দিয়ে লাসায় যাব সেটা জেনে নিয়েছে ওরা।

প্রশ্ন হলো এখন কী করব আমরা। দুজনের কেউই কোনও কথা বলছি না। চুপচাপ নিজেদের পথে হেঁটে যাচ্ছি। পরে দুজনেই স্বীকার করেছি মনে মনে যতটুক সম্ভব সহজভাবে নিজেদের মৃত্যুকে মেনে নিয়েছিলাম আমরা।

দ্রুত পা চালাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ষাঁড়গুলো শামুকের মতো ধীর গতিতে এগোচ্ছে। একটু পর পর পিছনে তাকাচ্ছি। কিন্তু এই মুহূর্তে দুই ডাকাতের কাউকে দেখতে না পেলেও নিশ্চিত হতে পারছি না চুপিচুপি, গা ঢাকা দিয়ে তারা আমাদের পিছু নিয়ে আসছে কি না। সঙ্গে অস্ত্র না থাকবার কুফলটা ভালোই টের পাচ্ছি এখন। ওদের ধারালো তলোয়ারের বিরুদ্ধে পাথর আর তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে কি ঘটবে সেটা ব্যাখ্যা করা বাহুল্য মাত্র।

বাঁচতে হলে অন্য কোনও বুদ্ধি বের করতে হবে। আপাতত বিরতিহীন হেঁটে যত দ্রুত সম্ভব ডাকাতদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানে কাজ। টানা একঘন্টা কোথাও না থেমে সামনে এগিয়ে গেলাম আমরা। তারপর পিছনে তাকিয়ে দেখি দুই ডাকাত মাটিতে বসে পড়েছে।

তাড়াতাড়ি রিজের ওপর উঠে পড়লাম আমরা। যুদ্ধ করতে হলে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না। এ-সময় ডাকাত দুজন সিধে হয়ে দাঁড়াল। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। কিছুক্ষণ পর ফিরতি পথ ধরে চলে গেল তারা। নিজের অজান্তেই শ্বাস বন্ধ করে ফেলেছিলাম। হুঁশ হলো ডাকাতরা চলে যেতেই বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার সময়। বিশ্রাম নেওয়ার ফুরসত নেই। চাঁড়গুলো নিয়ে আবার রওনা হলাম। সামনে পাহাড় দেখতে পাচ্ছি। ওদিকে যেতে পারলে সহজে কারও চোখে পড়ব না।

রিজের চূড়ায় ওঠার পর বুঝতে পারলাম ডাকাতরা কেন ফিরে গেছে। জীবনে কোনও দিন এরকম নির্জন জায়গা দেখিনি। অদ্ভুত এক দৃশ্য উন্মোচিত হয়েছে

BanglaBook.org

আমাদের সামনে। তুষার ঢাকা পাহাড়ের একটা বিশাল সাগরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বেশ দূরে ট্র্যান্সহিমালয় দেখা যাচ্ছে। সেখানে দাঁতের ফাঁকের মতো সরু সরু অসংখ্য গিরিখাদ আছে। এই গিরিখাদ ধরে এগোলেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছে যাব আমরা। গিরিপথটার নাম সিলালা। সর্বপ্রথম সেভেন হেডিন তাঁর ম্যাপে এই সিলালার কথা উল্লেখ করেন। এই গিরিপথ ধরে সোজা শিগাসটি চলে যেতে পারব।

টানা সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটলাম। এখনও নিশ্চিত হতে পারছি না ডাকাতরা সত্যি সত্যি চলে গেছে, নাকি চুপি চুপি অনুসরণ করছে। তুষারের ওপর চাঁদের আলো পড়ায় সবকিছু দিনের মতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

রাতের এই অভিযানের কথা ভুলব না কখনও আমি। এর আগে কখনও এরকম অভিজ্ঞতা হয়নি। শরীর আর মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। ডাকাতদের কাছ থেকে পালাতে পারলেও এই নির্জনতা সহ্য হচ্ছে না আমাদের।

বেশ অনেকদিন আগে থার্মোমিটারটা ফেলে দিয়েছি। ওটা থাকলেও অবশ্য কোনও লাভ হতো না। কারণ এখানকার তাপমাত্রা মাপা ওটার ক্ষমতার বাইরে। হিমাঙ্কের নিচে সর্বোচ্চ ত্রিশ ডিগ্রি পর্যন্ত মাপা যেত। সেভেন হিডেনের রেকর্ড অনুযায়ী বছরের এই সময় এখানকার তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে চল্লিশ ডিগ্রির কম হবে না।

কোনও বিরতি না নিয়ে একটানা হেঁটে যাচ্ছি আমরা। তবে মনটা পড়ে আছে অন্য জায়গায়। কল্পনার চোখে একটা গরম ঘর, সুস্বাদু গরম খাবার আর পানি দেখতে পাচ্ছি।

আফশেনেইটরের চিন্তাধারা আবার প্রবাহিত হচ্ছে অন্য খাতে। ডাকাতদের ওপর কঠিন প্রতিশোধ নেবে সে। প্রতিজ্ঞা করল প্রচুর অস্ত্র নিয়ে আবার এখানে ফিরে আসবে। ডাকাতদের যমের বাড়ি দেখিয়ে ছাড়বে সে।

শেষ পর্যন্ত আর পারলাম না। এবার একটু বিশ্রাম না নিলে স্রেফ মারা পড়ব। ষাঁড়ের পিঠ থেকে ব্যাগগুলো নামিয়ে একটু আড়ালে আছে এমন জায়গায় চলে এলাম। এখানেই ঘুমাব।

পরদিন সকালে উঠে আবার রওনা হলাম আমরা। পা টেনে টেনে কোনওমতে এগোচ্ছি। হঠাৎ মাথা তুলে তাকাতেই বেশ দূরে তিনটা কাফেলা দেখতে পেলাম। কোথায় সব ক্লান্তি গায়েব হয়ে গেল বলতে পারব না। পরবর্তী তিন ঘন্টা ঝড়ের বেগে পা চালিয়ে ক্যারাভ্যানের কাছে পৌঁছে গেলাম। কাফেলায় মোট পনেরোজন নারী-পুরুষ। আমাদেরকে দেখে খুব অবাক হলো ওরা। গরম সুপ খেতে দেওয়া হলো আমাদেরকে।

*

দিনের পর দিন কাফেলার সঙ্গ নিয়ে এগোচ্ছি। এই এলাকায় প্রায়ই হ্যারিকেন হামলা করে। আমাদের ছোট তাঁবুটা হ্যারিকেনের হামলা সামলাতে পারে না। তখন বাধ্য হয়ে

BanglaBook.org

অন্য কোনও নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে হয়। যাযাবরদের তাঁবু অবশ্য ষাঁড়ের চুল দিয়ে তৈরি হওয়ায় এক্ষেত্রে তারা বেঁচে গেছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, এরপর আর কোনওদিন তিব্বত অভিযান আসলে তিনটে ষাঁড়, একজন চালক, আর অবশ্যই যাযাবরদের একটা তাঁবু আনব সঙ্গে করে।

কাফেলার সঙ্গে থাকতে পেরে নিজেদেরকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে। সমস্যা বলতে শুধু ধীর গতি। যাযাবররা প্রতিদিন তিন-চার মাইলের বেশি পাড়ি দিচ্ছে না। কিন্তু এই গতিতে এগোলে আমাদের চলবে না। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম কিছুদিন পর এই কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে যাব। ইতিমধ্যে যাযাবরদের কাছ থেকে লাসা যাওয়ার ব্যাপারে খুঁটিনাটি সব তথ্য জেনে নিয়েছি।

আবার একা হয়ে গেলাম আমরা। প্রথমদিন পুরো চোদ্দো মাইল পথ পাড়ি দিলাম। আমাদের সামনে বিশাল একটা সমতল ভূমি পড়ে আছে। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু তাঁবু চোখে পড়ল। সামনে যেতেই বন্য চেহারার কিছু মানুষ বেরিয়ে এলো বড় একটা তাঁবু থেকে। রূঢ়ভাবে এখান থেকে চলে যেতে বলছে তারা। উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললাম না। প্রথমে হাত দুটো ওপরে তুলে তাদেরকে বোঝালাম যে আমরা নিরস্ত্র। তারপর নিজেদের পরিচয় দিলাম নিরীহ তীর্থযাত্রী হিসাবে। এতে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন তাঁবুর মালিক। বললেন রাতটা এখানে থাকতে পারব।

খাওয়া-দাওয়া সারার পর তাঁকে জানালাম কোন রাস্তা ধরে আমরা লাসায় যাব। শুনে খুব শুকনো গলায় বললেন, এতদিন আমরা খুন না হলেও এবার আমাদের মৃত্যু আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। যে রাস্তা ধরে লাসায় যেতে চাইছি সেটা ডাকাতদের স্বর্গরাজ্য। অস্ত্র ছাড়া সেখানে যাওয়া মানে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। শুনে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। জানতে চাইলাম এ-ব্যাপারে তার পরামর্শ কী।

আমাদেরকে শিগাসটি হয়ে লাসায় যাওয়ার উপদেশ দিলেন তাঁবুর মালিক। কিন্তু তাতে রাজী হলাম না আমরা। কিছুক্ষণ ভেবে অন্য একটা উপায় বের করলেন তিনি। আমাদেরকে জেলা কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। ডাকাতের এলাকা হয়ে যেতে চাইলে গার্ড নেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এক্ষেত্রে জেলা অফিসার আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন। তিনি একজন পনপো। এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে তাঁর তাঁবু।

কয়েক ঘণ্টা হাঁটার পর জেলা কর্মকর্তার তাঁবুতে পৌঁছে গেলাম। আমাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হলো। কিছুক্ষণ হালকা আলাপ চলার পর তাঁর সহকারীকে ডাকলেন তিনি। চারজন গোল হয়ে বসে আলোচনা শুরু করলাম আমরা। কিছু কাটছাট করে সংক্ষেপে নিজেদের অভিযান সম্পর্কে জানালাম। সবশেষে বললাম লাসায় যাওয়ার পথে ডাকাতদের হামলার শিকার হতে পারি। তাই মূলত নিরাপত্তা পাওয়ার আশায় তাঁদের কাছে এসেছি। সঙ্গে যোগ করলাম তিব্বতে ভ্রমণ করার সরকারী

BanglaBook.org

অনুমতিও আছে আমাদের।

এ-সময় শান্ত একটা ভাব নিয়ে পুরনো ট্র্যাভেল পারমিটটা পনপোর হাতে দিলাম। গারটোকে থাকবার সময় একজন গারপোনের কাছ থেকে জিনিসটা পেয়েছিলাম। কর্মকর্তা দুজন মনোযোগ দিয়ে সীলটা দেখলেন। মুখ দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারছি ট্র্যাভেল পারমিটটা তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে।

কিছুক্ষণ পর জানালেন আমরা তিব্বতে থাকতে পারব। তবে একটা ব্যাপার তাঁদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করছে। ট্র্যাভেল পারমিটে তিনজনের কথা লেখা আছে। তাঁদের প্রশ্ন দলের আরেকজন সদস্য কোথায়। জানালাম সে অসুস্থ থাকায় টেরাডুন হয়ে ইন্ডিয়ায় চলে গেছে সে।

আমার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হলেন তাঁরা। জানালেন এখান থেকে চলে যাবার সময় আমাদের সাথে একজন লোক দেওয়া হবে। সে আমাদেরকে উত্তরে, মেইন রোড পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

তিব্বতে থাকতে পারব, ক্রিসমাস পার্টিতে এর চেয়ে বড় উপহার আর কী হতে পারে। কাইরঙে থাকবার সময় কিছু চাল রেখে দিয়েছিলাম এই অনুষ্ঠানের জন্য। সেটা রান্না করে পনপো দুজনকে দাওয়াত দিলাম। দুজনই হাত বোঝাই করে নানা রকম উপহার নিয়ে এলেন। সন্ধ্যেবেলা বেশ মজা করে কাটালাম আমরা।

পরদিন সকালে একজন যাযাবর আমাদেরকে পরবর্তী গন্তব্যে পৌঁছে দিল। আমাদেরকে গ্রহণ করার জন্য আগে থেকেই একজন অপেক্ষা করছিল সেখানে। ঠিক একটা পণ্যের মতো আমাদেরকে তার কাছে হস্তান্তর করে যাযাবর লোকটা ফিরে গেল।

নতুন গাইডের সাহায্যে খুব দ্রুত এগোতে পারছি আমরা। রাস্তা-ঘাট ভালো জানা আছে, এরকম একটা গাইডের যে কি প্রয়োজন সেটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি। তবে দুশ্চিন্তার কথা হচ্ছে ডাকাতরা হামলা চালালে তাদেরকে ঠেকাবার মতো কোনও অস্ত্র নেই গাইডের কাছে।

বাতাস আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এখন স্থায়ী সঙ্গী হয়ে গেছে আমাদের। মনে হচ্ছে পুরো পৃথিবীজুড়ে প্রচণ্ড তুষার ঝড় শুরু হয়েছে, যেখানে তাপমাত্র কখনোই ত্রিশ ডিগ্রির ওপরে ওঠে না। এখানেই শেষ নয়, কাপড়ের অভাবও এখন একটা বড় সমস্যা। তবে অনেক কষ্টে ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি এক প্রস্থ কাপড় যোগাড় করতে পেরেছি নিজের জন্য। সেটা আকারে একটু ছোট হলেও কোনওরকমে চালিয়ে নিতে পারছি।

মাত্র দুই রুপি দিয়ে কাপড়টা কিনেছিলাম। যেখানে কাপড়ের কোনও দোকানই নেই, সেখানে দুই রুপি দিয়ে কারও কাছ থেকে গরম কাপড় পাওয়া—মানতেই হবে ভাগ্যের সহায়তা ছিল। তবে আমাদের জুতোর অবস্থা খুবই করুণ। ওটার আয়ু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তারচেয়ে বড় সমস্যা আমাদের কাছে এখন কোনও দস্তানাও নেই।

BanglaBook.org

ইতিমধ্যে আফশেনেইটরের হাতে ফ্রস্টবাইটের আক্রমণ শুরু হয়েছে। আর আমি ভুগছি পায়ের সমস্যায়।

যত কষ্টই হোক, সেটা ভুলে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। তবে এই অবস্থায় পরিকল্পনা মাফিক সামনে এগোতে হলে প্রচুর শক্তি দরকার। বারবার ইচ্ছা হচ্ছে কয়েক দিনের জন্য হলেও যাযাবরদের গরম তাঁবুতে বিশ্রাম নিই। দারিদ্র্য আর কঠোর বাস্তবতা তাদের জীবনের সব রস-কষ শুষে নিলেও, ওই জীবনটাই আমাদের কাছে বিলাসবহুল বলে মনে হচ্ছে।

তবে রসদ শেষ হবার আগে লাসায় পৌঁছাতে চাইলে এই আবেগকে মোটেও প্রশয় দেওয়া যাবে না। আর লাসায় পৌঁছাবার পর? কি ঘটবে তখন? থাক, কি দরকার! এই ব্যাপারে কিছু অনুমান করার ঝামেলায় না-ই বা গেলাম!

আমাদের সামনে এখন বরফে ঢাকা একটা লেক। পরে ম্যাপে চোখ বুলালেও ওটার কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি। আফশেনেইটর লেকটার একটা স্কেচ এঁকেছিল আমাদের ম্যাপে। স্থানীয় বাসিন্দারা লেকটাকে ইয়োচাবৎস নামে চেনে, অর্থ: বিসর্জনের পানি। সারি সারি অনেকগুলো বিশাল বরফের চাইয়ের পাদদেশে লেকটার অবস্থান।

মেইন রোডে পৌঁছাবার আগেই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত কিছু ডাকাতকে দেখতে পেলাম। লক্ষ করলাম প্রত্যেকের হাতেই ইউরোপিয়ান রাইফেল। অদ্ভুত ব্যাপার হলো তারা আমাদেরকে কিছুই বলল না। কোনও সন্দেহ নেই, আমাদের অবস্থা দেখে ওরাও করুণা বোধ করেছে। আমার ভ্রমণ কাহিনীটা যে সময়ের, তখন দারিদ্র্য দৃশ্যমান হলে সেটার অনেক সুবিধা পাওয়া যেত।

পাঁচদিন হেঁটে বিখ্যাত টাসাম রোডে পৌঁছালাম। মনে মনে সব সময় কল্পনা করছিলাম টাসাম রোডে পৌঁছাতে পারলে একটা নির্দিষ্ট হাইওয়ে পাব। তখন আর সামনে এগোতে মোটেও কষ্ট হবে না আমাদের। কিন্তু সে আশায় গুড়ে বালি! হাইওয়ে দূরে থাক, অনুসরণ করার মতো কোনও রাস্তাই তো খুঁজে পাচ্ছি না।

আসলে তিব্বত দেশটাই এরকম। বেশ কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেছে আমরা তিব্বতের ভিতরে ঢুকেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোথাও কোনও নির্দিষ্ট রাস্তা খুঁজে পাইনি। মাঝে-মধ্যে অবশ্য কিছু তাঁবু চোখে পড়ে। কাফেলাগুলো কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে পারে এসব তাঁবুতে। তবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার কোনও পরিকল্পিত রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও।

একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি। দুজন স্বাস্থ্যবান মহিলা গাইডের সাহায্যে আমরা টাসাম রোডে পৌঁছেছি। কিছুক্ষণ পর বিদায় জানিয়ে চলে গেল তারা। খুঁজে পেতে একটা খালি তাঁবু চোখে পড়ল। ভিতরে গিয়ে আগুন জ্বাললাম। এই পর্যন্ত আসতে পারায় ভাগ্যকে একটা ধন্যবাদ দেওয়াই যায়।

BanglaBook.org

অভিযানের সবচেয়ে কষ্টকর এবং বিপজ্জনক অংশ পিছনে ফেলে এসেছি। সামনে একটা খোলা রাস্তা আছে। সেটা ধরে এগোলে লাসা আর মাত্র পনেরো দিন হাঁটার পথ। যে আশা নিয়ে তিব্বতে ঢুকেছিলাম সেটা পূরণ হতে চলেছে। সেজন্য আমাদের খুশি হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ক্লান্তি আমাদের সবকিছু শুষে নিয়েছে। আনন্দ-ফুর্তি করতে হলেও কিছু শক্তি দরকার। পথের ক্লান্তি আমাদের সেই শক্তিও কেড়ে নিয়েছে। ফ্রস্টবাইট, টাকা আর খাবারের অভাব–এসব দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হয়ে আছি।

সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা কুকুরকে নিয়ে। বেচারার শরীরে হাড্ডি আর চামড়া ছাড়া কিছু নেই। নিজেদেরই খাবারের কোনও ঠিক নেই, যাও বা এক-আধটু পাচ্ছি সেখান থেকে কুকুরের জন্য কতটুকু রাখা সম্ভব সেটা সহজেই অনুমেয়।

ওটার পায়ের অবস্থা খুব শোচনীয়। আমাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতেও পারছে না। মাঝে-মধ্যে তার জন্য কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় আমাদের।

যাই হোক, পরদিন সকালে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আশার কথা হচ্ছে, এখন আমরা ক্যারাভ্যান রুট ধরে সামনে এগোতে পারব।

টাসাম রোড ধরে পুরো একটা দিন হাঁটলাম। এতদিন আমরা জনমানবহীন গ্রাম্য রাস্তা ধরে এগিয়েছি। ভেবেছিলাম টাসাম রোডে হয়তো মানুষের দেখা পাব। কিন্তু এখানেও সেই একই অবস্থা। পুরো একটা দিন কোনও মানুষের দেখা পেলাম না। প্রচণ্ড ঝড়, তুষার আর কুয়াশার তাণ্ডবে আমাদের অভিযান নরকতুল্য হয়ে যাচ্ছে। সৌভাগ্যই বলতে হবে, বাতাসটা পিছন দিক থেকে আসায় সামনে এগোতে সুবিধা হচ্ছে আমাদের। সামনে দিয়ে আসলে এক পাও এগোতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

সন্ধ্যের সময় একটা খালি তাঁবু দেখতে পেয়ে হাতে যেন চাঁদ পেয়ে গেলাম আমরা চারজন। আজ রাতেই ডায়রীতে কিছু কথা লিখে রাখলাম

ডিসেম্বর ৩১, ১৯৪৫। প্রচণ্ড তুষারঝড় আর কুয়াশা–তিব্বতে আসার পর এই প্রথম কুয়াশার দেখা পেলাম আমরা। বলা যায় অভিযানের সবচেয়ে কষ্টকর সময় পার করছি। রাস্তা খারাপ হওয়ায় ষাঁড়গুলো পিছলে যাচ্ছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাত জমে যাওয়ায় ওগুলোকে ধরে রাখতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। একবার পথ হারিয়ে ফেলায় দুই মাইল পিছিয়ে যেতে হয়েছে। সন্ধ্যের দিকে নায়াৎস্যাঙ রুট স্টেশনে পৌঁছালাম। সেখানে আটটা তাঁবু আছে। একটা তাঁবুতে রোড অফিসার আর তাঁর পরিবার থাকে। আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁরা।

তিব্বতে এটা আমদের দ্বিতীয় বছর। কেউ যদি হিসাব করতে বসে এই দুই বছরে আমাদের অর্জন কী তাহলে তাকে হতাশ হতে হবে। তিব্বতে আমরা এখনও অবৈধ। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সবসময় এড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। আমাদের উদ্দেশ্য নিষিদ্ধ শহর লাসায় যাওয়া। এখান থেকে সেটা খুব একটা দূরে নয়। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই

BanglaBook.org

খারাপ যে এত কাছাকাছি এসেও সেখানে আমরা আদৌ পৌঁছাতে পারব কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এই অবস্থায় কারও মন আবেগতাড়িত হয়ে নিজের বাসা আর পরিবারের কথা ভাবতেই পারে। তবে এই আবেগের প্রাবল্যে আমরা কঠিন বাস্তবতাকে ভুলে যাচ্ছি না। শরীর এবং মনকে ঠিক রাখার জন্য আমরা কঠিন সংগ্রাম করে চলেছি।

যাই হোক, নিজেদের মনের মতো সেইন্ট সিলভাসটার'স দিবস উদযাপন করলাম আমরা। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একদিন তাঁবুতে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। এতে আমাদের পশুগুলোও কিছুটা বিশ্রাম পাবে। পুরনো ট্র্যাভেল পারমিটটা এখানেও কাজে লাগল। রোড অফিসার খুব ভালো ব্যবহার করলেন আমাদের সঙ্গে। দেখভালের জন্য একজন চাকরকেও পাঠিয়ে দিলেন। পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার আর পানির ব্যবস্থাও হলো।

দুপুরবেলা খেতে বসার আগে তাঁবুর বাইরে কিছুটা হইচই শোনা গেল। জানতে পারলাম একজন পনপো আসছেন এদিকে। মনিবের যাতে কোনও কষ্ট না হয় সে জন্য আগে থেকেই তাঁর রাঁধুনি এসে পড়েছে। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সবাইকে জানাচ্ছে যে তার মালিক আসছেন।

আগেই বলেছি, তিব্বতে অনেক উঁচু পদের কর্মকর্তাকে পনপো বলা হয়। তাঁর এখানে আসাটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু বয়ে আনতে পারে। তবে এতদিনে আমরা বুঝে গেছি এশিয়ায় 'হাই অফিসিয়াল' হচ্ছে আসলে একটা ধারণা। এঁদের খুব বেশি কিছু করার ক্ষমতা নেই। পনপো আসার খবরে খুব একটা প্রতিক্রিয়া হলো না আমাদের।

তবে ভালো কিছু অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। কিছুক্ষণ পর ঘোড়ার পিঠে চড়ে পনপো এলেন। একদল চাকর ঘিরে রেখেছে তাঁকে। জানতে পারলাম সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর কাজ হচ্ছে বিভিন্ন পণ্য আনা-নেওয়া করা। আশার কথা এই মুহূর্তে তিনি কয়েকশ' টন চিনি আর কটন নিয়ে লাসায় যাচ্ছেন। আমরাও লাসায় যাচ্ছি, এটা জানার পর স্বাভাবিকভাবেই নানারকম প্রশ্ন শুরু করলেন তিনি।

শান্ত একটা ভাব নিয়ে ট্র্যাভেল পারমিটটা তাঁর হাতে দিলাম। সেটা নেড়েচেড়ে দেখছেন। তাঁর মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারছি আরেকটা কঠিন পরীক্ষায় উতরে যাচ্ছে ট্র্যাভেল পারমিটটা। কিছুক্ষণ পর পনপো জানালেন, আমরা তাঁর সঙ্গে লাসায় যেতে পারব। আনন্দে নেচে উঠতে ইচ্ছা হলো আমাদের।

আজ দুপুরেই তাঁর কাফেলা রওনা দেবে। বিশ্রাম চুলোয় যাক! তাড়াতাড়ি তল্পিতল্পা গোছাতে শুরু করলাম আমরা।

একজন ষাঁড় চালক আমাদের ষাঁড়কে দেখে মাথা নাড়ল। বোঝাতে চাইছে–বোঝা বহন করার আর কোনও ক্ষমতা নেই ওটার। অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে আমাদের ব্যাগগুলো ওদের ষাঁড়ের পিঠে নেওয়ার প্রস্তাব দিল সে। আমাদের ষাঁড় সঙ্গে থাকবে

BanglaBook.org

ঠিকই, তবে পিঠে কোনও বোঝা থাকবে না।

খুশি মনেই তার প্রস্তাবে রাজি হলাম আমরা। যাত্রা শুরু হলো আমাদের। ক্যারাভ্যানের সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাব আমরা। পনপো আর তাঁর চাকররা তাদের ঘোড়া পরিবর্তন করার জন্য কিছুক্ষণ পর রওনা হবে।

আর মাত্র বারো মাইল, তারপরই নিষিদ্ধ শহর লাসায় পৌঁছে যাব। কুকুরটাকে তাঁবুতেই রেখে এসেছি। আমাদের সঙ্গে আসলে ওটার মৃত্যু অনিবার্য।

ক্যারাভ্যানের সঙ্গে থেকে বেশ ভালোই এগোচ্ছি আমরা। পনপোর সমর্থন থাকায় সব জায়গা থেকে আমাদেরকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। শুধু লহলাম রোড অফিসার সন্দেহের চোখে দেখলো আমাদের। খাবার আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস তো দিলেনই না, বরং বেশ রূঢ়ভাবে আমাদের লাসায় যাওয়ার রুট পারমিটটাও দেখতে চাইলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁকে রুট পারমিটটা দেখাতে পারলাম না।

এখানে আসার পর পরই সন্দেহজনক কিছু মানুষ আমাদের তাঁবুর কাছে ভিড় জমিয়েছিল। ওদের ভাব-ভঙ্গি দেখে আমাদের আর বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে এরা খাম্পা। তবে এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। আগের মতো ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আমাদের মাথার ওপর এখন একটা ছাদ আছে। ক্যারাভ্যানের লোকজনই যা করার করবে। খামাখা এ-ব্যাপারে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার কী! তা ছাড়া চুরি করার মতো কোনও মূল্যবান জিনিসও তো নেই আমাদের কাছে। কয়েকবার তাঁবুতে ঢোকার চেষ্টা করল খাম্পারা। কিন্তু আমরা একটু চিৎকার-চেঁচামেচি করতেই চলে গেল।

পরদিন সকালে তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখি আমাদের ষাঁড়টা নেই। গত রাতে ঘাস খাওয়ার জন্য তাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভাবলাম হয়তো দূরে কোথাও চলে গেছে। কিন্তু আমি আর আফশেনেইটর অনেক খোঁজাখুঁজির পরও ষাঁড়টার দেখা পেলাম না। বুঝতে পারলাম কাজটা ডাকাতদের। ষাঁড় হারিয়ে মুখে যেন বিশাল একটা ঘুসি খেলাম আমরা।

ঝড়ের বেগে রোড অফিসারের তাঁবুতে ঢুকলাম দুজন। রাগে আমার গা জ্বালা করছে। প্যাক-সেডেল আর কভারিং তাঁর পায়ের কাছে ছুড়ে মারলাম। বললাম আমাদের ষাঁড়টা হারানোর জন্য আপনি দায়ী।

*

ষাঁড়টার জন্য খুব মন খারাপ হচ্ছে আমাদের। কিন্তু এখন এর জন্য শোক করার সময়ও নেই। কয়েক ঘন্টা আগে আমাদের ব্যাগেজ নিয়ে ক্যারাভ্যান রওনা দিয়েছে। তাদেরকে যত দ্রুত সম্ভব ধরতে হবে।

বেশ কয়েকদিন ধরে পাহাড়ের বিশাল একটা সারির দিকে হেঁটে যাচ্ছি। আমরা জানি ওটা হচ্ছে নাইয়েনচেনথাংলাহ রেঞ্জ। এই রেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার জন্য মাত্র

BanglaBook.org

একটা গিরিপথ আছে। গিরিপথটা চলে গেছে সেই নিষিদ্ধ শহর—লাসায়।

এরপর টোকার নামে একটা জায়গায় থামলাম আমরা। এখন থেকে আমাদেরকে পাহাড়ে চড়তে হবে। টানা পাঁচ মাইল হাঁটার পর আবার বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থামব। এই পাঁচ মাইল পথ কীভাবে পাড়ি দেবো সে ব্যাপারে ভাবতেও ভয় লাগছে আমাদের। তবে লাসায় যাওয়ার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করব আমরা। নিজেদের শক্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সঙ্গে প্রচুর মাংস নিলাম।

যাই হোক, আবার যাত্রা শুরু হলো আমাদের। দিনগুলো যেন শেষই হতে চায় না, আর রাতও ভীষণ বড়। খুব সুন্দর একটা জায়গার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লেকগুলোর মধ্যে অন্যতম—ন্যাম সো ওর টেনগ্রি নর-এর দেখা পেলাম।

অনেক আগে থেকে লেকটা দেখার কৌতূহল ছিল আমাদের। কিন্তু সামনে যেতেই সব কৌতূহল কোথায় উড়ে গেল বলতে পারব না। আসলে এমন এক কঠিন অবস্থার মধ্যে আছি যে কোনও কিছুই আমাদেরকে আর নাড়া দিতে পারছে না। বাতাসে অক্সিজেনের অভাব থাকায় রীতিমতো হাঁপাচ্ছি। সামনে বিশ হাজার ফিট উঁচু পাহাড়ে চড়তে হবে আমাদের। সেটার দিকে তাকালেই ভয়ে পা অবশ হয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পর পর নিজেদের অজান্তেই উঁচু চূড়ার দিকে তাকাচ্ছি।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত গিরিখাদের চূড়ায় উঠতে পারলাম আমরা। গিরিপথটার নাম গুড়িং লা। আমাদের আগে মাত্র একজন ইউরোপিয়ান এই গিরিপথ পার হয়েছেন। ভদ্রলোক ইংরেজ, নাম—লিটিলডেল। ১৮৯৫ সালে এখানে এসেছিলেন। সেভেন হিডেন নিশ্চিত করেছেন যে এই গিরিপথটার উচ্চতা বিশ হাজার ফুট। তাঁর মতে এটা ট্র্যান্সহিমালয় এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বড় গিরিপথ। আমি যদি বলি এটা পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু গিরিপথ তাহলে মনে হয় ভুল বলা হবে না। মজার ব্যাপার হচ্ছে গুড়িং লা গিরিপথে বছরের বার মাসই ওঠা যায়।

সামনে কিছু স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে পেলাম। এর আগেও এই ধরনের স্মৃতিস্তম্ভ চোখে পড়েছে আমাদের। ওগুলোর ওপরে অত্যন্ত উজ্জ্বল রঙের প্রার্থনা পতাকা টাঙানো। বাতাসে পত পত করে উড়ছে সেটা। জীবনে কখনও এত উজ্জ্বল রঙের পতাকা দেখিনি।

স্মৃতিস্তম্ভের পাশেই সারিবদ্ধভাবে কিছু পাথরের টেবিল দেখতে পেলাম। সেখানে বিভিন্ন সময় আসা তীর্থযাত্রীদের অনেক কথা লেখা আছে। পবিত্র নগরী লাসা আর খুব বেশি দূরে নয়। অনেক চড়াই-উতরাই পার করে এই পর্যন্ত আসতে পারায় তাদের লেখা এসব কথায় আনন্দের তীব্র অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।

হঠাৎ এক দল তীর্থযাত্রীদের দেখতে পেলাম। তারা এখন বাড়ির পথ ধরেছে। এই রাস্তায় প্রায়ই একটা কথা শোনা যায়। সেটা হলো 'ওম মেনি পাডমি হাম'। এ

BanglaBook.org

হচ্ছে সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থনা-রীতি, যেটা সব বৌদ্ধ-মতাবলম্বীরা মেনে চলেন। তীর্থযাত্রীরাও এই মন্ত্রটা পড়তে ভুল করেন না। তাঁদের ধারণা এটা তাঁদেরকে বিষাক্ত গ্যাস থেকে রক্ষা করবে। আসলে অক্সিজেনের অভাবকেই ওঁরা বিষাক্ত গ্যাস বলে জানেন। মন্ত্র না পড়ে মুখ বন্ধ রাখলেই বোধহয় ভালো করতেন।

যাই হোক, আমরা যে রাস্তা ধরে যাচ্ছি সেটা কী পরিমাণ ভয়ংকর তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর পরই ঢালের ওপর বিভিন্ন পশুর কঙ্কাল চোখে পড়ছে। ড্রাইভার জানাল, এই পাহাড়ে উঠতে গিয়ে প্রায় প্রতি বছর শীতকালে অনেক তীর্থযাত্রী মারা যায়। আবহাওয়া ভালো থাকায় সৃষ্টিকর্তাকে একটা ধন্যবাদ জানালাম আমরা। খারাপ আবহাওয়ায় এই চার হাজার ফিট উঁচুতে উঠতে আমাদেরও কী পরিমাণ কষ্ট করতে হতো সেটা ভাবতেও ভয় লাগছে।

যাত্রার প্রথম অংশ পার হতে হচ্ছে অনেকগুলো বরফের বিশাল চাইয়ের ওপর দিয়ে। বরফের ওপর ষাঁড়ের পায়ের দাগ দেখে একটা ধাক্কা খেলাম। বারবার হোঁচট খেতে খেতে সামনে এগোতে হচ্ছে। ভাবছি এই মসৃণ বরফের ওপর দিয়ে স্কি করে এগোনো গেলে কি ভালোই না হতো। এর আগে তীর্থযাত্রীদের এই রাস্তা ধরে লাসায় যাওয়ার সময় কেউ স্কিইং-এর কথা ভেবেছে বলে মনে হয় না। এটা শুধু আমাদের পক্ষেই সম্ভব।

তবে বিরতিহীন হেঁটে যাচ্ছি আমরা।

হঠাৎ এক তরুণ দম্পতির দেখা পেলাম। কথা বলে জানতে পারলাম অনেক দূর থেকে এখানে এসেছেন তাঁরা। আমাদের মতো তাঁদের গন্তব্যও লাসা। কথায় কথায় জানালেন ক্যারাভ্যানের দেখা পেয়ে দারুণ খুশি হয়েছেন। কীভাবে, কখন বলতে পারব না, তাঁদের সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে গেলাম। এই তরুণ দম্পতির গল্পটা সত্যি স্মরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের স্মৃতিতে।

তরুণীর চিবুকের রঙ গোলাপী আর লালের মিশেল। পিছনে বিনুনি করা কালো চুল দৃষ্টি এড়ায় না। বেশ সুখেই জীবন-যাপন করছিলেন এই অপ্সরা। সঙ্গ পাচ্ছিলেন তিন তিনটে স্বামীর। জী, হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন! তিনটেই!

কিন্তু তারচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে স্বামী তিনজনই হচ্ছে একে অপরের ভাই। স্বামীদের বাড়িতে না থেকে তিনি চ্যাঙহ্যাঙে একটা যাযাবরের তাঁবুতে থাকতেন। একদিন সন্ধ্যেবেলা এক তরুণ আগন্তুক এলেন তাঁবুতে। তাঁর লজিং দরকার। এরপর সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল তরুণীর।

বলা যায় একেবারে প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়ার মতো অবস্থা। দুজনের মধ্যে কোনও কথা না হলেও, একে অপরকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারলেন তাঁরা। এমনই বুঝলেন যে পরদিন সকালে তরুণী আগন্তুকের হাত ধরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লেন। এই পর্যন্ত আসতে পারায় খুব খুশি তাঁরা। ইচ্ছে নতুন জীবন শুরু করবেন লাসায়।

BanglaBook.org

যাত্রার কঠিন সময়গুলোতে আলোর একটা ঝলকানির মতো এই সুন্দর তরুণীর কথা মনে পড়ত আমাদের। একদিন তাঁবুর ভিতর বসে বিশ্রাম নিচ্ছি, এ-সময় হঠাৎ আমাদের দুজনকে তাঁর হাতব্যাগ থেকে শুকনো এ্যাপ্রিকোট দিয়েছিলেন তিনি।

এই তরুণ দম্পতির সঙ্গে কিছুদিন ভ্রমণ করায় তিব্বতী মেয়েদের সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়েছি। এরা কোনও অংশেই পুরুষদের চেয়ে কম যায় না। খুব সহজেই পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করতে পারে। আর সব তিব্বতী মেয়েদের মতো এই তরুণীও নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মোটেও চিন্তিত নয়। ঠিক করেছেন লাসায় গিয়ে তিনি মানুষের বাড়িতে মাসিক মজুরীতে চাকরানির কাজ করবেন। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি থাকায় হেসে-খেলেই এই কাজ করতে পারবেন।

পরবর্তী তিন দিন কোথাও না থেমে টানা হেঁটে গেলাম আমরা। হঠাৎ বেশ দূরে আকাশের গায়ে কয়েক জায়গায় ধোঁয়া উড়তে দেখা গেল। বুঝতে পারছি না ওটা চিমনি, না কোনও তাঁবু থেকে আসছে। কাছাকাছি যেতে অনেকগুলো উষ্ণ প্রস্রবণ দেখতে পেলাম। এরকম অদ্ভুত দৃশ্য জীবনে কখনও দেখিনি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে প্রকৃতির এই সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ করলাম। তারপর গদ্যের পর পদ্য!

অর্থাৎ আমাদের মাথায় তখন এই উষ্ণ প্রস্রবণে গোসল করার চিন্তা খেলা করছে। এতক্ষণে পাঠক নিশ্চয় আমাদের চরিত্র সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়েছেন। কোনও জিনিস করার কথা ভাবলে সেটা আমরা করেই ছাড়ি। তরুণ দম্পতি অবশ্য আমাদেরকে গোসল করতে মানা করলেন।

কিন্তু তাঁদের বারণ শোনার মতো বান্দা আমরা নই। খেয়াল করে দেখলাম ওপর থেকে মাটিতে যে পানি পড়ছে সেটা বেশ গরম। তবে তাতে মোটেও হতাশ হলাম না। কারণ নিচে পড়ার পর ঠাণ্ডা বাতাস থাকায় খুব দ্রুত পানি তার উষ্ণতা হারিয়ে ফেলছে। আর দেরি করে কী হবে, মহা আনন্দে, হই-হই করে পানিতে নেমে পড়লাম আমি আর আফশেনেইটর।

আহ্, কি শান্তি! কাইরঙের উষ্ণ প্রস্রবণে আমরা শেষ গোসল করেছিলাম। এরপর আর কোথাও গোসল করার সুযোগ হয়নি। যা ধারণা করেছিলাম, পানি তারচেয়ে অনেক গরম। তবে সেটা কোনও সমস্যা করছে না। সমস্যা হচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস নিয়ে। বাতাসের তাপমাত্রা এতই কম যে মুহূর্তের মধ্যে এই গরম পানি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাসে আমাদের ভেজা চুল আর দাড়ি বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে শক্ত হয়ে গেল।

দেখলাম পানিতে প্রচুর মাছ আছে। কীভাবে ধরা যায় সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ তর্ক চলল আফশেনেইটরের সঙ্গে। মাছগুলো ধরতে পারলে খুব সহজেই গরম পানিতে সেদ্ধ করা যাবে! কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের হাতে আর সময় নেই। এতক্ষণে ক্যারাভ্যান কতদূর চলে গেছে কে জানে। কিছুক্ষণ পর আবার রওনা হলাম আমরা।

রাতটা কাটাতে হলো ষাঁড় চালকদের তাঁবুতে। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই জীবনে

BanglaBook.org

এই প্রথম সায়াটিকার ব্যথা শুরু হয়ে গেল আমার। আগে ভাবতাম এই অসুখটা বৃদ্ধ বয়সের। কখনও কল্পনাও করিনি এই বয়সে সায়াটিকাকে সঙ্গী করে বাঁচতে হবে। সম্ভবত দিনের পর দিন খোলা আকাশের নিচে শুয়ে এই অসুখটা বাঁধিয়েছি আমি।

প্রচণ্ড ব্যথায় ঘুম ভেঙে গেল একদিন সকালে। বুঝতে পারছি বিছানা থেকে উঠতে হলে অসাধ্য সাধন করতে হবে। প্রচণ্ড কষ্টে চোখে অন্ধকার দেখলেও আমার চিন্তা প্রবাহিত হচ্ছে অন্য খাতে। আর হয়তো সামনে এগোতে পারব না, এই ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। দাঁত দাঁত চেপে পায়ের ওপর ভর দিয়ে নিজেকে তুললাম। এগিয়েও গেলাম কয়েক কদম। চেষ্টাটা কাজেই লাগল। কষ্ট করে এখন না উঠলে হয়তো বেশ কয়েকদিন এভাবে শুয়ে থাকত হতো। তবে এরপর যাত্রা শুরু করার পর প্রথম কয়েক মাইল খুব কষ্ট করতে হয়েছে আমাকে।

চতুর্থ দিন গিরিপথটা পার হলাম। এখন স্যামসার নামে একটা জায়গায় আছি। একটা রোড স্টেশনও চোখে পড়ল আমাদের। যাক, লোকবসতি আছে, শেষপর্যন্ত এরকম একটা জায়গায় পৌঁছতে পারলাম। আশ্রম, বাড়ি আর দুর্গ দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে তিব্বতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জংশন। পাঁচ রাস্তার মোড়, তাই সবসময় ভিড়ে ভিড়াক্কার হয়ে আছে জায়গাটা।

বিভিন্ন রাস্তা ধরে আসা ক্যারাভ্যানগুলোর কারণে ট্র্যাফিক জ্যাম লেগে আছে। সব মিলিয়ে মহা গ্যাঞ্জাম! রাস্তার ধারের সারি সারি বাড়িগুলোর সামনে প্রচণ্ড ভিড় লেগে গেছে, আর এর মধ্যেই রাস্তার পাশে আস্তাবলে ঘোড়া পরিবর্তন করা হচ্ছে।

পনপো আমাদের চেয়ে দুদিন আগে এখানে পৌঁছালেও কিছু সরকারী কাজ থাকার কারণে এখনই তিনি রওনা হতে পারবেন না। তবে আমাদের জন্য একটা ঘর আর চাকরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি। ট্র্যাফিক জ্যাম এখন এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে সেটা ব্যাখ্যা করে বোঝায় কার সাধ্য! আমাদের পক্ষে একা রওনা হওয়া সম্ভব নয়। বুঝতে পারছি এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

গোসল করে সময়টা পার করব বলে ঠিক করলাম। দূরে একটা উষ্ণ প্রসবণে দেখা যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে আমি আর আফশেনেইটর পানিতে নেমে পড়লাম। পানি অনেক গরম হওয়ায় কিছুক্ষণ পরই উঠে এলো আফশেনেইটর। অনেক টানাটানি করেও ওকে আর নামাতে পারলাম না।

আমি নিজেও গরম পানিতে স্বস্তিবোধ করছি না। তবে সায়াটিকার ব্যথা ভালো হয়ে যাবে, এই আশায় যতক্ষণ সম্ভব গোসল করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কাইরঙ থেকে একটা সাবান এনেছিলাম। সেটা তীরে রাখলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি খেয়াল করিনি একটা কাক গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ কিছু বুঝতে না দিয়ে ছোঁ মেরে আমার সাবানটা নিয়ে গেল ওটা। লাফ দিয়ে তীরে উঠলাম আমি। কাকের চোদ্দোগোষ্ঠী উদ্ধার করে ছাড়লাম! কিছুক্ষণ পর আবার গরম পানিতে নামলাম

BanglaBook.org

আমি। ঠাণ্ডায় আমার দাঁত ঠকঠক করে কাঁপছে।

গোসল সেরে ফিরতি পথ ধরলাম। যাওয়ার পথে প্রথম একটা তিব্বতী সেনাবাহিনীর দল দেখতে পেলাম। দলটাতে কমপক্ষে পাঁচশ' সৈন্য আছে। সম্ভবত ট্রেনিং নিতে এসেছে। তিব্বতী সেনাবাহিনী যা খুশি তাই রিক্যুইজিশন করার ক্ষমতা রাখে। সম্ভবত এই কারণেই লোকজন তাদের ব্যাপারে মোটেও কৌতূহল বা আগ্রহ দেখায় না।

ক্যাম্প করার সময় স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে কোনও সাহায্য নেয় না সৈনিকরা। কিছুদিন থাকার পর সময় মতো তল্পিতল্পা গুটিয়ে আবার অন্য জায়গায় চলে যায় তারা। তবে এই কিছুদিন এলাকার লোকজন সেনাদলকে ঘোড়া আর পরিবহনের ব্যবস্থা করে দিতে বাধ্য হয়।

বাড়িতে ফিরে অবাক হতে হলো। পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি পরানো একজন রুমমেট এসেছে। হাঁটার সময় খুব কষ্ট করে একটু একটু করে এগোতে হয় তাকে। কিছু জিজ্ঞেস করতে হলো না। নিজে থেকেই নিজের এই দুর্দশা কারণ ব্যাখ্যা করল সে।

আমাদের জন্য সেটা মোটেও সুখপ্রদ কিছু নয়। খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জানাল, সে একই সঙ্গে ডাকাত ও খুনি। প্রথম শাস্তি হিসাবে তাকে দুশ'বার চাবুক মারা হয়েছে। আর দ্বিতীয় শাস্তি হচ্ছে ডাণ্ডাবেড়ি পরে থাকা। সারাজীবন তাকে এই লোহার চেইন পরে ঘুরে বেড়াতে হবে।

এটাই বোধহয় আমাদের দেখা বাকি ছিল। শেষ পর্যন্ত একজন খুনি আর আমাদেরকে একই পর্যায়ের মানুষ বলে ভাবছে ওরা! যাই হোক, কিছুক্ষণ পর আমরা বুঝতে পারলাম তিব্বতে খুনিকে খুব একটা খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয় না। আর দশটা মানুষের মতো সেও সব রকম সুবিধা পায়। সবার সঙ্গে যে-কোনো বিষয়ে কথা বলার স্বাধীনতাও তার আছে। তবে সে যাতে পালাতে না পারে সেজন্য তাকে সারাজীবন ওই ডাণ্ডাবেড়ি পরে থাকতে হবে। এখন তার জীবন চলে ভিক্ষাবৃত্তি করে।

ইতিমধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায় দুজন ইউরোপিয়ান এসেছে। আমাদের বাড়িতে কৌতূহলী মানুষের ভিড় লেগে আছে সারাক্ষণ। তরুণ এক সন্ন্যাসী এলো। কথায় কথায় জানাল, কাল সকালে কিছু জিনিস নিয়ে তাকে ড্রেবাং আশ্রমে যেতে হবে। সুযোগ পেয়ে তাকে জানালাম, আমাদের সঙ্গে মাত্র একটা ব্যাগ আছে, আর যাত্রা শুরু করার জন্য একেবারে মুখিয়ে আছি।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেলাম তাঁর কাছ থেকে। প্রস্তাব দিল ইচ্ছা করলে তার ক্যারাভ্যানের সঙ্গে আমরা যেতে পারব। শুধু তাই নয়, বিনামূল্যে একটা ষাঁড়ও দিতে চাইল সে। আমাদের ট্র্যাভেল পারমিটও দেখার কোনও ইচ্ছা নেই তার।

আমরা জানি রাজধানীর কাছাকাছি যেতে পারলে আর কোনও বিপদের ভয় থাকবে না। এর পিছনে যুক্তি হচ্ছে, এখন পর্যন্ত যত বিদেশি তিব্বতে ঢুকেছেন তাঁদের

BanglaBook.org

সবার কাছে ট্র্যাভেল পারমিট ছিল। কিন্তু আমাদের জন্য এক জায়গায় বেশিক্ষণ না থাকাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। শুধু তাই নয়, কোনও বিষয় নিয়ে খুব একটা কৌতূহলও দেখানো যাবে না।

সন্ন্যাসীর প্রস্তাবটা লুফে নিলাম আমরা। রওনা হবার আগে পনপোকে যতভাবে সম্ভব কৃতজ্ঞতা জানালাম। যাই হোক, ঘুটঘুটে অন্ধকারে যাত্রা শুরু হয়েছে আমাদের। এখন মাঝরাত। ইয়াঙপ্যাচান জেলা পার হওয়ার পর একটা উপত্যকায় পৌঁছালাম, সেটা গিয়ে মিশেছে ধূ ধূ লাসা প্রান্তরে।

*

লাসার খুব কাছে চলে এসেছি। শহরটার কথা ভাবলেই মনের মধ্যে একটা ঝড় ওঠে আমাদের। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর মাইলের পর মাইল পথ পাড়ি দেওয়ার সময় যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, যখন মনে হয়েছে আর সামনে এগোতে পারব না, তখন এই নিষিদ্ধ শহর লাসার কথা ভেবেছি আমরা। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে! দ্বিগুণ উৎসাহে আবার যাত্রা শুরু করেছি।

লাসা নামটা নতুন শক্তি যুগিয়েছে আমাদের। সবচেয়ে দূর থেকে আসা তীর্থযাত্রীকেও মনে হয় আমাদের মতো এত কষ্ট করতে হয় না। সেভেন হিডেনও লাসার অনেক কাছাকাছি এসেছিলেন। তবে ইতিমধ্যে আমরা তাঁকেও ছাড়িয়ে গেছি।

এর আগে আমরা যে এলাকায় ছিলাম সেখান থেকে লাসায় ঢোকার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পর পর দুবার চেষ্টা করেও কাজটাতে সফল হতে পারিনি। কারণ প্রতিবারই চ্যাঙহ্যাঙের নিচেনথোলা পাহাড়ের বিপজ্জনক প্রাচীর আমাদেরকে সামনে এগোতে দেয়নি।

যাই হোক, পরদিন সকালে ডিচেন পৌঁছালাম আমরা। ঠিক করা হলো এখানে পুরো এক দিন থাকা হবে। ব্যাপারটা চিন্তায় ফেলে দিল আমাদের। এখানে দুজন জেলা অফিসার আছেন। ভুয়া ট্র্যাভেল পারমিট দেখিয়ে তাদেরকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না।

আমাদের সন্ন্যাসী বন্ধু এখনও এসে পৌঁছাননি। পায়ে হেঁটে নয়, ঘোড়ার পিঠে চড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছেন তিনি। তাই একটু পিছিয়ে পড়লেও তাঁর কোনও সমস্যা হবে না। উপায় যেহেতু আছে তাই খামাখা কষ্ট করবেন কেন। এক রাত সেঁটে ঘুম দিয়ে, বিশ্রাম নিয়ে, তবেই তিনি রওনা দেবেন। কোনও সন্দেহ নেই, আমরা ডিচান আসার পর তিনি রওনা হয়েছেন।

অবসর সময়টা থাকার জায়গা খোঁজার কাজে ব্যয় করলাম আমরা। একজন তরুণ লেফটেন্যান্টের সঙ্গে দেখা হলো আমাদের। আজ দুপুরবেলা তিনি চলে যাবেন। তাই আমাদেরকে তাঁর একটা ঘর ব্যবহার করার প্রস্তাব দিলেন। সেনাবাহিনীর জন্য টাকা সংগ্রহের কাজে তিনি এখানে এসেছিলেন।

BanglaBook.org

ভয়ে ভয়ে তাঁকে বললাম, তিনি কি আমাদের ব্যাগগুলো তাঁর কনভয়ে তুলে নিয়ে যেতে পারবেন। শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে কেন! সঙ্গে যোগ করলাম এর জন্য আমরা কিছু টাকা দিতেও প্রস্তুত। বলতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন তিনি।

এখানে থাকলে শুধু সময় নষ্ট হবে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম লেফটেন্যান্টের ক্যারাভ্যানের সঙ্গেই রওনা দেব। কয়েক ঘন্টা পর ক্যারাভ্যানের পিছু নিয়ে এগোতে শুরু করলাম আমরা। মনের মধ্যে আবার ঝড়-লাসার আরও কাছে চলে যাচ্ছি।

কিন্তু এই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। গ্রামের শেষ বাড়িটা পার হতে যাব, এই সময় পিছন থেকে কেউ ডাকল। ঘুরে দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম। পরনে দামি সিল্কের পোশাক। কোনও সন্দেহ নেই, তিনি একজন পনপো।

মার্জিতভাবে জানতে চাইলেন তিনি, আমরা কোথা থেকে এসেছি আর এখন কোথায় যাওয়া হচ্ছে। কথার সুরে জেরা করার স্পষ্ট ইঙ্গিত। এই অবস্থায় একমাত্র উপস্থিত বুদ্ধি আমাদেরকে বাঁচাতে পারে।

খুব ভদ্রভাবে তাঁকে জানালাম, একটু হাঁটতে বেরিয়েছি আমরা। আমাদের সব কাগজ-পত্র এখানেই আছে। ফিরে এসে মহামান্য পনপোর সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করব আমরা। কৌশলটা কাজে লাগল। আর কিছু জানতে চাইলেন না তিনি। গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

লাসা আর মাত্র তিন দিনের পথ। সারাদিন হাঁটলাম আমরা। দুপুরের দিকে লেফটেন্যান্টের ক্যারাভ্যানকে ধরতে পারলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই রাস্তায় বাহন হিসাবে-গরু, বাঁদর, ঘোড়া, ষাঁড়-সব ধরনের পশু ব্যবহার করা হয়। তবে সবচেয়ে কম ব্যবহার করা হয় ষাঁড়। কারণ কৃষকরা তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস দিতে পারে না।

তিব্বতের বিভিন্ন জায়গায় জমিতে সেচ দিতে দেখেছি বহু কৃষককে। বসন্তে যে প্রচণ্ড বাতাস হয় সেটা বেশ দেরিতে আসে এখানে। মাটি যদি খুব শুকনো থাকে তাহলে সব ধুলো হয়ে উড়ে যাবে। এই মাটিকে আবার উর্বর করতে হলে প্রতিদিন নিয়মিত পানি দিতে হবে। আর তাতে কয়েক প্রজন্ম লেগে যেতে পারে। শীতকালের বীজকে বাঁচাবার জন্য এখানে খুব কম তুষারপাত হয়। যার ফলে কৃষকরা একটার বেশি ফসলের চাষ করতে পারে না। তবে এখানকার উচ্চতা চাষাবাদের ক্ষেত্রে কৃষককুলকে বাড়তি উৎসাহ যুগিয়েছে। ষোল হাজার ফুট উঁচুতে শুধু বার্লিই ঠিকভাবে চাষ করা যায়। এখানকার কৃষকরা সবাই অর্ধ-যাযাবর।

কোনও কোনও এলাকায় বার্লি পাকতে ষাট দিন সময় লাগে। টুলাঙ উপত্যকা, যেখান দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি-সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বারো হাজার ফিট উঁচু। এখানকার কৃষকরা শিকড়, আলু আর সরষে ফলায়।

লাসা আর মাত্র একদিন হাঁটার পথ। রাতে একজন কৃষকের বাসায় আশ্রয় নিলাম

BanglaBook.org

আমরা। কাইরঙের মনভোলানো কাঠের বাড়ির তুলনায় এখানকার বাড়ি খুব সাদামাটা। এখানে কাঠ বলতে গেলে প্রায় দুর্লভ একটা জিনিস। কৃষকের বাসায় আসবাবপত্র মানে ছোট্ট একটা টেবিল আর একটা খাট। বাড়িটা বানানো হয়েছে মাটির তৈরি ইঁট দিয়ে। বাড়ির ভিতরে কোনও জানালা নেই। দরজা আর ধোঁয়া বেরুনোর গর্ত ছাড়া বাড়িতে বাতাস ঢোকার আর অন্য কোনও পথ নেই।

যে কৃষকের বাসায় আছি তাকে বেশ স্বচ্ছল বলা যায়। তিব্বতের সমাজ ব্যবস্থা সামন্ত প্রথায় সাজানো। এখানকার কৃষকদের নিজেদের কোনও জমি নেই। তারা মালিকের জমি দেখাশোনা করে। নিজের কোনও লাভ হলো কিনা কৃষকের জন্য সেটা কোনও ধর্তব্যের বিষয় নয়। মালিকের লাভ হওয়াই আসল কথা।

আমাদের মেজবানের মোট তিনটে ছেলে। দুজন জমি দেখাশোনা করে। আরেকজন ব্যস্ত সন্ন্যাসী হওয়ার পথে নিজেকে প্রস্তুত করায়। বাসায় গরু, ঘোড়া, কিছু মুরগি আর শুয়োর আছে। এই প্রথম তিব্বতে মুরগি আর শুয়োর দেখলাম। এগুলোর খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয় না, আবর্জনা এবং মাঠ থেকে যা পায় তাই চরে চরে খায় নিজেরা।

আগামীকালের কথা ভেবে সারারাত নির্ঘুম কাটালাম আমরা। শত চেষ্টা করেও দুচোখের পাতা এক করতে পারছি না। কালকেই আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। ঘুরে-ফিরে মাথার মধ্যে খালি একটা প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে। কোনও একটা উপায়ে শহরে ঢুকতে পারলেও সেখানে কি আমরা থাকতে পারব?

আমাদের সঙ্গে একদম কোনও টাকা-পয়সা নেই। যদি শহরে থাকতেও পারি, কী খেয়ে বাঁচব আমরা? বেশ-ভূষা আর চেহারার কথা তো ভাবতেই পারছি না। ইউরোপিয়ান দূরে থাক, আমাদেরকে দেখে কেউ সভ্য মানুষ বলেই ভাববে না। দেখে মনে হচ্ছে চ্যাঙথ্যাঙ থেকে আসা চোর। গায়ে সেঁটে থাকা উলের ট্রাউজার আর জরাজীর্ণ শার্টের ওপর ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি এক প্রস্থ কাপড় পরেছি। দূর থেকে পোশাক-আশাকের এই হাল দেখে যে কোনও তিব্বতী বুঝতে পারবে তাদের দেশে আমাদেরকে কী পরিমাণ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। আফশেনেইটরের পায়ে একজোড়া ইন্ডিয়ান আর্মির বুট আছে। সেটার আয়ু প্রায় শেষের পথে। যখন-তখন খুলে ফেলে দিতে হবে। আর আমার জুতোর কথা কি বলব। ইতোমধ্যে সেটার অনেক অংশ খুলে পড়ে গেছে। বাকি যা আছে সেটা দেখে এটাকে জুতো বলে চেনাই দায়। আমাদের দুজনের জুতোর যে অবস্থা তাতে মানুষের মনে হওয়া স্বাভাবিক এরকম জুতো পড়ার চেয়ে খালি পায়ে হাঁটা অনেক ভালো।

জাতিতে ইউরোপিয়ান হলেও আমাদের বেশভূষা আর চেহারার যে অবস্থা তাতে কারও কাছ থেকে বাড়তি কোনও সুবিধা আদায় করা যাবে না। আমাদের দাড়িটাই বোধহয় সবচেয়ে আকর্ষণীয় লাগবে লাসার মানুষের কাছে। মঙ্গোলিয়ানদের মতো

BanglaBook.org

তিব্বতীদেরও মাথায় আর মুখে কোনও চুল থাকে না। অপরদিকে আমাদের মুখে এরকম লম্বা, জট পাকানো দাড়ি দেখে ওদের অবাক হওয়াই স্বাভাবিক। ইতিমধ্যে এই দাড়ির জন্য অনেক ভুল বোঝাবঝির সৃষ্টি হয়েছে। অনেক যাযাবর আমাদেরকে কাজাক সম্প্রদায়ের মানুষ বলে মনে করেছে।

কাজাকরা আগে মধ্য এশিয়ায় থাকত। সোভিয়েট রাশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হলে পুরো গোষ্ঠী তিব্বতে পালিয়ে আসে। ব্যাপারটা এখানে থেমে থাকলে তেমন কিছু এসে যেত না তিব্বতীদের। কিন্তু থামল না, দলে দলে তিব্বতে ঢুকে সদলবলে লুটপাট শুরু করে দিল তারা। তাদেরকে ইন্ডিয়ায় ফেরত পাঠাতে রীতিমতো হিমশিম খেয়ে যায় তিব্বতের সেনাবাহিনী। কাজাকদের চামড়ার রঙ বেশ পরিষ্কার, চোখগুলো নীল আর বলা বাহুল্য দাড়িও আছে। কাজাক সম্প্রদায়ের লোক ভেবে আমাদেরকে ঠাণ্ডা অভ্যর্থনা জানিয়েছে অনেক যাযাবর।

আমাদের চেহারা আর পোশাক-আশাক যতই খারাপ হোক, এখানে বসে সে-সব ভদ্রোচিত করে নেওয়ার চেষ্টা বৃথা। নিজেদেরকে সভ্য করতে হলে আগে লাসায় পৌঁছাতে হবে। সঙ্গে টাকা থাকলেও কোনও লাভ হতো না। এখানে দোকান কোথায় যে কাপড় কিনব?

শেষ গ্রাম ন্যাঙসি ছাড়ার পর থেকে আমাদেরকে একাই পথ চলতে হচ্ছে। লেফটেন্যান্ট ইতিমধ্যে লাসার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন। ব্যাগগুলো কীভাবে নিয়ে যাব সে বিষয়ে মেজবানের সঙ্গে আলোচনা করছি। ধার হিসাবে আমাদেরকে একটা গরু আর একজন চাকর দিল সে। তার পাওনা মিটিয়ে দিলাম আমরা। দেড় রুপি আর কাপড়ে মোড়া এক টুকরো সোনা–এছাড়া আর কিছু নেই আমাদের কাছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছি পরিবহনের কোনও ব্যবস্থা করতে না পারলে আমাদের সব জিনিস-পত্র রাস্তাতেই ফেলে যাব। ডায়রী, ম্যাপ এবং নোট–এছাড়া মূল্যবান আর কিছু নেই। নেই লাসায় যেতে বাধা দেবে এমন কোনও পিছুটানও।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ছয়

নিষিদ্ধ শহর–লাসা

পোটালা রাজপ্রাসাদে সোনার ছাদ/ থাকার জায়গা আর খাবার পেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দুই ভবঘুরে / সেই আধ্যাত্মিক বিস্ময় বালক–দালাই লামার বাসায় আমন্ত্রণ।

১৫ জানুয়ারি, ১৯৪৬। শেষ গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা শুরু হলো আমাদের। কয়েক দিন হাঁটার পর টুলাঙ থেকে কইচুর বিশাল উপত্যকায় এসে পৌঁছালাম। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা বাঁক ঘুরতে হলো। সঙ্গে সঙ্গে পোটালা রাজপ্রাসাদের সোনার ছাদ চোখে পড়ল আমাদের। সূর্যের আলো লাগায় চকচক করছে ওটা।

পোটালা রাজপ্রাসাদ মানে দালাই লামার শীতকালীন অবসর যাপন কেন্দ্র। লাসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এটা। এ-পর্যন্ত আসতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে আমাদের। ইচ্ছা হচ্ছে তীর্থযাত্রীদের মতো নত হই, হাঁটু আর কপাল মাটিতে ঠেকাই।

কাইরঙ ত্যাগ করার পর ছ'শো মাইলেরও বেশি পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। মনে মনে সব সময় এই শহরটাকে কল্পনা করেছি। সত্তর দিন ধরে হেঁটেছি, বিশ্রাম নিয়েছি মাত্র পাঁচদিন। তার মানে গড়ে প্রতিদিন দশ মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়েছে আমাদের। চ্যাঙহ্যাঙ পার হতেই পঁয়তাল্লিশ দিন লেগে গেছে। এ-সময় ঠাণ্ডা, খিদে আর নানারকম বিপদের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়েছে। এই মুহূর্তে পোটালা রাজপ্রাসাদের ছাদের দিকে তাকিয়ে পিছনের সব কথা ভুলে গেছি আমরা–আর মাত্র ছ'মাইল, তারপরই রহস্য ঘেরা সেই নিষিদ্ধ শহরে পৌঁছে যাব।

দেখতে দেখতে শিংডঙ্গা চলে এলাম। এই গ্রামটার পরেই তিব্বতের রাজধানী লাসায় পৌঁছাব।

একটু খুঁজতেই কিছু পনপো আর কুলির দেখা পেলাম। জানালাম বিদেশ থেকে খুব শক্তিশালী একটা প্রতিনিধি দল লাসায় আসছেন। আমরা অগ্রগামী দল। প্রতিনিধি দলের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদেরকে লাসায় পৌঁছাতে হবে।

পনপো সহজেই টোপটা গিললেন। এক মুহূর্ত দেরি না করে একটা গাধা আর

BanglaBook.org

চালক ঠিক করে দিলেন তিনি। এই ঘটনার কয়েক বছর পর লাসায় কোনও অনুষ্ঠান হলেই আমাদের এই অভিনব কৌশলের কথা ভেবে হেসে গড়িয়ে পড়ার অবস্থা হয়েছে তিব্বতীদের। এমন কি মন্ত্রিদের বাসাতেও এ-ব্যাপারে হাসাহাসি হয়েছে বলে শুনেছি। কারণ, যত চেষ্টাই করা হোক, বিদেশিরা কোনওভাবেই তিব্বতের ভিতরে ঢুকতে পারে না। এটা নিয়ে তিব্বতীদের গর্বের কোনও শেষ নেই। কিন্তু আমরা যে কৌশলে লাসায় ঢুকেছি সেটা তাদের মনকেই শুধু নাড়া দেয়নি, সেই সঙ্গে তাদের হাসির খোরাকও যুগিয়েছে। তিব্বতীরা কারণে অকারণে হাসতে খুব ভালোবাসে।

পরবর্তী ছ'মাইল পাড়ি দেওয়ার সময় তীর্থযাত্রী আর কাফেলার সঙ্গে মিশে গেলাম আমরা। কিছুদূর পর পরই রাস্তায় খাবারের দোকান চোখে পড়ছে। আর কী নেই সে-সব দোকানে–মিষ্টি, সাদা রুটি, আরও কত কি!

কিন্তু আমাদের চোখে পানি এসে পড়ল। কিছু কেনার মতো পয়সা নেই। শেষ রুপিটাও নিয়ে গেছে চালক।

নিজেদের রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছি। কেউ আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে না। এর কারণ আজ পর্যন্ত কোনও ইউরোপিয়ান পাস ছাড়া তিব্বতে ঢোকেনি। ওরা ভাবতেই পারছে না আমাদের কাছে পাস নেই।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে। যে করেই হোক থাকার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কাজটা সহজ নয়। কিন্তু তাই বলে চুপ করে বসে থাকার বান্দা নই আমরা।

প্রথম বাসায় গিয়ে একজন বোবা চাকরের সঙ্গে দেখা হলো। আমাদের কথা শুনল না সে। আরেক বাসায় গিয়ে একজন চাকরানির দেখা পেলাম। সে জানাল, মালিক বাসায় নেই। মালিকের অনুমতি ছাড়া আমাদেরকে ভিতরে ঢোকালে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হবে তাকে। আর বিরক্ত করলাম না বেচারিকে।

আমরা আশা করছি, তিব্বতী সরকার এদের মতো এতটা কঠোর হবে না। কিন্তু সরকার কী সিদ্ধান্ত নেবে সেটা তো পরের ব্যাপার। এই মুহূর্তে খাবার আর বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা না পেলে স্রেফ মারা পড়ব।

হাঁটতে হাঁটতে তিব্বতের সবচেয়ে সুন্দর বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমাদেরকে দেখে তাড়াতাড়ি কয়েকজন চাকর বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে। আতঙ্কিত হয়ে এখান থেকে চলে যেতে বলছে। কিন্তু আমরাও এবার নাছোড়বান্দা। এখান থেকে আর এক পাও নড়ছি না। যা ঘটার ঘটুক, পরোয়া করি না।

আমাদের মনোভাব বুঝতে পেরে চাকররা কাকুতি-মিনুতি শুরু করল। বলছে মালিক আমাদেরকে দেখলে তাদের চাকরি থাকবে না। তাদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে ইতিমধ্যে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু কারও কোনও কথাই কানে তুললাম না। স্রেফ কালা সেজে থাকলাম। ব্যাগের ওপর ধপাস করে বসে পড়লাম। আমাদের এখন বিশ্রাম আর খাবার দরকার।

চিৎকার-চেঁচামেচি থেমে গেল হঠাৎ। আমাদের ফোলা আর ফোস্কা পড়া পা ওদের

BanglaBook.org

চোখে পড়েছে। কিছুটা করুণা বোধ করছে ওরা আমাদের জন্য। প্রথমে একজন ভদ্রমহিলা সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ আগে তিনিই আমাদেরকে তাঁর বাসায় ঢুকতে দেননি। ঘি দেওয়া চা এনে দিলেন তিনি। তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও আরও অনেক খাবার আনতে শুরু করল। সবকিছু ভুলে গোগ্রাসে খেতে শুরু করলাম আমরা।

হঠাৎ আমাদের উদ্দেশে ইংরেজিতে কথা বলে উঠল কেউ। বুঝতে পারলাম তিনি উচ্চপদস্থ কেউ হবেন। কী হয়েছে সেটা সংক্ষেপে জানিয়ে আশ্রয় চাইলাম তাঁর কাছে। নিজেদেরকে জার্মান বলে পরিচয় দিলাম। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন, শহরের ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া নিজের বাসায় আমাদেরকে তিনি থাকতে দিতে পারবেন না। এ-ব্যাপারে অনুমতি নেওয়ার জন্য এখনি তিনি অফিসে যাচ্ছেন।

তিনি চলে যেতে আশপাশের লোকজনের কাছ থেকে জানতে পারলাম তিনি একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিব্বতে সব ধরনের বৈদ্যুতিক কাজ দেখাশোনা করা তাঁর দায়িত্ব।

লোকজনের সঙ্গে কথা বলছি, এ-সময় একজন চাকর এসে জানাল তার মনিব মিস্টার থাঙ্গমে, যার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে আমাদের কথা হয়েছে, নিজের বাড়িতে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কোনও কথা না বলে ওই চাকরকে অনুসরণ করলাম আমরা।

থাঙ্গমে আর তাঁর স্ত্রী উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁদের পাঁচ ছেলেমেয়ে হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। থাঙ্গমে জানালেন ম্যাজিস্ট্রেট একরাতের জন্য তাঁর বাড়িতে রাখার অনুমতি দিয়েছেন। পরে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নেবে আমাদেরকে নিয়ে কী করা হবে।

ভবিষ্যতের ব্যাপার নিয়ে এখন আমরা একটুও দুশ্চিন্তা করছি না। যেভাবে হোক লাসায় তো পৌঁছেই গেছি। শুধু তাই নয়, একজন প্রভাবশালী মানুষের বাসায় থাকারও সুযোগ পাচ্ছি। খুব সুন্দর একটা ঘর দেওয়া হলো আমাদের। টানা সাত বছর পর আয়রন স্টোভের দেখা পেয়ে আনন্দে নেচে উঠল আমাদের মন।

আরাম-আয়েশের সব ব্যবস্থাই আছে ঘরে। কিন্তু বিছানায় যাওয়ার পর কিছুতেই ঘুমাতে পারছি না। মাসের পর মাস খোলা আকাশের নিচে রাত কাটিয়েছি। আমাদের শরীর হঠাৎ করে এই পরিবর্তনে অভ্যস্ত হতে পারছে না। মনটাও খুব বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। নানারকম চিন্তায় মাথাটা একেবারে বোঝাই। তারপর একসময় নিজেদের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

তখনও পুরোপুরি ঘুম থেকে জেগে উঠিনি। একজন চাকর ট্রে করে কেক আর চা দিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর গরম পানিও দেওয়া হলো। রেজার দিয়ে দাড়ি কামালাম।

দুপুর পর্যন্ত থাঙ্গমের দেখা পেলাম না। জানতে পারলাম আমাদের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসায় গেছেন তিনি।

তাঁকে খুশি মনে বাসায় ফিরতে দেখে বুঝতে পারলাম খবর ভালো। তিনি জানালেন, আমাদেরকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়া হবে না। একটা নির্দিষ্ট সময়

BanglaBook.org

পর্যন্ত আমরা লাসায় থাকতে পারব। তবে একটা শর্তও জুড়ে দেওয়া হয়েছে এর সঙ্গে। প্রসাশক আমাদের ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগ পর্যন্ত বাড়ির বাইরে যেতে পারব না। এই মুহূর্তে তিনি লাসায় নেই। কিছুদিনের মধ্যেই ফিরবেন।

কিছুক্ষণ পর সরকারী একজন লোক এলো থাঙ্গমের বাসায়। তার সঙ্গে কিছু পুলিশও আছে। সে জানাল টাউন ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।

ম্যাজিস্ট্রিটের কাছে যাওয়ার পর হতভম্ব হয়ে গেলাম আমরা। তিনি আমাদের ব্যাগগুলো খুলে দেখতে চাইছেন। তাঁর কাছে খবর আছে জার্মান সেনাবাহিনী লাসায় আক্রমণ করতে আসছে। কিছুক্ষণ পর পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো আমাদের কাছে। অভিযান সম্পর্কে সংক্ষেপে জানালাম তাঁকে। সব শুনে তিনিও হেসে ফেললেন। লাসায় আসার পথে যাদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে তারা সবাই রিপোর্ট পাঠিয়েছে এখানে। সবাই ভেবেছে জার্মানি বোধহয় তিব্বতে হামলা করবে।

এখন আমরা লাসার টক অফ দ্য টাউন। সবাই নিজের কানে আমাদের ভ্রমণ কাহিনী শুনতে চাইছে। আমরা বাড়ি থেকে বের হতে না পারায় অসংখ্য লোক আসছে থাঙ্গমের বাসায়। থাঙ্গমেও সাধ্যমতো তাদেরকে আপ্যায়িত করছেন।

প্রতিদিনই গুরুত্বপূর্ণ লোক আসছে থাঙ্গমের বাসায়। একজন মন্ত্রী তাঁর পুরো পরিবার নিয়ে এসে পড়লেন। তাঁদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বললাম আমরা। একদিন তিব্বতী সেনাবাহিনীর এক জেনারেল দেখা করতে এলেন।

প্রভাবশালী সন্ন্যাসীরা তো হরদম আসছেন। সবচেয়ে খুশির ব্যাপার হচ্ছে আমাদের সঙ্গে কেউই খারাপ ব্যবহার করছে না। লাসায় আসার আগে তিব্বতীদের কাছ থেকে কী রকম ব্যবহার পাব সে ব্যাপারে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম আমরা।

ইতিমধ্যে থাঙ্গমের পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছি আমরা। সব মিলিয়ে খুব ভালো সময় কাটছে। তবে দীর্ঘ ভ্রমণে আমাদের শরীরের ওপর অত্যধিক চাপ পড়েছে, এখন সেটার মাসুল দিতে হচ্ছে। কিছুদিন পর প্রচণ্ড জ্বরে পড়ল আফশেনেইটর। আর আমি ভুগছি সায়াটিকার ব্যথায়। থাঙ্গমে চাইনিজ রাষ্ট্রদূতের একজন ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ প্রেসক্রাইব করলেন ডাক্তার।

আমরা তো একরকম পলাতক আসামী। তারপরও তিব্বতে যেভাবে আমাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে, পৃথিবীর আর কোনও দেশে সেটা সম্ভব হতো বলে আমার মনে হয় না।

কিছুদিন পর সরকারের পক্ষ থেকে আমাদেরকে কিছু কাপড় দেওয়া হলো। শুধু তাই নয়, দুঃখ প্রকাশ করে পোশাক দিতে দেরি হওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিব্বতীদের চেয়ে আমাদের উচ্চতা অনেক বেশি, তাই কোনও তৈরি পোশাক পাওয়া যায়নি। কাপড় পাওয়ার পর মাপ দেওয়ার কাজটা সেরে ফেললাম আমরা।

BanglaBook.org

পি. ও. ডব্লিউ ক্যাম্প থেকে পালানোর পর থেকে প্রতিদিনই ডায়রীতে কিছু না কিছু লিখছি। ইতিমধ্যে থাঙ্গমের ছেলেমেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। আমরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই ওরা স্কুলে চলে যায়। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা খুব আগ্রহ নিয়ে হোমওঅর্ক দেখাচ্ছে ওরা। তিব্বতী ভাষায় সামান্য কথা বলতে পারলেও লেখার ক্ষেত্রে আফশেনেইটরের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছি আমি। ভ্রমণের সময়ে এ ব্যাপারে অনেক পড়াশোনা করেছে ও। আমাকেও কিছু কিছু জিনিস শিখিয়েছে।

কিন্তু লেখা শিখতে কয়েক বছর সময় লেগে গেছে আমার। এই ভাষার বেশিরভাগ অক্ষর প্রাচীন ভারতীয় পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে। তাই লেখা দেখে মনে হয় ভাষাটা হয়তো হিন্দি।

তিব্বতে মানসম্পন্ন বেশ কয়েকটা কাগজের মিল আছে। এখানে জুনিপার গাছের কাঠ দিয়ে কাগজ তৈরি করা হয়। এ ছাড়া প্রচুর কাগজ আমদানি করা হয় নেপাল আর ভুটান থেকে। একই পদ্ধতিতে কাগজ বানানো হয় সেখানে। কইচু নদীর তীরে একটা কাগজের মিল আছে। সেখানে নিজের চোখে কাগজ বানাবার পদ্ধতিটা দেখেছি। কাগজ মসৃণ না হওয়ায় লেখার সময় অনেক সমস্যায় পড়তে হয়।

আমরা এখন থাঙ্গমের পরিবারের একজন হয়ে গেছি। মিসেস থাঙ্গমে তাঁদের নানারকম সমস্যা নিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন। আমরা তাঁর রান্নার প্রশংসা করায় খুব খুশি হলেন তিনি।

একদিন নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর অলঙ্কারগুলো আমাদেরকে দেখালেন। বিশাল একটা সিন্দুকের ভিতরে অসংখ্য ছোট বাক্সে আর সিল্কের কাপড়ে মুড়ে রাখা হয়েছে সেগুলো।

তাঁর কাছ থেকে তিব্বতের অদ্ভুত একটা নিয়মের কথা জানতে পারলাম। এখানে স্বামীর পদমর্যাদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে অলঙ্কার উপহার দিতে হয়।

ইতিমধ্যে আটদিন হয়ে গেছে থাঙ্গমের বাসায় আছি। এই কদিনে ওদের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ব, আগে ভাবতে পারিনি। এখন আমাদের সমস্যা বলতে আছে শুধু বাইরে বের হতে না পারা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটারও বোধহয় সমাধান হয়ে যাবে।

একদিন হঠাৎ কিছু চাকর এল থাঙ্গমের বাসায়। দেখে মনে হচ্ছে কোনও বার্তা নিয়ে এসেছে। সত্যি তাই! দালাই লামা আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু আমরা তো ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে আছি। ব্যাপারটা নিয়ে থাঙ্গমের সঙ্গে আলাপ করলাম। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন একটা আমন্ত্রণ বুঝি সবকিছু শেষ করে দেবে।

কিন্তু দালাই লামা বা প্রশাসকের কাছ থেকে তলব জারি হওয়ায় পুরো পরিস্থিতি পাল্টে গেল। আটকানো বা প্রশ্ন করা তো দূরের কথা, সামান্যতম বিরক্ত হলেও সেটা গুরুতর অপরাধ হিসাবে ধরা হবে। এরপর থাঙ্গমে আর কোনও আপত্তি করলেন না।

দালাই লামার বাসায় যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে প্রথমে খুব খুশিই হয়েছিলাম আমরা। কিন্তু হঠাৎ মনের মধ্যে সন্দেহ জাগল আবার কোনও বিপদে পড়ব না তো!

BanglaBook.org

কে জানে কি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

নতুন কাপড় পরে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম আমরা। এই প্রথম তিব্বতী বুট পরেছি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদেরকে বেশ পরিপাটি বলেই মনে হচ্ছে।

বাসা থেকে বের হবার আগে থাঙ্গমে একজোড়া সাদা চাদর দিলেন। আমাদেরকে রিসিভ করার সময় এগুলো দিতে হবে। কাইরঙে এই চাদরগুলো আগেও দেখেছি। উঁচু পর্যায়ের কোনও মানুষের সঙ্গে দেখা করার সময় বা তাঁর কাছে কোনও আবেদন নিয়ে গেলে কিংবা কোনও উৎসবে যাওয়ার সময় এই চাদর দেওয়া হয়। তিব্বতে নানা বিচিত্র ধরনের চাদর পাওয়া যায়।

দালাই লামার অভিভাবকদের বাসা খুব একটা দূরে নয়। কিছুক্ষণ হাঁটার পর বিশাল একটা গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দারোয়ান আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সম্মান জানিয়ে মাথা নোয়াল সে। শাকসবজির খেত আর জমকালো উইলো বাগানের মধ্যে দিয়ে রাজপ্রাসাদে পৌঁছালাম। ওপর তলায় যাওয়ার পর হঠাৎ একটা গেট খুলে গেল আমাদের সামনে।

ভিতরে তাকাতে দেখলাম, দালাই লামার মা। শ্রদ্ধা জানিয়ে মাথা নোয়ালাম। ছোট্ট একটা সিংহাসনে বসে আছেন তিনি। ঘরটা বিশাল আর উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে। ঘর জুড়ে অসংখ্য চাকর-বাকর তাঁকে ঘিরে রেখেছে। মায়ের চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। এই মহীয়সী জননীকে তিব্বতীরা যেমন শ্রদ্ধা করে, তেমনি আবার ভয়ও পায়। কিন্তু তাঁর মধ্যে ভয়ের কী আছে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম না। তবে তাঁকে দেখার পর আমাদের মনে হচ্ছে পরিবেশটা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। চাদর দেওয়ার সময় বুঝতে পারলাম তিনি খুশি হয়েছেন। চাকরের হাতে চাদরটা দিলেন। তিব্বতীরা হ্যান্ডশেক করায় অভ্যস্ত না হলেও, আমাদেরকে সমর্থন জানিয়ে হাসিমুখে হ্যান্ডশেক করলেন তিনি।

এমন সময় একজন প্রবীণ ভদ্রলোক ঢুকলেন ঘরে। চেহারার ভাব-গাম্ভীর্য দেখে বুঝতে কষ্ট হলো না ইনিই দালাই লামার বাবা। তাঁর উদ্দেশে মাথা নত করে আগের নিয়মে চাদর দিলাম। তিনিও আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন।

এই বাড়িতে প্রায়ই ইউরোপের লোকজন আসা-যাওয়া করে। কাজেই ইউরোপের মানুষের কেতা-কায়দা ভালোই জানা আছে তাঁদের। তবে এতে তাঁদের বিন্দুমাত্র গর্ব নেই।

কিছুক্ষণ পর চা খেতে বসলাম। সুগন্ধটাই বলে দিল এটা সাধারণ তিব্বতী চা নয়। আমি চা সম্পর্কে জানতে চাইতেই বরফ গলে গেল। আমরা নিজে থেকে কিছু জানতে চাইনি, গল্পে-গল্পে আগের বাসা সম্পর্কে অনেক কথা বললেন দালাই লামার বাবা-মা।

অবতার বা গৌতম বুদ্ধের প্রতিমূর্তি হয়ে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন, দালাই লামা এই পরিচিতি পাবার আগে তাঁরা চিনের আমডোতে ছিলেন। বলা যায় সাধারণ একটা কৃষক পরিবার। জায়গাটা চিনের একটা প্রদেশ, চিংগাই-তে। ওই এলাকার প্রায় সবাই

BanglaBook.org

তিব্বতী। সেখান থেকেই চায়ের পাতা নিয়ে আসা হয়েছে। এখানকার তিব্বতীরা চায়ের সঙ্গে মাখন মেশায়। কিন্তু তাঁরা মেশান দুধ আর লবণ। চায়ের পাতা ছাড়াও সেখানকার আঞ্চলিক ভাষাটাও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন তাঁরা। মধ্য প্রদেশে যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয় সেটারই অন্য একটা সংস্করণ ব্যবহার করছেন।

দালাই লামার ভাই তাঁদেরকে তিব্বতী ভাষা বুঝিয়ে দেয়। লাসায় সে একেবারে বাচ্চা বয়সে এসেছিল। তারপর বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব দ্রুত সে তিব্বতী ভাষা শিখে ফেলেছে। শুধু মা-বাবার সঙ্গে কথা বলার সময় সে আমডোর আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে।

কথা বলার সময় আমরা বোঝার চেষ্টা করছিলাম তাঁরা আসলে কেমন মানুষ। বলাই বাহুল্য, প্রত্যেকের আচরণেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমরা।

দালাই লামার ভাই লবস্যাঙ স্যামটেন খুব হাসি-খুশি। আমাদের ব্যাপারে তার কৌতূহলের কোনও শেষ নেই। একের পর একের প্রশ্ন করে জর্জরিত করে দিচ্ছে। কথায় কথায় জানাল, তার ওপর বিশাল একটা দায়িত্ব চেপেছে। দালাই লামার নির্দেশ–আমাদের ব্যাপারে সব খুঁটিনাটি তথ্য জানতে হবে তাকে। আমাদের ব্যাপারে দালাই লামার কৌতূহল আছে জেনে খুব খুশি হলাম। আমি নিজেও দালাই লামার ব্যাপারে কম কৌতূহলী নই।

গল্পে গল্পে জানতে পারলাম তিব্বতে 'দালাই লামা'–নামটা ব্যবহার করা হয় না। এই নামটা মঙ্গোলিয়ান, অর্থ–'বিশাল সমুদ্র'। এখানে সবাই দালাই লামাকে 'গয়ালপো রিমপোচি' বা 'মহার্ঘ রাজা' বলে জানে। তাঁর বাবা-মা আর ভাই তাঁকে 'কুনদুন' বলে ডাকেন, যার অর্থ–'উপস্থিতি'।

দালাই লামারা মোট ছয় ভাইবোন। সবচেয়ে ছোট ছেলেকেও অবতার বা গৌতম বুদ্ধের প্রতিমূর্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সে ত্যাগসেল আশ্রমে একজন লামা হিসাবে কাজ করছে। তার নামের সঙ্গেও রিমপোচি পদবীটা আছে। লামাদের সবাইকেই আসলে এই নামে ডাকার রীতি প্রচলিত। তবে এটা অনেক আগের ঘটনা। তখনও দালাই লামাকে গৌতম বুদ্ধের প্রতিনিধি বা প্রতিমূর্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি।

দ্বিতীয় ছেলে গায়লো তন্দ্রূপ চিনা একটা স্কুলে লেখাপড়া করছে। আমাদের তরুণ সঙ্গী লবস্যাঙের নির্ধারিত নিয়তি হলো সন্ন্যাসীর জীবনযাপন। দালাই লামার এখন এগারো বছর বয়স। ভাই ছাড়া তাঁর দুটো বোনও আছে। তাদের মধ্যে নগারি রিমপোচি একজন অবতার বা গৌতম বুদ্ধের প্রতিমূর্তি। তিনজন অবতারের মা হওয়ায় বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের জগতে এই মহীয়সী জননী একটা রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন।

তিব্বতে থাকার সময় তাঁর সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক হয়ে গেল আমাদের। লালচিন হামলা করার পর তিনি তিব্বত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন।

ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম দালাই লামার বাসায় আমাদের আমন্ত্রণটা ছিল বিশেষ কিছু। নিজ পরিবারের সদস্য আর বাড়ির কয়েকজন চাকর ছাড়া আর কেউ দালাই লামার সঙ্গে দেখা করতে পারে না। ওঁর চাকরবাকরদের কোনওভাবেই সাধারণ বলা

BanglaBook.org

তো এগুলো ছাড়া চলতেই পারেন না।

বাসায় ফিরে দেখি ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি থাঙ্গমের বন্ধু। আমাদের ভ্রমণ এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শোনার খুব আগ্রহ তাঁর। গারটোকে তিনি ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

আশা করছি তাঁর মাধ্যমে দেশে একটা খবর দিতে পারব। তবে ইতিমধ্যে বোধহয় বাড়ির লোকজন আমাদের ব্যাপারে সব আশা ছেড়ে দিয়েছে।

তিব্বত থেকে বাইরের বিশ্বের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে হলে ব্রিটিশ প্রতিনিধিই একমাত্র ভরসা। কারণ তিব্বতের সঙ্গে ওয়ার্ল্ড পোস্টাল ইউনিয়নের কোনও সম্পর্ক নেই। আর এখান থেকে ডাকযোগে কিছু পাঠাতে হলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়।

ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদেরকে অফিসে আসতে বললেন।

পরদিন সকালে রাষ্ট্রদূতের কার্যালয়ের দিকে রওনা হলাম। শহরে ঘোরার সময় অফিসটা খেয়াল করেছি। পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না।

ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত মিস্টার হপকিনসন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন আমাদের। কিছুক্ষণ পর ইংলিশ নাস্তার আয়োজন করা হলো বারান্দায়। দামী চেয়ার, সাজানো-গোছানো টেবিল আর ইউরোপিয়ান ঢঙে রাখা বইগুলো দেখে আমাদের বিস্ময় যেন বাঁধ মানছে না। মনে হচ্ছে কোনও এক অলৌকিক উপায়ে হঠাৎ বুঝি নিজেদের বাসায় ফিরে এসেছি।

আমরা কি ভাবছি সেটা বুঝতে পারলেন হপকিনসন। বইগুলোর দিকে বার বার তাকাতে দেখে লাইব্রেরি ব্যবহার করারও প্রস্তাব দিলেন।

ইতিমধ্যে মিস্টার হপকিনসনের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে শুরু করেছি। একটা ব্যাপার নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তিনি কি এখনও আমাদেরকে যুদ্ধাপরাধী বলে ভাবছেন? স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ, কাজেই ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলাম আমরা।

তবে শেষ পর্যন্ত কৌতূহল চেপে রাখা গেল না, সরাসরি জানতে চাইলাম—আমাদের কমরেডরা কি এখনও কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে আছে?

কিন্তু মিস্টার হপকিনসন এ-ব্যাপারে কিছু জানাতে পারলেন না। তবে কথা দিলেন, ভারত থেকে খবরটা সংগ্রহ করা যায় কি না দেখবেন তিনি।

এরপর তিনি খোলাখুলি আমাদের প্রসঙ্গটা তুললেন। পি. ও. ডব্লিউ ক্যাম্প থেকে পালানো আর আমাদের অভিযান—সবকিছুই জানেন তিনি। সরকারের কাছ থেকে তিনি জেনেছেন আমরা নাকি খুব দ্রুত ইন্ডিয়ায় চলে যাচ্ছি। বুঝতে পারলাম এ-কথা বলে ইঙ্গিতে আমাদেরকে তিব্বত ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছেন। স্বভাবতই বেশ বিব্রত বোধ করলাম।

সেটা বুঝতে না পারার মতো বোকা নন তিনি। হঠাৎ জানতে চাইলেন, আমরা সিকিমে কাজ করতে আগ্রহী কি না। জানালাম, তিব্বত ছেড়ে যাওয়ার কোনও ইচ্ছা আদৌ আমাদের নেই। সঙ্গে যোগ করলাম যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে আমরা খুশি

BanglaBook.org

যাবে না। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, তাঁরা বিভিন্ন আশ্রমের অধ্যক্ষ।

পৃথিবীর সব ব্যাপার থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন দালাই লামা। বলা যায় কৃপাবশত তিনি আমাদের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন। চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি। এই সময় জানতে চাওয়া হলো আমাদের কিছু লাগবে কিনা। স্বভাবতই উত্তরে না বললাম আমরা। তবে তার আগে ধন্যবাদ জানাতে ভুলিনি।

কিন্তু আমরা না বলা সত্ত্বেও বিভিন্ন খাবার, সাম্বা, ঘি আর উলের তৈরি নরম কম্বল নিয়ে আসল চাকররা।

'এগুলো কুনদুনের পক্ষ থেকে দেওয়া হলো,' হাসিমুখে বললেন মহীয়সী মা। তারপর জোর করে আমাদের হাতে একটা একশ' স্যাঙ নোট গুঁজে দিলেন। পুরো ব্যাপারটা এতই সহজ আর স্বাভাবিকভাবে ঘটল যে জিনিসগুলো নিতে আমরা একটুও লজ্জাবোধ করলাম না।

এরপর বিদায় নেওয়ার পালা। কিন্তু আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। মাথা নত করার সময় আমাদের ঘাড়ে চাদর পরিয়ে দিল লবস্যাঙ।

তার পিছু নিয়ে বাগানে গেলাম। আমাদেরকে বাগান আর আশপাশের জায়গা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে সে। একটা আস্তাবল চোখে পড়ল। সিলিং আর লি থেকে আনা বেশ কয়েকটা সুন্দর ঘোড়া রাখা হয়েছে সেখানে। নানা বিষয়ে কথা হচ্ছে। লবস্যাঙ জানাল, সে আমার কাছ থেকে পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ে জানতে আগ্রহী। মনের গোপন ইচ্ছাটা পূরণ হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ভালোই লাগল আমার। প্রায়ই অভিজাত পরিবারের ছোট ছেলেকে পড়াবার কথা ভাবতাম আমি।

বিভিন্ন উপহার আর চাকরদের নিয়ে থাঙ্গমের বাসায় ফিরে এলাম আমরা। দালাই লামার বাসা থেকে ভালো ব্যবহার পেয়ে মন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ভাবছি ফাটাফুটা ভাগ্যটা এবার বুঝি জোড়া লাগবে। থাঙ্গমে খুব উত্তেজিতভাবে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দালাই লামার বাসায় কি কি ঘটেছে সব বিস্তারিত জানালাম তাঁকে।

পরদিন দালাই লামার ভাই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমাদের গৃহকর্ত্রী প্রথমে তাঁর সামনেই এলেন না। পরিবারের সব সদস্য যখন তাকে দেখার জন্য জড়ো হলো তখন শ্রদ্ধা জানাতে তাদের সঙ্গে এলেন তিনি।

তরুণ রিমপোচির বয়স এখন ২৫ বছর। মূলত আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যই আশ্রম থেকে এসেছেন। বাড়ির সবার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন তিনি। এই প্রথম একজন লামার সঙ্গে দেখা হলো আমাদের। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে তিব্বতের সব সন্ন্যাসীই বুঝি লামা। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। লামা শুধু তাঁদেরকে বলা হয় যারা পুনর্জন্ম লাভ করেছেন। তবে যে-সব সন্ন্যাসী অলৌকিক কাজ করতে পারেন কিংবা তপস্বী জীবন-যাপনে আর সবার চেয়ে আলাদা তাঁদেরকেও লামা বলা যাবে। সাধারণ মানুষকে আশীর্বাদ করার অধিকার আছে প্রত্যেক লামার। সিদ্ধপুরুষ হিসাবে তাঁদেরকে সবাই গভীর শ্রদ্ধা করে।

BanglaBook.org

সাত

শান্ত পানি

স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার অনুমতি / লাসার গুরুত্বপূর্ণ জায়গা / সারঙের আতিথেয়তা / নতুন আশঙ্কা / নববর্ষের উৎসব

এখানে আসার ঠিক দশ দিন পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হলো, আমরা এখন স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারব। সেই সঙ্গে ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি আলখেল্লা দেওয়া হলো। দেরি করলাম না, সেই দিনই শহরটা ঘুরে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, আমাদের তিব্বতী জোব্বা কারও মনে এতটুকু কৌতূহল জাগাচ্ছে না।

সে যাই হোক, সবকিছু ঘুরেফিরে দেখছি আমরা। দোকানের অভাব নেই শহরে। সারি সারি দোকান সামনে এগিয়ে গেছে, আর অসংখ্য ডিলার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে রাস্তায়। জেনারেল স্টোরগুলোতে সুই থেকে শুরু করে রাবার বুট–সবকিছুই পাওয়া যায়। তার পাশেই আধুনিক দোকানে পরদা আর সিল্ক বিক্রি হচ্ছে। খাবারের দোকানও আছে। দেশীয় খাবার থেকে শুরু করে আমেরিকান কর্ন বিফ, অস্ট্রেলিয়ান বাটার আর স্কচ হুইস্কি–কী নেই! কেউ কোনও জিনিস কিনতে এসে ফিরে যাবে–এমনটি যাতে না ঘটে সেদিকে নিশ্ছিদ্র খেয়াল রেখেছে দোকানিরা। তাদের কাছে না থাকলেও অর্ডার দিলে দিন কয়েকের মধ্যেই ক্রেতা তার প্রয়োজনীয় জিনিস পেয়ে যাবে। এমন কি এখানে এসে কেউ আমেরিকান কসমেটিকস চাইলেও তাকে হতাশ হতে হবে না।

কিছুদূর যাওয়ার পর বিরাট এক ইউরোপিয়ান দোকান চোখে পড়ল। ওখানে শুধু উলের তৈরি ইউরোপিয়ান টুপি বিক্রি হয়। তিব্বতীরা তাদের নিজস্ব পোশাকের সঙ্গে যে টুপি ব্যবহার করে সেটা সত্যিই খুব সুন্দর। সরকার চায় না তিব্বতে ইউরোপিয়ান পোশাক জনপ্রিয় হয়ে উঠুক। কারণ তাতে দেশীয় পোশাকের যে সৌন্দর্য সেটা আর রক্ষা করা যাবে না।

টুপি ছাড়াও ছাতা আর সানশেড তিব্বতীদের নিত্যসঙ্গী। বিশেষ করে সন্ন্যাসীরা

BanglaBook.org

মনেই তাঁর যে কোনও প্রস্তাব মেনে নেব।

এমন এক বিষয় নিয়ে আমরা আলাপ করছি, পরিবেশটা এমনিতেই আড়ষ্ট হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু ঘটল ঠিক তার উল্টো। তাঁর অমায়িক ব্যবহার এবং উৎসাহে টেবিলের প্রত্যেকটা খাবার সদ্ব্যবহার করলাম আমরা।

মিস্টার হপকিনসনের সঙ্গে দেখা করার পর আমাদের মনে যে দুশ্চিন্তা ছিল তা দূর হয়ে গেছে। এখন ইংরেজরা নিশ্চয়ই বুঝবে আমরা এখানে কারও কোনও ক্ষতি করতে আসিনি।

মিস্টার হপকিনসনকে বিদায় জানিয়ে বাড়ি ফিরছি। এ-সময় কয়েকজন লোক পথ আটকাল। বলছে তাঁদের মনিব নাকি আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অস্থির হয়ে আছেন। জানতে চাইলাম কে তিনি। উত্তরে চাকররা জানাল, তিনি আশ্রমের একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা।

চাকরদের সঙ্গে ওই কর্মকর্তার বাড়িতে গেলাম আমরা। কথা বলে বুঝতে পারলাম কেন তিনি আমাদের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তাঁর মতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় তিব্বত খুব পিছিয়ে আছে। এখানে আমাদের মতো আধুনিক লোক আর একটাও নেই। ইচ্ছে করলেই আমরা তিব্বতের জন্য অনেক কিছু করতে পারি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সবাই এ-কথা মানতে রাজী নন। আফশেনেইটর কৃষিবিদ, এটা শোনার পর যার-পর-নাই খুশি হলেন তিনি। তিব্বতে একজনও দক্ষ কৃষি বিশেষজ্ঞ নেই।

পরদিন একে একে তিব্বতের চার মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলাম আমরা। সবাই আশাতীত ভালো ব্যবহার করলেন। শুধু সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হয় বলে, তিব্বতে ওঁরা বিপুল ক্ষমতার অধিকারী।

আমাদের সম্পর্কে কে কী ভাবছে সে ব্যাপারে কিছুটা হলেও জানতে পারছি। কয়েক দিন পর গেলাম চিনা রাষ্ট্রদূতের কার্যালয়ে। উদ্দেশ্য একটাই– তিনি যাতে আমাদের সম্পর্কে কোনও ভুল ধারণা না রাখেন।

চিনাদের বিনয়ী স্বভাব সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সও সেটার প্রমাণ দিলেন। তাঁকে জানালাম, আমরা চিনে গিয়ে কাজ করতে চাই। হতাশ করলেন না তিনি। কথা দিলেন এই ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে আলাপ করবেন।

আমরা যে তিব্বতের কোনও রকম ক্ষতি করতে আসিনি, সেটা সবাইকে বোঝাবার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করছি।

রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় প্রায়ই লোকজন আমাদেরকে অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে। একদিন হঠাৎ এক চাইনিজ ছবি তুলে ফেলল আমাদের। লাসায় কারও হাতে ক্যামেরা থাকা খুব বিচিত্র। চিন্তায় পড়ে গেলাম ব্যাপারটা নিয়ে। কারণ ইতিমধ্যে জেনেছি লাসায় কিছু মানুষ আছে, যারা দেশের বাইরে তথ্য পাচার করে। কে জানে এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আমাদেরকে সিক্রেট এজেন্ট বলে ধরে নিয়েছে। এখানকার ইংরেজরা ছাড়া আর কেউ তো আমাদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না। কাজেই আমাদের সম্পর্কে সাধারণ তিব্বতীরা যা ইচ্ছে তাই ভাবছে। আসলে আমাদের তো কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। যতদিন ইউরোপে ফিরতে পারছি না, ততদিন শুধু

BanglaBook.org

আশ্রয় আর কাজ দরকার।

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে বসন্ত এলো। লাসা কায়রোর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, এবং অনেক উঁচু হওয়ায় সূর্যের তাপটা ভালোই টের পাচ্ছি।

সব মিলিয়ে বেশ ভালো আছি। প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসছে। প্রথমদিকে ভালো লাগলেও, এখন ব্যাপারটা ক্লান্ত করে তুলছে আমাদের। তাই নিয়মিত কাজ আর একটু খেলাধুলোর সুযোগ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি।

বাস্কেটবল খেলার ছোট্ট একটা মাঠ ছাড়া লাসায় খেলাধুলোর জন্য আর কোনও ব্যবস্থা নেই। বাস্কেটবলই সই। আমাদের খেলার কথা শুনে তিব্বতী আর চাইনিজ তরুণরা খুব খুশি হলো। মাঠটার পাশে, চৌরাস্তায় একটা হট শাওয়ার বাথও আছে। কিন্তু একটা সিঙ্গেল শাওয়ার বাথের ভাড়া দশ রুপি। যেখানে ভেড়া পাওয়া যায় বিনামূল্যে, সেখানে গোসল করতে লাগবে দশ রুপি–ব্যাপারটা সত্যি যেমন বিস্ময়কর তেমনি হাস্যকর!

কয়েক বছর আগে একটা ফুটবল মাঠ ছিল লাসায়। মোট এগারোটা টিম কাপ-টাই ম্যাচে অংশ নিত। একদিন ম্যাচ চলার সময় শুরু হলো শিলাবৃষ্টি। প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হলো তাতে। কিন্তু অবাক ব্যাপার হচ্ছে এই শিলাবৃষ্টির কারণে ফুটবল খেলা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। প্রশাসক ভয় পাচ্ছিলেন এই খেলা চলতে দিলে তিব্বতে হয়তো চার্চের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। কারণ তিব্বতে ফুটবল খুব জনপ্রিয় ছিল। এমন কি সেরা আর ড্রেবাঙ থেকে অনেক সন্ন্যাসীও খেলা দেখতে আসত। তাই শিলাবৃষ্টিকে বিধাতার একটা অশুভ বার্তা ধরে নিয়ে ফুটবলকে চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়।

শিলাবৃষ্টির কারণে ফুটবল নিষিদ্ধ! তিব্বতে এসে এটাও এখন বিশ্বাস করতে হবে আমাদের।

তিব্বতীরা বিশ্বাস করে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কয়েকজন বন্ধুর কাছে জানতে চাইলাম, শিলাবৃষ্টি আটকে রাখার বা মুষলধারায় বৃষ্টি নামাবার মতো ক্ষমতা কি তিব্বতী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আছে? ওদের উত্তরটা হলো বেশ বড়।

সব মাঠেই ছোট ছোট পাথরের স্তূপ আছে। আবহাওয়াকে উৎসর্গ করবার জন্য সেটার ওপর ডিম, বাদাম, বীজ ও ফল রাখা হয়। ঝড়ের আভাস পেলেই ধূপ জ্বালানো হয় সেখানে। প্রত্যেক গ্রামেই আবহাওয়া নিয়ন্ত্রক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আছেন। তিব্বতীরা তাদেরকে খুব সম্মান করে। ঝড় এলেই সন্ন্যাসীরা তাঁদের জাদু দেখাবার জন্য শঙ্খে ফু দিয়ে শব্দের সৃষ্টি করে। আমাদের পর্বত ঘেরা গ্রামগুলোতে ঝড় এলেই চার্চে ঘন্টা বাজানো হয়, যাতে মানুষ সতর্ক হতে পারে। এখানকার এই শঙ্খধ্বনিকেও সেটার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। পার্থক্য শুধু একটাই, তিব্বতীরা সতর্ক হয় না। কারণ তাদের কাছে সবকিছুই জাদু, অভিশাপ আর বিধাতার লীলাখেলা।

তেরোতম দালাই লামা ক্ষমতায় থাকার সময় মজার একটা ঘটনা ঘটেছিল তিব্বতে। তাঁর নিজস্ব একজন আবহাওয়া নিয়ন্ত্রক ছিলেন। দালাই লামার গ্রীষ্মকালীন

BanglaBook.org

অবকাশ বাগানবাড়ি রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর।

হঠাৎ একদিন প্রচণ্ড শিলাঝড়ে বাগানের সব ফুল আর পাকা ফল নষ্ট হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রককে গৌতম বুদ্ধের জীবন্ত প্রতিমূর্তি তেরোতম দালাই লামার সামনে হাজির করা হলো। দালাই লামা তখন সিংহাসনে বসে তাস খেলছিলেন। আবহাওয়া নিয়ন্ত্রককে জাদু দেখাবার নির্দেশ দিলেন তিনি। জানালেন এই কাজে ব্যর্থ হলে তাঁকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

আর বাড়তি শাস্তি হিসাবে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রকের পদটা তো হারাতে হবেই তাঁকে। ভয়ে জাদুকরের শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল। অনেক কষ্টে গলা দিয়ে আওয়াজ বের করে একটা ছাঁকনি চাইল সে। ছাঁকনির মধ্যে পানি রাখা হবে, কিন্তু এক ফোঁটা পানি নিচে পড়বে না–এইরকম একটা জাদু দেখালে দালাই লামা সন্তুষ্ট হবেন কিনা জানতে চাইলেন জাদুকর।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন দালাই লামা।

ছাঁকনির মধ্যে পানি রাখার পর দেখা গেল ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সব পানি। কিন্তু সেটা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য। পরক্ষণেই স্থির হয়ে গেল পানি। ছাঁকনির ফুটো দিয়ে এক ফোঁটা পানি নিচে পড়ছে না। এভাবে সেবারের মতো বেঁচে গেলেন জাদুকর।

আমাদের মাথায় এখন একটাই চিন্তা–লাসায় থাকতে হলে যেভাবেই হোক রোজগারের একটা উপায় বের করতে হবে। আপাতত সম্মানীয় অতিথির মতো আচরণ করা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে। একের পর এক সাম্বা, মাংস, ঘি, আর চা পাতার পার্সেল আসছে।

হঠাৎ একদিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঁচশো রুপি পাঠানো হলো। প্রথমে বিশ্বাসই হচ্ছিল না। ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখলাম। জানালাম খাবার আর থাকার জায়গার নিশ্চয়তা দিলে এখনই আমরা সরকারের জন্য কাজ করতে চাই।

গত তিন সপ্তাহ ধরে আমরা থাঙ্গমের আতিথেয়তা ভোগ করছি। এমন সময় সারঙ তাঁর বাসায় আমাদের থাকার প্রস্তাব দিলেন। তাঁকে বেশ ধনী বলা যায়। খুশি মনেই রাজি হলাম আমরা। থাঙ্গমের ছেলেমেয়ে চারজন। বুঝতে পারছিলাম আমাদেরকে থাকতে দিতে তাঁর খুব সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু এই ব্যাপারে কখনওই অভিযোগ করেননি তিনি। লাসায় আসার পর আমাদেরকে দরিদ্র ভবঘুরে ধরে নিয়েছিলেন ভদ্রলোক। আমাদের সঙ্গে সত্যিকার একজন বন্ধুর মতো আচরণ করেছেন। তাঁর সৌজন্যবোধের কথা আমরা কখনো ভুলব না। নতুন বছরে সবার আগে তাঁকেই চাদর দিয়েছি আমরা। নিজস্ব একটা বাসা পাওয়ার পর প্রত্যেক ক্রিসমাস পার্টিতে থাঙমেকে দাওয়াত করেছি আমি।

সারঙ আমাদের জন্য বিশাল ঘরের ব্যবস্থা করলেন। কী নেই সেই ঘরে! ইউরোপিয়ান ফার্নিচার থেকে শুরু করে টেবিল, ইজি চেয়ার, খাট আর চোখ-জুড়ানো কার্পেট–সবই আছে। পাশে একটা ছোট ঘর দেখলাম। সেটাও আমাদের জন্য। কিন্তু পরিষ্কার করা হয়নি। এতদিন তিব্বতে আমরা ক্লজিটের খুব অভাব বোধ করছিলাম।

BanglaBook.org

এখানে সেটাও পাওয়া গেল।

একাধিক বাবুর্চি রাখার মতো ক্ষমতা আছে সারঙের। তাঁর শেফ কলকাতার সবচেয়ে ভালো হোটেলে কয়েক বছর চাকরি করেছে। শুধু তাই নয়, ইউরোপিয়ান খাবার সম্পর্কেও তার ভালো ধারণা আছে। তার রোস্ট করা মাংসের তুলনা হয় না। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের পেস্টি আর কনফেকশনারি তৈরিতেও দক্ষ সে। বাকি সব শেফদের পাঠানো হয়েছে চিনে। চাইনিজ ডিশ সম্পর্কে ভালো করে জেনে তবেই দেশে ফিরবে তারা।

সারঙ নিত্য-নতুন খাবার পরিবেশন করে তাঁর অতিথিদের চমকে দিতে ভালোবাসেন। স্বীকার করতেই হবে এই কাজে তিনি নিঃসন্দেহে সফল একজন ব্যক্তি।

তিব্বতের একটা ব্যাপার খেয়াল করে বেশ অবাক হয়েছি আমরা। এখানে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিরাও তাঁদের রান্নার কাজে কোনও বাঁধুনি রাখেন না। মহিলারা নিয়োগ পায় শুধু কিচেন মেইড হিসাবে।

তিব্বতীদের খাবার সময় আর আমাদের খাবার সময় পুরোপুরি এক নয়। সকালবেলা উঠেই এক কাপ বাটার টি খায় ওরা। তারপর দিনভর চলে এই চা খাওয়া। শুনেছি খুঁজলে নাকি এরকম মানুষও পাওয়া যাবে যে সারাদিন দুশ' কাপ চা খায়। লোকমুখে শোনা, তাই ধারণা করি হিসাবটা অতিরঞ্জিত।

দিনে মোট দুবার খায় তিব্বতীরা। প্রথমে সকাল দশটায়, তারপর সেই সূর্যাস্তের পর। সকাল দশটার খাবারে থাকে সাম্বা। সকালের নাস্তাটা আমরা নিজেদের ঘরে নিয়ে যাই। তবে সন্ধ্যার সময় আমাদেরকে সবার সঙ্গে খাবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। পরিবারের সবাই একটা বড় টেবিলে গোল হয়ে বসে। বিভিন্ন ধরনের খাবারের আয়োজন করা হয় এ-সময় আর পরিবেশটা হয়ে ওঠে খুব আনন্দমুখর। পরিবারের সবাই এক হয়ে সারাদিন ঘটে যাওয়া নানারকম ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে তখন।

সাপার শেষে আমরা লিভিং রুমে চলে এলাম। কিছুক্ষণ পর সিগারেট আর বিয়ার দেওয়া হলো। ঘরটাতে অসংখ্য কম্বল, সিন্দুক আর খোদাই করা মূর্তি আছে। এখানেও আমাদেরকে চমকে দেওয়ার মতো জিনিসের অভাব নেই। একটা অয়ারলেস সেট দেখলাম। ওটা দিয়ে পৃথিবীর সব স্টেশন ধরা যায়। আধুনিক কিছু গানও আছে।

এককোণে একটা সিনে ক্যামেরা রাখা, দু'চারদিনের মধ্যে জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখা হবে। ছবি বড় করা যায় এমন কিছু যন্ত্রপাতিও চোখে পড়ল। তিব্বতে সারঙের মত সৌখিন মানুষ আর একটাও নেই। এরকম উঁচু পর্যায়ের একজন মানুষের বাসায় থাকার সুযোগ পাব, সেটা আমরা কল্পনাও করিনি।

সারঙ স্ট্যাম্পও সংগ্রহ করেন। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। নিজে ইংরেজি জানেন না বলে এই কাজে ছেলের সাহায্য নিতে হয় তাঁকে। নিজস্ব একটা লাইব্রেরিও আছে। সেখানে স্থান পেয়েছে বাছাই করা কিছু ওয়েস্টার্ন বই। বইগুলোর বেশিরভাগই ইউরোপিয়ানদের কাছ থেকে পাওয়া। যারা লাসায় এসে তাঁর বাসায় থেকেছে, তারাই সারঙকে সুভ্যেনির হিসাবে বইগুলো উপহার দিয়েছে।

BanglaBook.org

তিব্বতে সারঙ বিশেষ একজন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। তিনি সংস্কারে বিশ্বাসী। তিব্বতের সরকার গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপারে সমস্যায় পড়লে উপদেশ দেওয়ার জন্য সারঙকে ডাকা হয়। দেশে একমাত্র লোহার ব্রিজটা সারঙয়ের অবদান। প্রথমে ইন্ডিয়ায় ব্রিজটা বানানো ও জোড়া লাগানো হয়। তারপর সেটার সব অংশ খুলে চমরি গাই আর কুলিদের দিয়ে বহন করিয়ে আনা হয়েছে তিব্বতে। সারঙ হচ্ছেন সবদিক থেকে একজন আদর্শ মানুষ। সব কাজে তিনি দক্ষ।

তাঁর এক ছেলের নাম জর্জ। বাবার পথ অনুসরণ করে সেও স্কুলে তার হিন্দু নামটা বহাল রেখেছে। প্রথম যখন জর্জের সঙ্গে দেখা হলো তখন তার জ্ঞানের পরিধি আর সবকিছুতে কৌতূহল দেখে আমরা অবাক হয়ে গেছি।

ফটোগ্রাফিতে জর্জের খুব উৎসাহ। তার কয়েকটা ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। একদিন সন্ধেবেলা জর্জ একটা রঙিন ছবি দেখাল। আয়োজনটা তার নিজের। পরিবেশটা খুব শান্ত আর নীরব। যেন কোনও সিনেমা হলের ফার্স্ট ক্লাসে বসে ছবি দেখছি আমরা। তারপর হঠাৎ কীভাবে যেন মোটরের সঙ্গে স্পুল আটকে গেল। আমি আর আফশেনেইটর স্পুলটা আবার ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিলাম।

সারঙের সঙ্গে সাপার খাওয়া, বই পড়া, ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের বাসায় যাওয়া–দুপুরটা এভাবেই কাটছে। লাসায় থিয়েটার বা সিনেমা হল নেই। এখানকার সামাজিক জীবন সম্পূর্ণ যার যার নিজ বাসার ভিতরেই আটকে আছে।

সব মিলিয়ে ভালো আছি। আমাদের সম্পর্কে কার কী ধারণা সেটা জানার কাজেই বেশিরভাগ সময় চলে যাচ্ছে। এই কাজটা বাধ্য হয়েই করছি। হয়তো সবকিছু দেখে শেষ করার আগেই আমাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হতে পারে। যদিও জানি এরকম কিছু ঘটার তেমন কারণ নেই।

তিব্বতী বন্ধুরা এমনিতে আমাদের ব্যাপারে খুব উদার। তবে বিপদে পড়লে ওদের কাছ থেকে আমরা সমর্থন না-ও পেতে পারি। তা ছাড়া বেশ কয়েকবার একটা গল্প শোনানো হয়েছে আমাদের। গল্পটা আসলে একটা সতর্ক-সংকেত।

তিব্বতী সরকার একবার এক ইংলিশ শিক্ষককে লাসায় ইউরোপিয়ান টাইপের স্কুল চালু করতে বলেছিলেন। শিক্ষকের সঙ্গে একটা দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিও হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছয় মাস পর তিনি তাঁর তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। কারণ সন্ন্যাসীরা তাঁর কাজটাকে অসম্ভব করে তুলেছিল।

প্রতিদিনই কারও না কারও বাসায় যেতে হচ্ছে আমাদের। যার ফলে তিব্বতীরা বাসায় কীভাবে জীবন যাপন করে সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাচ্ছি।

আধুনিক জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ব্যস্ততা। সবাই যেন সবসময় দৌড়াচ্ছে। তিব্বতীরা অবশ্য এই একটা ব্যাপারে আমাদের চেয়ে এগিয়ে। তাদের মধ্যে ব্যস্ততা বলে কিছু নেই। এখানে কেউই অতিরিক্ত কাজ করে না। অফিসাররা বেশিরভাগ সময় নির্ভার থাকেন। সকালে অফিসে গেলে দুপুরের মধ্যেই বাসায় ফিরে যান তাঁরা। মেহমান আসায় বা অন্য কোনও কারণে কেউ অফিসে আসতে না পারলে সহকর্মীর বাসায় লোক পাঠিয়ে অনুরোধ করা হয় সে যাতে তার কাজটা করে দেয়।

BanglaBook.org

তিব্বতী মেয়েরা সমানাধিকার শব্দটির সঙ্গে পরিচিত নয়। এখানে তারা যেমন আছে তাতেই খুশি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা রূপচর্চা করে, মুক্তার মালা গাঁথে, নতুন নতুন জামা বানায় আর পাশের বাসার গৃহিণীকে কীভাবে চমকে দেয়া যায় সে-ব্যাপারে গবেষণা করে। বাড়ির কাজের ব্যাপারেও তাদের তেমন মাথাব্যথা নেই। যার ফলে চাকরদের সঙ্গে তাদের কখনওই বাক-বিতণ্ডা হয় না। তবে সে যে বাসার গৃহকর্ত্রী, এটা বোঝাবার জন্য সঙ্গে সবসময় একগোছা চাবি রাখে। লাসায় অতি তুচ্ছ জিনিসও লকআপে ভরে রাখা হয়।

তিব্বতীদের একটা খেলা মা-জং প্রসঙ্গে কিছু না বললেই নয়। একসময় এটা তিব্বতীদের খুব প্রিয় খেলা ছিল। বাসার কাজ, অফিসের ডিউটি–সবকিছু ভুলে দিনরাত এই খেলায় মেতে থাকত লোকজন। হাই স্টেকে খেলা হওয়ায় ব্যাপারটা নেশায় পরিণত হয়। এমনকি চাকররাও তাদের কাজের কথা ভুলে এই খেলায় মেতে থাকত।

একরকম বাধ্য হয়েই খেলাটা বন্ধ করে দেয় সরকার। মা-জং খেলার সব সরঞ্জাম তুলে এনে ঘোষণা করা হয় কেউ মা-জং খেললে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি এই ঘোষণায় কাজ হয়েছিল। মা-জং বন্ধ হওয়ার পর পড়ে থাকা কাজের পাহাড় দেখে ধীরে ধীরে লোকজন বুঝতে পারল খেলাটা আসলে মহামারি আকার ধারণ করেছিল। এরপর থেকে ছুটির দিনে তিব্বতীরা দাবা বা হালমা কিংবা শব্দজট আর ধাঁধা খেলে সময় কাটাচ্ছে।

আজ ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ তারিখ। জানুয়ারি মাসের ১৬ তারিখে আমরা লাসায় এসেছিলাম। একমাস পার হয়ে গেছে, অথচ এখনও একটা কাজ যোগাড় করতে পারিনি। অনিশ্চিত ভবিষত্যের কথা ভেবে খুব দুশ্চিন্তায় আছি আমরা।

একদিন হঠাৎ কবশ্যপা এলেন আমাদের বাসায়। মুখটা খুব গম্ভীর। সম্ভবত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের জন্য কোনও বার্তা নিয়ে এসেছেন। চেহারা দেখে আন্দাজ করতে পারছি খারাপ খবরই এনেছেন তিনি আমাদের জন্য।

যা ভেবেছি তাই। সরকার আমাদেরকে তিব্বত ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইন্ডিয়ায় চলে যেতে হবে। মনে মনে সবসময় এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম, তারপরও ব্যাপারটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে।

তবে প্রতিবাদ করতে ছাড়লাম না। কিন্তু কবশ্যপা শ্রাগ করে জানাল, এই ব্যাপারে সে কিছু করতে পারবে না। আমাদেরকে উঁচু পর্যায়ের কারও সঙ্গে কথা বলতে হবে।

দুঃসংবাদটা শোনার পর পশ্চিম তিব্বতের ম্যাপ খুঁজতে শুরু করলাম। সন্ধ্যেটা কাটল পরিকল্পনা আর রুট ঠিক করার কাজে। তবে একটা ব্যাপারে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ–কাঁটাতারের বেড়ায় আর ফিরে যাব না। দরকার হলে চেনে পালাব।

*

হাতে টাকা থাকায় আগের মতো অসহায় নই আমরা। তবে দুশ্চিন্তার কথা হচ্ছে আমার সায়াটিকার অবস্থা ভালো যাচ্ছে না। আফশেনেইয়ের সাহায্য করায় ইতিমধ্যে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের ডাক্তারকে দেখিয়েছি। তিনি কিছু পেইনকিলার আর ইনজেকশন দিয়েছেন। কিন্তু তাতে অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি। ভয় পাচ্ছি এই অসুখের জন্য হয়তো আমাদের

BanglaBook.org

সব পরিকল্পনা মাঠে মারা যাবে।

পরদিন একরাশ হতাশা নিয়ে ঘুম থেকে উঠলাম। ব্যথাটা আগের চেয়ে বেড়েছে। এই ব্যথা নিয়েই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দালাই লামার মা-বাবার বাসায় গেলাম। ভাবছি তাঁরা হস্তক্ষেপ করলে ব্যাপারটা হয়তো মিটমাট হয়ে যাবে।

লবস্যাঙ আর মহীয়সী মা প্রতিশ্রুতি দিলেন দালাই লামাকে তাঁরা পুরো ব্যাপারটা জানাবেন। তাঁরা নিশ্চিত আমাদেরকে ভালো কোনও খবর দিতে পারবেন তিনি। যদিও দালাই লামা এখনও নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা পাননি, তবুও তাঁর সুনামটা হয়তো এক্ষেত্রে কাজে আসবে।

এ-সময় আফশেনেইটর তিব্বতে আমাদের পরিচিত সব বাসায় যাচ্ছে, সাহায্য পাওয়ার সবগুলো উৎসকে যাতে কাজে লাগানো যায়। তারই অংশ হিসাবে ইংরেজিতে একটা আবেদন পত্র লিখলাম আমরা, এই কাজে তিব্বত সরকার যাতে আমাদেরকে বাধা দিতে না পারে। ওই চিঠিতে যতভাবে সম্ভব যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম আমাদেরকে যাতে তিব্বতে থাকতে দেওয়া হয়।

ভাগ্য যেন আমাদেরকে নিয়ে খেলছে। আমার সায়াটিকা এমন অবস্থায় পৌঁছাল যে এখন আর আমি চলতে-ফিরতে পারছি না। প্রচণ্ড ব্যথায় বিছানায় শুয়ে থাকতে হচ্ছে। আর ওদিকে আফশেনেইটর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যতক্ষণ পা দুটো ঠিক থাকবে ততক্ষণ পুরো শহর ঘুরে বেড়াবে।

ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখে কয়েকজন সৈন্য এলো আমাদের বাসায়। এসেই সব জিনিস-পত্র গোছগাছ করার নির্দেশ দিলো। আর কোনও উপায় নেই। এবার সত্যি চলে যেতে হবে আমাদের।

কিন্তু শরীরের যে অবস্থা তাতে আমার পক্ষে হাঁটা অসম্ভব। লেফটেন্যান্টকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, বিছানা থেকে জানালার কাছে যাওয়ার ক্ষমতাও আমার নেই। তিনি জানালেন, এক্ষেত্রে তিনি কিছু করতে অপারগ। এখানে তিনি শুধু নির্দেশ পালন করতে এসেছেন।

উত্তরে আমি বললাম, তিনি তাঁর নির্দেশদাতাকে জানান যে আমাকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। তা না হলে লাসা ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেদিনের মতো বিদায় নিল সৈন্যরা।

সাহায্য আর পরামর্শ পাওয়ার আশায় আমরা সারঙের সঙ্গে আলোচনা করলাম। কিন্তু তিনি আমাদেরকে নতুন কিছু শোনাতে পারলেন না। জানালেন সরকারের নির্দেশ অমান্য করবার ক্ষমতা কারও নেই।

ঘরে ফিরে অসুখটাকে অভিশাপ দিতে লাগলাম। আমি শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলে ওই রাতেই আমরা পালিয়ে যেতাম। কোনও কিছুই আমাদের বাধা দিতে পারত না।

কিন্তু পরদিন সকালে কিছুই ঘটল না। সৈন্যরা না আসায় কী হচ্ছে না হচ্ছে কোনও খবরই পাচ্ছি না। উদ্বিগ্ন হয়ে কবশ্যপাকে খবর পাঠালাম।

কিছুক্ষণ পর আমাদের বাসায় এলেন তিনি। আফশেনেইটর তাঁকে জানাল, আমি কতটুকু অসুস্থ। এই অবস্থায় কী করা যায় সে-ব্যাপারে আলোচনা চলছে।

BanglaBook.org

'কোনওভাবেই কি কোনও সমঝোতায় আসা যায় না?' করুণভাবে জানতে চাইল আফশেনেইটর।

হঠাৎ আমাদের মনে একটা সন্দেহ জাগল। পুরো ব্যাপারটার পিছনে ব্রিটিশরা জড়িত নয় তো! হয়তো তাদের নির্দেশেই আমাদের ওপর চাপ দিচ্ছে ওরা।

তিব্বত ছোট দেশ। তাই প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখাই স্বাভাবিক। আমরা জার্মান পি. ও. ডব্লিউ ক্যাম্পে ছিলাম। এই সামান্য কারণে আমাদেরকে বিতাড়িত করলে ইংল্যান্ড সরকারের সঙ্গে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। বুঝতে পারছি না তিব্বত সরকার এই ঝুঁকি কেন নিচ্ছে।

একজন ইংরেজ ডাক্তার তিব্বত সরকারের দূত হিসাবে কাজ করছেন। আফশেনেইটর কবশ্যপাকে প্রস্তাব দিল, ডাক্তারকে অনুরোধ করা হোক আমার শারীরিক অবস্থার একটা সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য।

প্রস্তাবটা লুফে নিলেন কবশ্যপা। আফশেনেইটর আর আমি চোরা চোখে দৃষ্টি বিনিময় করলাম। বুঝতে পারছি, আমাদের সন্দেহটাই সত্যি।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার এলেন আমাদের বাসায়। নতুন একটা খবর দিলেন তিনি। আমরা কবে তিব্বত ছেড়ে চলে যাব সেটা ঠিক করার দায়িত্ব এখন তাঁর হাতে। সরকারই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আবার আমাকে ইনজেকশন দিলেন তিনি। কিন্তু সেটা বৃথাই।

এবার নিজেকে সুস্থ করার জন্য উঠেপড়ে লাগলাম। একজন সন্ন্যাসীর পরামর্শে নিয়মিত ব্যায়াম করেছি। ব্যাপারটা প্রচণ্ড কষ্টের হলেও বুঝতে পারলাম ধীরে ধীরে আমার উন্নতি হচ্ছে। এখন একজন বুড়ো মানুষের মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাগান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারি।

সময়টা এখন বসন্তকাল। মার্চের শুরু। নববর্ষকে বরণ করে নেওয়ার অনুষ্ঠানে মেতে আছে তিব্বতীরা। এটাই তিব্বতের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান। ওদের এই অনুষ্ঠান তিন সপ্তাহ ধরে চলবে।

ভাগ্য আমাকে নিয়ে খেলছে। এই রকম একটা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তো দূরের কথা, অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছি। ঘর থেকে ওদের চিৎকার-চেঁচামেচি আর গান-বাজনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

সারঙ আর তাঁর ছেলে প্রতিদিনই আমার সঙ্গে দেখা করছেন। ওদিকে আফশেনেইটরের আনন্দের সীমা নেই। ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াচ্ছে ও। সারাদিন ঘুরে-ফিরে সন্ধ্যায় বাসায় এসে আমাকে ওদের অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়।

এই বছরটা ফায়ার-হাউন্ড-ইয়ার। মার্চ মাসের চার তারিখে সিটি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর ক্ষমতা সন্ন্যাসীদের কাছে হস্তান্তর করলেন। প্রতি নতুন বছরের শুরুতেই এটা করা হয়। তবে তিব্বতে কোনও নির্দিষ্ট দিনে বছর শুরু হয় না, ঠিক আমাদের ইস্টার উৎসবের মতো। এখানে লুনার ক্যালেন্ডার, অর্থাৎ বছরের দিন গণনা করা হয় চাঁদের হিসাবে।

উৎসবের মাঝখানে মনে হলো সরকার বুঝি আমাদের কথা ভুলে গেছে। ডাক্তার

BanglaBook.org

বলায় আমার অসুস্থতার কথা হয়তো বিশ্বাস হয়েছে সরকারের।

যাই হোক, অনেক মূল্যবান সময় পাচ্ছি। সবচেয়ে বড় কথা আমি আগের চেয়ে এখন অনেক সুস্থ। এখন ধীরে-সুস্থে চিনে যাবার ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারব।

বসন্তের সময়ে ধূলিঝড় তিব্বতের একটা নিয়মিত ব্যাপার। একবার শুরু হলে সেটা দুমাসের আগে থামে না। শহরে ঠিক দুপুরের সময় ঝড়টা ওঠে। আকাশে বিশাল কালো মেঘ দেখতে যা দেরি, মুহূর্তের মধ্যে পোটালা প্যালেস গায়েব হয়ে যায়। লোকজন যে যেখানে থাকে পড়িমড়ি করে বাসার ভিতর ঢুকে পড়ে। এক নিমেষে ফাঁকা হয়ে যায় রাস্তাঘাট। ঘরবাড়ি সমস্ত জানালাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাস্তার কুকুরগুলো এককোণে গিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হলেও এখন আমি সব জায়গাতেই চলাফেরা করতে পারছি। কতদিন আর চুপ করে বসে থাকব। আবার কাজ যোগাড় করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলাম।

সারঙ তাঁর বাগানে কয়েকশ' ফুলের গাছ লাগিয়েছেন। সবগুলো গাছই চারা থেকে হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা গাছেও ফল ধরেনি।

নতুন একটা আইডিয়া এলো আমার মাথায়। সারঙের ছেলে জর্জকে সঙ্গে নিয়ে গাছগুলোর কলম তৈরি করলাম। আমার কাণ্ড দেখে তো ওরা হেসেই খুন। তিব্বতীরা গাছের কলম করতে জানে না। ব্যাপারটা ওদের কাছে একেবারে অপরিচিত। কলম করাকে ওরা নাম দিয়ে দিল 'বিয়ে করানো'।

সবসময় ছেলেমানুষি রসিকতায় মেতে থাকে তিব্বতীরা। একটা ছুতো পেলে হয়, হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ে। রাস্তায় যদি কেউ পড়ে যায় বা হোঁচট খায়, সেটা নিয়েও ঘন্টার পর ঘন্টা হাসতে থাকে ওরা। তিব্বতীরা যে-কোনও মানুষ বা জিনিসকে নিয়ে অনায়াসে উপহাস করতে পারে। শুধু তাই নয়, ব্যঙ্গাত্মক গান গেয়ে অন্যের সমালোচনা করতেও ছাড়ে না। বলাই বাহুল্য, এসব গান গাওয়ার সময় ওরা দম ফাটানো হাসি হাসতে থাকে।

বারখোরে সন্ধ্যাবেলা দলবেঁধে ছেলেমেয়েরা ঘুরতে বের হয়। এ-সময় নতুন কোনও ব্যঙ্গাত্মক গান গাইতে থাকে ওরা। মাঝে-মধ্যে সরকারকে লক্ষ করেও গান রচনা করা হয়। কিন্তু এ-জন্য কেউ শাস্তি পায় না। আর পাবেই বা কী করে! এই গান প্রকাশ্যে গাওয়া হয় না। তিব্বতী ছেলেমেয়েরা জানে যে একটু আড়ালে আবডালেই গাইতে হবে এই গান।

নতুন বছর উপলক্ষ্যে নানরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বারখোরে। এক কথায় বলতে গেলে বারখোর হচ্ছে ব্যবসা, সামাজিকতা আর উৎসবের মূল কেন্দ্র।

নতুন বছরের প্রথম মাসের পনেরো তারিখে প্রায় সুস্থ হয়ে উঠলাম আমি। পনেরো তারিখ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন। দালাই লামার অংশগ্রহণে বারখোরে চমৎকার একটা মিছিলের আয়োজন করা হয় এই দিন। সারঙ প্রতিশ্রুতি দিলেন, তাঁর বাসার জানালা দিয়ে অনুষ্ঠানটা দেখার সুযোগ পাব।

BanglaBook.org

আর কিছুক্ষণ পরই মিছিল শুরু হবে। দোতলায় না উঠে এখনও আমরা নিচতলায় আছি। রাস্তা দিয়ে এখন সম্ভ্রান্ত কিছু মানুষ হেঁটে যাচ্ছেন। নিয়ম হচ্ছে তাঁরা যতক্ষণ রাস্তায় থাকবেন ততক্ষণ কোনও মানুষ তাঁদের মাথার ওপরে থাকতে পারবে না। তাঁরা চলে গেলেই মিছিল দেখার জন্য দোতলায় উঠে পড়ব আমরা।

সম্ভবত লাসায় দোতলার চেয়ে বেশি উঁচু কোনও বাড়ি নেই। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও তিব্বতীরা ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত নয়। মনে করা হয় বাড়ি দোতলার চেয়ে বেশি উঁচু হলে সেটা হবে মন্দির বা পোটালা রাজপ্রাসাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা।

ধর্মীয় এই নিয়ম বেশ কঠোরভাবেই মেনে চলা হয়। অভিজাতশ্রেণীর মানুষরা যেনতেনভাবে কাঠ দিয়ে ছাপরা ঘর তৈরি করেন। গরমের সময় এগুলো বাড়ির ছাদে রাখা হয়। কিন্তু দালাই লামা বা প্রশাসক যখন মিছিলে অংশগ্রহণ করেন তখন জাদুর মতো মুহূর্তের মধ্যে ছাদ থেকে গায়েব হয়ে যায় ওগুলো।

মিসেস সারঙের সঙ্গে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা উজ্জ্বল রঙের জমকালো পোশাক পরে আছে।

মন্থর গতিতে নয়, সন্ধ্যা নামল ঝুপ করে। কিন্তু ঝাঁক ঝাঁক বাতি থাকায় এলাকাটা উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠল। এ-সময় বোধহয় পরিবেশটাকে আরও বেশি আলোকিত করার জন্যই, মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো চাঁদ।

সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে মঞ্চ। উৎসব শুরু হলো বলে। লোকজন সব শান্ত হয়ে অপেক্ষায় আছে।

ইতিমধ্যে মন্দির থেকে বেরিয়ে ধীর পায়ে এগোতে শুরু করেছেন দালাই লামা। তাঁর দু'পাশে দুজন মঠাধ্যক্ষ। সম্মান জানিয়ে সবাই মাথা নত করছে তাঁর উদ্দেশে।

অন্য সময় হলে দালাই লামার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ত তিব্বতীরা। কিন্তু জায়গার বড্ড অভাব। আজ সেরকম কিছু করার সুযোগ নেই।

দালাই লামা সামনে এলেই তারা নুয়ে পড়ছে। ঠিক যেমন গমের খেত নুয়ে পড়ে প্রচণ্ড বাতাসের তোড়ে। চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকাবার সাহস নেই কারও।

ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে মাপা পায়ে বারখোর প্রদক্ষিণ করছেন দালাই লামা। কিছুক্ষণ পর পর মাখনের তৈরি মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। অবাক বিস্ময়ে দেখছেন সেটা। মিছিলের ভিতর সারঙকে দেখতে পেলাম আমরা। আর সব অভিজাতশ্রেণীর মানুষের মতো তাঁর হাতেও জ্বলন্ত ধূপের একটা কাঠি আছে।

প্রচণ্ড ভিড় থাকলেও কারও মুখে টু-শব্দটি নেই। শুধু সন্ন্যাসীদের বাজানো বিভিন্ন যন্ত্রসঙ্গীতের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সব মিলিয়ে দৃশ্যটা যেন অপার্থিব। ল্যাম্পের হলুদ আলোয় মাখন দিয়ে বানানো মূর্তিগুলোকে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে আমাদের জানালার কাছে চলে এসেছেন দালাই লামা। মিসেস সারঙকে আড়ষ্ট হয়ে যেতে দেখে বুঝতে পারলাম দালাই লামাকে তিনি অন্তরের অন্তস্থল থেকে অভিবাদন জানাচ্ছেন। শ্বাস নিতেও যেন ভুলে গেছেন তিনি। তাড়াতাড়ি তাঁর পিছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়লাম আমরা। ভয় হচ্ছে মিছিলের এই জাদুকরী শক্তি আমাদেরকে না টেনে নিয়ে যায়।

BanglaBook.org

বারখোরে এক চক্কর ঘোরা শেষ হতেই সুগ লাগ খাঙ-এ চলে গেলেন দালাই লামা। সৈন্যরাও তাদের যন্ত্রসঙ্গীত বাজাতে বাজাতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর অদ্ভুত এক ঘটনার সাক্ষী হলাম আমরা। এই অনুষ্ঠান দেখতে হাজির হয়েছিল কয়েক হাজার মানুষ। এতক্ষণ তারা সবাই শান্ত হয়ে অনুষ্ঠান দেখছিল। কিন্তু দালাই লামা চলে যেতেই যেন যাদুমন্ত্রবলে ছড়িয়ে পড়ল বিশৃঙ্খলা। চিৎকার-চেঁচামেচিতে কান ঝালপালা হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগেও সবাই প্রার্থনায় মগ্ন ছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তারা সবাই পাগল হয়ে গেছে।

মন্দির থেকে আসা সন্ন্যাসী আর পুরোহিতদের প্রকাণ্ডদেহী প্রহরীরা এবার কাজ শুরু করল। তাদের দুই কাঁধে প্যাড গোঁজা। কাঠামো দেখে দৈত্য বললেও বেশি বলা হয় না। নিজেদেরকে আরও ভয়ংকর করে তোলার জন্য মুখটা কদাকার করে রেখেছে। চাবুক নিয়ে জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। কিন্তু তাতেও খুব একটা কাজ হচ্ছে না।

মাখন দিয়ে তৈরি মূর্তিগুলো ধরে উন্মাদের মতো টানাটানি করছে দর্শকরা। আর কিছুক্ষণ এরকম চললে ওগুলো উল্টে পড়ে যাবে। এমন কি যাদের হাতে মুগুর আছে তারাও যোগ দিল এই অসুস্থকর প্রতিযোগিতায়। দেখে মনে হচ্ছে হঠাৎ যেন তাদের ওপর শয়তান ভর করেছে। কে বলবে কিছুক্ষণ আগে এরাই একটা বাচ্চা হেলের সামনে নত হয়ে তাঁকে সম্মান জানাচ্ছিল।

পরদিন সকালে মাখনের তৈরি মূর্তির কোনও চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল না রাস্তার কোথাও। বিভিন্ন দোকানের মালিক ইতিমধ্যে ওগুলো গলিয়ে ফেলেছে। এই মাখন বা ঘি এখন ল্যাম্পের জ্বালানি হিসাবে কিংবা কোনও যাদুকরী ওষুধ বানাবার কাজে ব্যবহার করা হবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আট

রাজনৈতিক আশ্রয় অনুমোদন

প্রথম কাজ / পাঁচরকম মানুষ / অবশেষে অনুমতি

অনেকেই দেখা করতে আসছে আমাদের সঙ্গে। নতুন বছরের উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসেছে লাসায়। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আমাদের অভিযান সম্পর্কে কম বেশি জানে। কোথায় থাকি সেটা খুঁজে পেতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না ওদের। কারণ এখনও আমাদেরকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা চলছে লাসায়। এমন কি বাচ্চারাও আমাদের সম্পর্কে অনেক খবর রাখে। কেউ কেউ উপহার হিসেবে শুকনো মাংস নিয়ে আসছে। এই মাংস লাসায় খুব জনপ্রিয়।

লাসায় আসার পথে বিভিন্ন জেলা শহরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এ-সব জেলার বাসিন্দারা পরম বন্ধুর মতো আচরণ করেছিল আমাদের সঙ্গে। ওদের কাছ থেকে জানতে পারলাম আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে সরকারের পক্ষ থেকে অনেক ভোগান্তি সহ্য করতে হয়েছে ওদেরকে। শুনে মন খারাপ হয়ে গেল।

তবে ওদের হাবভাব দেখে মনে হলো না নির্যাতিত হওয়ায় আমাদের ওপর বিরক্ত হয়ে আছে।

একজন পনপোর সঙ্গে দেখা হলো। ভেবেছিলাম আমাদের ওপর রেগে আছেন তিনি। বাধ্য হয়ে পুরনো ট্র্যাভেল পারমিট দেখিয়ে ধোঁকা দিয়েছিলাম তাঁকে। তবে চোখাচোখি হতেই একগাল হেসে বুঝিয়ে দিলেন আমাদের ওপর তাঁর কোনও রাগ নেই।

মনে করেছিলাম নববর্ষের উৎসব ভালোভাবেই শেষ হবে। কিন্তু তা আর হলো না। একটা দুর্ঘটনা ঘটল বারখোরে।

প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানে তিব্বতীরা অনেক উঁচুতে পতাকা টাঙায়। যেটার ওপর পতাকা থাকে সেটা অনেকগুলো গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। এই গাছের গুঁড়ি আনা হয় অনেক দূর থেকে। ওগুলো যে পদ্ধতিতে লাসায় আনা হয় সেটা নিজ চোখে না দেখে

BanglaBook.org

অন্য কারও কাছ থেকে শুনলে আমরা বিশ্বাস করতাম না।

এও কি সম্ভব! একটা গুঁড়ি বিশজন লোক টেনে আনছে। গুঁড়িটা তাদের কোমরের সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধা। চিনারা কয়েক হাজার বছর আগে চাকা তৈরি করেছে, অথচ নিকট প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাছ থেকে প্রায় কিছুই শেখেনি তিব্বতীরা। শিখলে ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে কৃষিকাজ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে দারুণ উপকার পেত ওরা।

কাজটা করার সময় একঘেয়ে সুরে গান গাইছে শ্রমিকরা। গানের সঙ্গে সঙ্গে চলছে তাদের পা টেনে টেনে এগিয়ে চলা। এককথায় অমানুষিক পরিশ্রম। যারা কর দিতে অপারগ তাদেরকে দিয়ে এক রকম জোর করেই এই শ্রম আদায় করা হচ্ছে।

হাঁপরের মত হাঁপাচ্ছে শ্রমিকরা। কিন্তু শ্রমিক সরদার তাদেরকে এক মুহূর্তের জন্যও থামতে দিচ্ছে না। আর এই গান গাওয়ারও একটা কারণ আছে। প্রশ্ন করে জবাব পেলাম, গান গাইলে নাকি শ্রমিকরা কষ্ট ভুলে থাকতে পারবে। আমার কিন্তু মনে হলো গান না গাইলেই বরং নিজেদের শক্তি একটু কম খরচ হতো ওদের।

যাই হোক, গুঁড়িগুলো লাসায় আনার পর ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে জোড়া লাগিয়ে মাথায় একটা পতাকা বেঁধে দেওয়া হলো।

দুর্ঘটনা ঘটল একেবারে হঠাৎ। এই সত্তর ফুট উঁচু মাস্তুলের ভার সহ্য করতে পারল না ষাঁড়ের চামড়া। হঠাৎ করেই পুরো মাস্তুলটা ভেঙে পড়ল।

তিনজন দর্শক মারা পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। আর আহত হলো অনেক। পরে আশ্চর্য হয়ে উপলব্ধি করলাম, তিব্বতীরা ব্যাপারটা দেখছে একটা অশুভ সংকেত হিসাবে। সবার মুখে একই কথা–দেশে খুব খারাপ একটা সময় আসছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়–যেমন, ভূমিকম্প বা বন্যা হওয়ার আশঙ্কা করছে সবাই। এমন কি চিনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবে বলেও মনে করছে কেউ কেউ।

এ-সব তো সাধারণ মানুষের ভাবনা। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তিব্বতে যারা একটু ইংরেজি জানে তারাও এ-ধরনের কুসংস্কার থেকে মুক্ত নয়।

তিব্বতীরা যতই কুসংস্কারে বিশ্বাসী হোক, আহত মানুষগুলোকে তারা কিন্তু লামাদের কাছে নিয়ে গেল না। তড়িঘড়ি করে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো ওদের। সেখানকার হাসপাতালে তিব্বতীদের জন্য অনেক বেড আছে।

ওখানে যে ইংরেজ ডাক্তার আছেন তাঁর দম ফেলারও ফুরসৎ নেই। প্রতিদিন সকালে তাঁর বাড়ির সামনে রোগীদের বিশাল লাইন দেখা যায়। তাদের চিকিৎসা করার পর দুপুরের দিকে শহরে আসার সময় পান তিনি। তিব্বতে ডাক্তারের এই প্রভাব-প্রতিপত্তি নীরবে সহ্য করে যান সন্ন্যাসীরা। এছাড়া তাঁদের আর কি-ই বা করার আছে! যত যাই হোক, ডাক্তার যে রোগ সারাতে পারেন এটা তাঁরা অস্বীকার করবে কীভাবে!

ওষুধের ব্যাপারে সরকারের নীতিমালাকে আধুনিক তিব্বতের ইতিহাসে একটা

BanglaBook.org

কালো অধ্যায় বলা যায়। সাড়ে তিন মিলিয়ন মানুষের জন্য চাইনিজ আর ব্রিটিশ কূটনীতিকদের হাতে গোনা কয়েকজন ডাক্তারই ভরসা। তাঁরা তিব্বতে চিকিৎসা সেবা দিতে চাইলেও সরকার এখানে কোনও ডাক্তারকে প্র্যাকটিস করার সুযোগ দিতে রাজি নয়।

তিব্বতে সব ক্ষমতাই আসলে সন্ন্যাসীদের হাতে। কখনো কোনও ইংরেজ ডাক্তারকে ডাকা হলে সরকারী অফিসারদেরও সমালোচনা করতে ছাড়ে না সন্ন্যাসীরা।

একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে সরকারী একটা ডাক পেল আফশেনেইটর। আবার কী দুঃসংবাদ শুনতে হয়, এই ভয়ে আধমরা হয়ে আছি। কিন্তু আফশেনেইটর এসে যা বলল তাতে খুশিতে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। একটা কাজ দেওয়া হয়েছে তাকে। লিংখোরে একটা খাল কাটতে হবে।

কদিন পর কাজ শুরু করল আফশেনেইটর। সহকারী না থাকায় সাহায্য করার জন্য আমিও ওর সঙ্গে যাচ্ছি। ভাবতে পারিনি সেখানে এমন বিস্ময়কর একটা দৃশ্য দেখতে হবে।

প্রায় কয়েক হাজার সন্ন্যাসী কি একটা কাজে খুব ব্যস্ত আছেন। ওঁদের ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কাজটায় গোপনীয়তা খুব জরুরি। যাই হোক, ডানে-বামে না তাকিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি আমরা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাব।

কাজ এগোচ্ছে খুব দ্রুত। এক পক্ষকাল পরেই খোঁড়ার উপযোগী হলো খালটা। আমাদেরকে অবাক করে দিয়ে আফশেনেইটরকে ১৫০ জন শ্রমিক দেওয়া হলো। সে এখন এদের লিডার। নিজেদেরকে বড় ঠিকাদার বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তিব্বতে কাজ করার ধরন এখনও আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিখে নিতে হবে।

এ-সময় আমিও সারঙয়ের বাগানে কাজ পেয়ে গেলাম। সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য বাগানে নতুন কী করা যায় সে ব্যাপারে ভাবছি। হঠাৎ করে একটা বুদ্ধি এল মাথায়। একটা পানির ফোয়ারা বানালে মন্দ হয় না!

আমার পরিকল্পনা শুনে সারঙ একজন শ্রমিককেও কাজে লাগিয়ে দিলেন। নিজেও মাঝে-মধ্যে হাত লাগাচ্ছেন।

যাই হোক, অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে একটা ফোয়ারা বানালাম আমরা। ফোয়ারা থেকে যখন ঝরনার মতো পানি বেরিয়ে এলো, তখন শিশুর মতো আনন্দে নেচে উঠলাম। তিব্বতে এটাই প্রথম ফোয়ারা।

নতুন কাজ পেয়ে সবকিছু ভুলে গিয়েছিলাম। একদিন থাঙ্গমে একটা খবরের কাগজ আনলেন। সেখানে আমাদের সম্পর্কে একটা আর্টিকেল ছাপা হয়েছে। সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে কীভাবে আমরা লাসায় এসেছি সে-ব্যাপারে বিস্তারিত লেখা

BanglaBook.org

হয়েছে সেখানে। শুধু তাই নয়, নিরাপত্তার খাতিরে লাসায় থাকাটা যে আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি, সেটাও উল্লেখ করা হয়েছে। খবরটা পড়ে আশা করলাম এতে হয়তো তিব্বতীরা আমাদের ব্যাপারে কিছুটা নরম হবে। আমরা যে আবেদন করেছিলাম সেটার ওপরও এর প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে।

যাই হোক, নববর্ষের উৎসব কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। সবচেয়ে মজার অনুষ্ঠান–খেলাটাই তো এখনও বাকি।

বারখোরে সুগ লাগ খাঙ-এর সামনে অ্যাথলেটেরা সব জড় হচ্ছে। চাইনিজ রাষ্ট্রদূতের অফিস বিল্ডিঙের দোতলায় বসে খেলা দেখছি আমরা।

প্রথমেই শুরু হলো রেসলিং বোট। ওদের খেলার পদ্ধতিটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। তিব্বতীদের সবকিছুই ব্যতিক্রম। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে খেলার প্রতিযোগীদের কোনও তালিকা করা হয়নি। জয়ী হওয়ার জন্য প্রতিযোগীরা খুব একটা চেষ্টা করে না। আর করবেই বা কেন! বিজয়ীর জন্য বিশেষ কোনও পুরস্কারের ব্যবস্থা তো নেই। সবার জন্য একই পুরস্কার। খেলা শেষে একজন পনপো হাসিমুখে সবাইকে একটা করে চাদর দেন। মনে মনে ভাবলাম, সবাইকে যদি একই পুরস্কার দেওয়া হবে তাহলে সেটা আর প্রতিযোগিতা হয় কি করে!

এরপর শুরু হলো ভারোত্তোলন। ভারী পাথর তুলে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। তারপর আবার ফিরে আসতে হবে আগের জায়গায়। একই পাথর অনেক বছর ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই খেলায় খুব কম মানুষই সফল হয়।

হঠাৎ করেই দেখা গেল ঘোড়দৌড়ের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। কোনটার পর কোন খেলা শুরু হচ্ছে, কার সাধ্য সেটা বোঝে! খেলার শুরু এবং শেষে কোনও ঘোষণা দেওয়া হয় না।

প্রভাবশালী মানুষদের ক্ষমতা আর প্রভাব প্রতিপত্তি ভালোভাবেই প্রকাশ পায় এই উৎসবে। এ-সব প্রভাবশালী মানুষরা জানেন তাঁদেরকে এখন জনগণের সামনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। সাধারণ মানুষ আর তাঁরা একই পর্যায়ের, মানুষ সব সমান, এটা বোঝাবার জন্য উৎসবের শেষ দিনে চারজন মন্ত্রী তাঁদের মাথার দামি হেড-ড্রেস চাকরদের সঙ্গে অদল-বদল করেন।

এ-সব অনুষ্ঠানে বিদেশিদেরও অতিথির মর্যাদা দেওয়া হয়। বিশেষ তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয় সব বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের জন্য। তাঁদের দেখভালের জন্য চাকর এবং লিয়াজো কর্মকর্তারা সবসময় উপস্থিত থাকেন।

খেলার মাঠে অসংখ্য চাইনিজ প্রতিযোগী চোখে পড়ল। তিব্বতীদের সঙ্গে চেহারায় অনেক মিল থাকা সত্ত্বেও চাইনিজদের চিনতে কোন সমস্যা হচ্ছে না। শুধু যে চেহারায় মিল আছে তা নয়, এখানকার চাইনিজরা একই সম্প্রদায়ের। তারপরও চেহারায় সামান্য কিছু অমিল থাকায় সহজেই চাইনিজদেরকে চেনা যায়। তিব্বতীতের

BanglaBook.org

চোখ চাইনিজদের মতো অতটা সরু নয়। লাসার চাইনিজরা বেশিরভাগই ব্যবসায়ী।

চিনের সঙ্গে তিব্বতের ব্যবসায়িক সম্পর্কের উন্নয়নে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিব্বতে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে ওরা। এমন কি অনেকের স্থায়ী আবাসও আছে এখানে। এর মূল কারণ সম্ভবত আফিম।

তিব্বতে আফিম খাওয়া নিষিদ্ধ হলেও সেটা কঠোরভাবে মেনে চলা হয় না। মাঝে-মধ্যে চাইনিজদের পাল্লায় পড়ে তিব্বতীদের কেউ আফিম খেলে তাকে হালকা শাস্তি দেওয়া হয়। তিব্বতে আফিমের নেশা ছড়িয়ে পড়ার কোনও ভয় নেই। এদিকে কর্তৃপক্ষের সব সময় সতর্ক দৃষ্টি আছে। তিব্বতে ধূমপান করাকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়। তারপরও তিব্বতে যে কেউ সিগারেট কিনতে পারে। কিন্তু অফিস, রাস্তা কিংবা অনুষ্ঠানে ধূমপান পুরোপুরি নিষিদ্ধ। আগেই বলেছি নতুন বছর এলে সন্ন্যাসীদের হাতে সব ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। ক্ষমতা পাওয়ার পর সন্ন্যাসীরাও সিগারেট বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

লাসায় অসংখ্য নেপালি আছে। তারা সবসময় দামি পোশাক পরে। লাসার নেপালিরা বেশ মোটা-সোটা। তাদের আর্থিক অবস্থা যে আর সবার চেয়ে ভালো, সেটা সহজেই চোখে পড়ে। পুরনো একটা চুক্তি অনুযায়ী তাদেরকে খাজনা দিতে হয় না। এই সুযোগটা তারা পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছে। বারখোরের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসাটা তাদের দখলে। তিব্বতে তাদের মতো দক্ষ ডিলার একটাও নেই। দর কষাকষির ব্যাপারে নেপালিরা অদ্বিতীয়। নিজেদের পরিবার নেপালে থাকলেও, তারা বেশিরভাগ সময় তিব্বতেই থাকে। মাঝে-মধ্যে নেপালে ঘুরতে যায়। চাইনিজদের সঙ্গে নেপালিদের এখানেই পার্থক্য। চিনারা তিব্বতী মেয়েদেরকে বিয়ে করার ব্যাপারে খুব আগ্রহী। বিয়ে করার পর তারা স্ত্রীদের কাছে আদর্শ স্বামীতে পরিণত হয়।

যে-কোনও সরকারী অনুষ্ঠানে সবার দৃষ্টি কেড়ে নেয় নেপালের উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিরা। এ-সময় তিব্বতীরা অত্যন্ত দামি পোশাক পরলেও নেপালিদের তুলনায় সেগুলো ফিকে হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, তাদের বডিগার্ড গুর্খা বাহিনী লাল রঙের যে জ্যাকেট পরে সেটা অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে। এই গুর্খা বাহিনীকে লাসায় খুব সম্মান করা হয়।

লাসায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ। কিন্তু গুর্খারা ঝুঁকি নিয়ে এই কাজটা করে। সরকার আইন ভাঙার খবর পেলে নেপালি রাষ্ট্রদূতের কাছে প্রতিবাদ জানায়। এ-সময় হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নেপালি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তিব্বতী সরকারের সম্পর্ক খুব ভালো হলেও, অপরাধীকে কোনওভাবেই শাস্তি থেকে রেহাই দেওয়া হয় না। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, সৈনিক ছাড়াও তিব্বতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষও এর সঙ্গে জড়িত থাকে। এক প্লেট মাছ পেলে তিব্বতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা যেন বর্তে যান। শাস্তি হিসাবে বেচারা সৈনিকদের চাবুক মারা হয়। তবে এ-সময় জননেন্দ্রিয়-তে আঘাত করা

BanglaBook.org

হয় না।

লাসায় তিব্বতীদের জন্য মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পুরো তিব্বতে শুধু স্যাঙপো নদীতে মাছ ধরা বৈধ। নদীটা একটা মরুভূমির ওপর দিয়ে চলে গেছে। এই এলাকায় কোনও ফসল হয় না। গবাদিপশুর চরে খাওয়ার জন্য কোনও চারণভূমিও নেই। তাই আইন শিথিল করা হয়েছে এখানে। তবে আশ্চর্য হতে হলো যখন জানতে পারলাম, এই এলাকার মানুষকে কসাই আর কামার-কুমোর হিসাবে গণ্য করা হয়।

লাসায় অনেক মুসলমান আছে। নিজেদের একটা মসজিদও আছে তাদের। লাসার মুসলমানরা স্বাধীনভাবে ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন করতে পারে। বেশিরভাগ মুসলামান ইন্ডিয়া থেকে তিব্বতে এসে এখানকার মানুষের সঙ্গে মিশে গেছে। তিব্বতী মেয়েকে বিয়ে করার পর ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী মুসলমানরা আশা করে তাদের বউ ধর্ম পরিবর্তন করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তিব্বতী সরকার অত্যন্ত কঠোর। আইন অনুযায়ী নিজেদের ধর্ম ত্যাগ না করার শর্তে একজন মুসলমানকে বিয়ে করতে পারে একজন তিব্বতী মেয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নয়

লাসায় তিব্বতীদের জীবনযাত্রা-১

মহীয়সী মায়ের ছোট ছেলের সঙ্গে পরিচয় / দালাই লামার নরবুলিংকা মিছিল / তিব্বতীদের ধর্মকর্ম / খরা এবং গ্যাডঙের পুরোহিত / তিব্বতীদের জীবনযাত্রা / ডাক্তার, নিরাময়কারী এবং ভবিষ্যৎবক্তা

দালাই লামার মা-বাবার বাসায় দাওয়াত খেতে গিয়ে আমার আগের সব অভিজ্ঞতা ম্লান হয়ে গেল। ভাবতেই পারিনি এরকম একটা আনুষ্ঠানিক পার্টিতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

তিনদিন আগে দালাই লামার আরও এক ভাই জন্ম নেওয়ায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মোট তিরিশজন সম্মানিত লোক এসেছেন। এদের সামনে খুব অস্বস্তিবোধ করছি আমি।

ইতস্তত একটা ভাব নিয়ে মহীয়সী মায়ের সামনে গেলাম। নিজের অজান্তেই তোতলাতে শুরু করেছি। কোনওরকমে একটা ধার করা সাদা চাদর দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালাম। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি।

একটা ব্যাপার খেয়াল করে খুব আশ্চর্য হলাম। মহীয়সী মা একেবারে স্বাভাবিকভাবে পুরো বাড়ি হেঁটে বেড়াচ্ছেন আর অতিথিদের সময় দিচ্ছেন। তিব্বতী মেয়েদের কাছে সন্তান জন্মদান কোনও ব্যাপারই না। সন্তান জন্মদানের পর অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ওরা স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসে। ডাক্তার ডাকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এখানে মেয়েরাই মেয়েদেরকে সাহায্য করে। একগাদা নাদুসনুদুস ছেলেমেয়ে নিয়ে তিব্বতী মায়েদের গর্বের কোনও শেষ নেই।

ধনী পরিবারে কোনও শিশু জন্ম নিলে তাকে চব্বিশ ঘণ্টা বিশেষ নার্স-মেইডের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। মা-বাবা লামাদের সঙ্গে আলোচনা করে তবেই শিশুর নাম ঠিক করেন। শিশুর নাম দেওয়ার ক্ষেত্রে জোতির্বিদ্যা প্রয়োগ করা হয়। বাচ্চা ভয়ানক কোনও অসুখে পড়লে আগের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় নতুন নাম।

BanglaBook.org

যাই হোক, অনুষ্ঠানে ফিরে আসি। দেখে-শুনে একটা ছোট টেবিলে বসেছি। দু'ঘন্টা ধরে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। একের পর এক কোর্স আসছে বিরতিহীন। চোদ্দোটা গোনার পর আর ধৈর্য হলো না আমার। এই ধরনের অনুষ্ঠানে খেতে হলে বিশেষ ট্রেনিং দরকার। কি কি দেওয়া হয়েছে সেটার বিবরণ দিয়ে পাঠকের জিভে পানি আনতে চাই না। শুধু এটুকু না বললেই নয় যে সব ধরনের ইন্ডিয়ান ডিশ পরিবেশন করা হয়েছে। শেষ করা হলো নুডুলসের সুপ দিয়ে।

ভূরিভোজের কিছুক্ষণ পর পার্টি শেষ হলো। অতিথিদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাইরে ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে চাকররা।

আমি আর আফশেনেইটর দাওয়াত পেয়ে প্রায়ই মহীয়সী মায়ের বাসায় আসি। এভাবেই দালাই লামার ভাই লবস্যাঙ স্যামটেনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। দালাই লামার ভাই হিসাবে তার অনেক ওপরে ওঠার সুযোগ আছে।

একদিন সরকার আর দালাই লামার মধ্যস্থকারী হিসাবে একটা কাজ দেওয়া হলো তাকে। কিন্তু সে দালাই লামার ভাই–এই পরিচয়টাই বিশাল একটা বোঝা মনে হলো তার কাছে । সবাই তাকে দালাই লামার ভাই হিসাবে চিনছে। তার যেন নিজস্ব কোনও পরিচয় নেই। যেখানেই যাক বা যাই করুক, সবকিছুতেই দালাই লামার তকমা লেগে আছে গায়ে। একবার খুব জরুরি একটা সরকারী কাজে ডাকা হলো তাকে। অফিসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সবাই, এমন কি মন্ত্রীরাও উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালেন তাকে। এরকম অপ্রত্যাশিত সম্মান যে-কোনও মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু লবস্যাঙ স্যামটেন অন্য ধাতুতে গড়া। সে তার আচরণে বিনয়ী ভাব এখনও ধরে রেখেছে।

লবস্যাঙ প্রায়ই তার ছোট ভাই দালাই লামা সম্পর্কে আমার সঙ্গে গল্প করে। দালাই লামা পোটালার রাজপ্রাসাদে একা থাকেন। অনেকদিন ধরে মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। অনুষ্ঠানে যেসব অতিথি আসেন, দালাই লামাকে তাঁর ফ্ল্যাটের ছাদে দেখলেই লুকিয়ে পড়েন তাঁরা। স্যামটনের কাছে এর কারণ জানতে চাইলাম। সে বলল দালাই লামার কাছে বেশ কয়েকটা শক্তিশালী টেলিস্কোপ আর ফিল্ড গ্লাস আছে। ওগুলো দিয়ে শহরের মানুষের জীবনযাত্রা দেখতে ভালোবাসেন তিনি। তাঁর কাছে পোটালা সোনার কারাগার। সারাদিন পড়াশোনা আর প্রার্থনা করেই সময় কাটে তাঁর। অবসর না থাকায় আনন্দ করার সময় খুব একটা পান না।

দালাই লামার একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু লবস্যাঙ স্যামটন। বাইরের বিশ্বে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার সবই লবস্যাঙের কাছ থেকে জানতে পারেন তিনি। লবস্যাঙ জানাল, আমাদের ব্যাপারে দালাই লামার কৌতূহলের কোনও শেষ নেই। আমি যখন সারঙের বাগানে কাজ করি তখন টেলিস্কোপ দিয়ে আমাকে দেখেন তিনি।

ইতিমধ্যে ধূলিঝড়ের মৌসুম শেষ হয়ে গেছে। একদিন গ্রীষ্মকাল শুরু হবার

BanglaBook.org

সরকারী ঘোষণা দেওয়া হলো। তিব্বতীরা একেক ঋতুতে একেক ধরনের পোশাক পরে। কিন্তু হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে নির্দিষ্ট পোশাক পরতে হয়। আবহাওয়া যাই হোক না কেন, ঘোষণা দিলেই সবাইকে পোশাক বদলাতে হবে। এই ব্যাপারটা নিয়ে তিব্বতীদের অভিযোগের কোনও শেষ নেই। কারণ শুভ-অশুভ দেখতে হয় বলে দিন-ক্ষণ ঠিক থাকে না। হয়তো মোটামুটি শীত আছে, এমন সময় গ্রীষ্মের ঘোষণা দেওয়া হলো, কিংবা শীত আসতে বেশ দেরি এমন সময় দেওয়া হলো শীতের ঘোষণা। যার ফলে তিব্বতীদের হয়তো শীতের সময় প্রায় খালি গায়ে থাকতে হয়, আবার হয়তো গরমের দিনে গরম কাপড় পরে ঘামতে হয়।

এই পোশাক পরাকে উপলক্ষ করে আবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠান চলে কয়েক ঘন্টা ধরে।

ঋতু বদল ছাড়া তিব্বতীরা আরেকটা কারণে পোশাক পরিবর্তন করে। দালাই লামাকে যখন অফিসের সব কর্মকর্তা মিছিল করে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ কেন্দ্রে নিয়ে আসে তখন সবাইকে পোশাক পরিবর্তন করতে হয়।

ধর্মকে তিব্বতের অলঙ্কার বলা যায়। তীর্থযাত্রীরা অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে বছরে একবার তিব্বতে আসে। তিব্বতীদের জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করে ধর্মীয় বিশ্বাস। সবসময় তারা ধর্মীয় কথা আউড়ে যাচ্ছে। বাড়ির ছাদ, পাহাড়ের চূড়া সহ এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে প্রার্থনা পতাকা উড়ছে না। ওদের ধারণা বৃষ্টি, বাতাস, তুষারাবৃত পাহাড়ের নিঃসঙ্গ চূড়া থেকে শুরু করে প্রকৃতির সবকিছুই সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি প্রমাণ করে। যখন কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসে তখন ধরে নিতে হবে সৃষ্টিকর্তা রেগে গেছেন, আর জমির উর্বরতা বাড়লে বা ফলন ভালো হলে বুঝে নিতে হবে তিনি খুব খুশি। এখানকার মানুষের জীবন ঐশ্বরিক চিন্তা-চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেগুলোর আবার ব্যাখ্যাও দেয় লামারা।

কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেটা শুভ কি অশুভ হবে তা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করে তিব্বতীরা। সৃষ্টিকর্তাকে বিরতিহীন অনুরোধ ও ধন্যবাদ জানানো হয়। ধনী ব্যক্তিদের বাসা থেকে আরম্ভ করে যাদের স্থায়ী আবাস নেই তাদের তাঁবুতেও সবসময় প্রার্থনা প্রদীপ জ্বালানো থাকে।

পৃথিবীতে নিজেদের অস্তিত্বকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না তিব্বতীরা। তাদের কাছে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনটাই আসল। এই কারণে ওদের মৃত্যুভয় নেই। তিব্বতীদের ধারণা একবার মরলেই সব শেষ হয়ে যায় না। পুনর্জন্মে পুরোপুরি বিশ্বাস করে ওরা আর আশা করে বর্তমানের চেয়ে ভালো অবস্থায় আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে। এখানে কোনও ব্যাপারে অভিযোগের জন্য মন্দিরই আদর্শ জায়গা। লোকজন সাধারণ একজন সন্ন্যাসীকেও খুব সম্মান করে চলে। মন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য প্রতি পরিবারের অন্তত একজন ছেলেকে আশ্রমে দেওয়া হয়।

BanglaBook.org

বেশ কয়েক বছর হলো তিব্বতে আছি। কিন্তু এখনও এমন কাউকে খুঁজে পেলাম না যার মনে গৌতম বুদ্ধর শিক্ষা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে। এটা সত্যি যে এখানে ভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের মানুষও আছে, তবে পার্থক্যটা শুধু বাইরের, ভিতরে সবাই এক। মানুষের মনে ধর্মীয় শক্তির যে অনুভূতি সেটা বন্ধ করার ক্ষমতা কারও নেই।

এখানে একটা কথা না বললেই নয়। জীবন্ত পোকা-মাকড়ের প্রতি তিব্বতীদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা দেখে সত্যি অবাক হতে হয়। তিব্বতীরা কখনো জেনেশুনে কোনও পোকা মারে না। বিরক্ত হচ্ছি, তারপরও এখন পর্যন্ত কোনও তিব্বতীর সামনে একটা পোকাও মারতে পারিনি।

এই ব্যাপারে তিব্বতীদের মনোভাব সত্যি খুব বিস্ময়কর। যদি পিকনিকে কোনও পিঁপড়ে কাউকে বিরক্ত করে তখন সেটাকে যত্ন করে তুলে অন্য কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসা হয়। চায়ের কাপে পোকা পড়ে গেলে তো কথাই নেই। একেবারে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দেয় তিব্বতীরা। পোকাটা যাতে চায়ে ডুবে না যায় সে জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করে ওরা। দেখলে মনে হয় পোকাটার মাধ্যমে যেন কারও মৃত দাদীর পুনর্জন্ম হয়েছে।

ঠাণ্ডায় যাতে মাছ মারা না যায় সেজন্য শীতকালে পুকুরের পানিতে জমে যাওয়া বরফগুলো ভেঙে ফেলা হয়। আর গ্রীষ্মকালে পুকুরের পানি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই মাছগুলো রাখা হয় পানিভর্তি বালতি বা টিনে। তিব্বতীরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে জীব হত্যা মহাপাপ। এভাবে পোকা বা মাছের জীবন বাঁচানোর ফলে তারা নিজেদের আত্মার শুদ্ধি লাভ করে। যে যত বেশি প্রাণ বাঁচাতে পারে সে তত বেশি খুশি হয়।

একবার আমার বন্ধুর সঙ্গে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে খেতে গেছি। সেদিনের অভিজ্ঞতার কথা আমি কোনওদিন ভুলব না। রেস্টুরেন্টে ঢুকে দেখি একটা হাঁস দৌড়াদৌড়ি করছে, দেখে মনে হচ্ছে ওটা যেন রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে। ওয়াংডুলা তাড়াতাড়ি বেশ কিছু টাকা রেস্টুরেন্ট মালিককে দিয়ে হাঁসটা কিনে নিলেন। এই ঘটনার কয়েক বছর পর একদিন ওয়াংডুলার বাসায় গিয়ে দেখি ভাগ্যবান হাঁসটা হেলেদুলে পুরো বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জীবন্ত পোকা-মাকড়ের প্রতি এই মনোভাব নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য সরকারী আইনে পরিণত হয়েছিল। দালাই লামা যখন তিন বছর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন এটা সেই সময়কার ঘটনা। ভবন নির্মাণের সময় সহজেই পোকা-মাকড় মারা পড়ে। আর এই কারণে ভবন নির্মাণের সাধারণ কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বাঁধ তৈরি করার সময় আমি নিজের চোখে দেখেছি শ্রমিকরা কী রকম সর্তকতার সঙ্গে কোদাল দিয়ে মাটি তুলছে। জীবন্ত কোনও পোকা-মাকড় দেখলেই সেটা আস্তে করে তুলে অন্য জায়গায় ছেড়ে দিচ্ছে তারা।

তিব্বতে অপরাধীদের বড় কোনও শাস্তি দেওয়া হয় না। খুন করাই এখানে সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ। খুনিকে প্রথমে লাঠি বা চাবুক দিয়ে মারা হয়। তারপর

BanglaBook.org

লোহার বেড়ি পরানো হয় গোড়ালিতে।

পশ্চিমা দেশগুলোতে খুনিকে সরাসরি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও সে তুলনায় চাবুক বা লাঠি দিয়ে মারা আমার কাছে বেশি অমানবিক বলে মনে হয়। শাস্তি ঘোষণা হওয়ার পর খুনি অনেক সময় অসহ্য ব্যথায় মারা গেলেও এই ধর্মীয় বিচার-ব্যবস্থার কোনও রদ-বদল করা হয় না। খুনিকে হয় সারাজীবন লোহার বেড়ি পরে থাকতে হয়, নয়তো তাকে রাষ্ট্রীয় কারাগারে আটকে রাখা হয়। কিছু অপরাধীকে পাঠানো হয় জেলা সরকারের কাছে। যারা খুব ভাগ্যবান তারাই জেলা সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকার সুযোগ পায়। কারাগারে থাকা আসামীরা শুধু বুদ্ধদেবের জন্ম আর মৃত্যুবার্ষিকীতে বাইরে বের হবার অনুমতি পায়।

চুরি সহ বিভিন্ন ধরনের ছোট-খাট অপরাধের জন্য মানুষ নিজেই আইন হাতে তুলে নেয়। এই ক্ষেত্রে অপরাধীকে লাঠি বা চাবুক দিয়ে মারা হয়। অপরাধীর গলায় ঝোলানো একটা বোর্ডে লেখা থাকে তার কুকর্মের কথা। শুধু তাই নয়, অপরাধীকে দিন কয়েক এক ধরনের কাঠের কাঠামোর ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। মাঝে-মধ্যে তাকে খাবার আর পানি দিয়ে যায় দয়ালু লোকজন।

তবে কেউ ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়লে তার আর রক্ষে নেই! শাস্তি হিসাবে হাত বা পা কেটে নেওয়া হয় তার। কিন্তু তারপরও তাদের শিক্ষা হয় না। কিছুদিন পরই আবার আগের পেশায় ফিরে যায় তারা।

তিব্বতে কোনও সুগঠিত বিচার ব্যবস্থা নেই। অপরাধ তদন্তের ভার দেওয়া হয় অভিজাত পরিবারের উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন কোনও মানুষকে। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রেও দুর্নীতি বিশাল আকার ধারণ করেছে। বিচারক হিসাবে খুব কম মানুষই সৎ হিসাবে মর্যাদা পায়।

যদি কোনও অপরাধী মনে করে তার ওপর অবিচার করা হয়েছে তাহলে সে দালাই লামার কাছে আপিল করতে পারে। নির্দোষ প্রমাণিত হলে ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে, তবে দোষী হলে শাস্তি বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়।

দালাই লামা তাঁর গ্রীষ্মকালীন অবকাশ কেন্দ্রে যাওয়ার পর আবহাওয়া গরম হয়ে উঠল। তবে সেটাকে কোনওভাবেই অসহ্য বলা যাবে না। এই মৌসুমে দিনের তাপমাত্রা কখনোই ৮৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের ওপর ওঠে না। দিনে গরম হলেও রাতে আবহাওয়া ঠাণ্ডাই থাকে। এইসময় বৃষ্টি একেবারে হয় না বললেই চলে। তাই সবাই প্রার্থনা করতে থাকে বৃষ্টির জন্য। লাসায় বিভিন্ন ধরনের ঝরনা আছে। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ে এই ঝরনা থেকে কোনও পানি পাওয়া যায় না। শুষ্ক মৌসুমে তিব্বতীরা কইচু নদী থেকে প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করে।

ঝরনা থেকে পানি পড়া বন্ধ হয়ে গেলে বার্লির খেতগুলো একেবারে শুকিয়ে যায়। এইসময় সরকার ডিক্রি জারি করে–পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত রাস্তায় পানি ছিটাতে হবে সবাইকে। শহরের সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে এই কাজে। পড়িমরি করে

BanglaBook.org

বালতি, জগ নিয়ে নদী থেকে পানি এনে শহরের রাস্তায় ঢালতে থাকে। ধনী মানুষরা তাদের চাকরকে দিয়ে পানি আনায়। তবে পানি আনতে যা দেরি, পাড়া-প্রতিবেশীদের ওপর পানি ছুঁড়ে মারার জন্য চাকরদের সঙ্গে তারাও রাস্তায় নেমে পড়ে।

তিব্বতে নিয়মিত পানি উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উৎসবে কার কি পদমর্যাদা সেটা থোড়াই কেয়ার করে ওরা। সুযোগ পেলেই যে-কোনও মানুষকে পানিতে ভিজিয়ে জবজবে করে দেওয়া হয়। বাড়ির জানালা আর ছাদ থেকে রাস্তায় হাঁটতে থাকা নিরীহ পথিকদের ওপরও পানি মারা হয়।

রাস্তায় যখন পানিযুদ্ধ চলছে, তখন সবচেয়ে জনপ্রিয় বৃষ্টি-প্রস্তুতকারক গেডঙের সন্ন্যাসীকে দালাই লামার বাগানে তলব করা হয়। সরকারের প্রভাবশালী কর্মকর্তারা এইসময় উপস্থিত থাকেন। পুরো অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গ্র্যান্ড লামা।

অনুষ্ঠান শুরুর কিছুক্ষণ পরই সন্ন্যাসী মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এইসময় তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভীষণ ঝাঁকি খেতে থাকে, আর মুখ দিয়ে অনবরত বের হয় অর্থহীন গোঙানির শব্দ। এরপর যাতে ভালো ফসল পাওয়া যায় সেজন্য সন্ন্যাসীদের একজন গম্ভীরভাবে প্রধান সন্ন্যাসীর কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা করেন। এ-সময় প্রধান সন্ন্যাসী উন্মাদের মতো আচরণ করতে থাকেন।

এই অনুষ্ঠানের পর লাসার সবাই বৃষ্টির জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করে। কেউ যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা খুঁজুক, কিংবা অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস করুক, বাস্তবতা হচ্ছে এই অনুষ্ঠানের পর সত্যি সত্যি বৃষ্টি নামে।

প্রধান সন্ন্যাসীকে সৃষ্টিকর্তার একজন মাধ্যম হিসাবে ধরা হয়। তিব্বতীরা বিশ্বাস করে প্রধান সন্ন্যাসী যখন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন তখন রক্ষাকারী দেবতা তাঁর শরীরের ভিতর প্রবেশ করেন। যার ফলে তিনি জনগণের প্রার্থনা শুনতে পান এবং সেটা মঞ্জুর করেন।

এখনও বিভিন্ন বাসা থেকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে আমাদের। ফলে লাসার মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাচ্ছি। জনপ্রশাসন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, নৈতিকতা আর তাদের আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারছি। প্রতিদিনই নতুন কিছু না কিছু ঘটছে। সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে লাসায় আমাদেরকে আর বহিরাগত হিসাবে দেখা হচ্ছে না। আমরা এখন লাসার মানুষ।

ইতিমধ্যে গোসল করার মৌসুম এসে পড়েছে। বৃদ্ধ, তরুণ, ছোট, বড় সবাই বাগানের পাশে নদীতে সাঁতার কাটছে। কেউ কেউ আবার অগভীর পানিতে হাঁটাহাঁটি করে পা ভেজানোয় ব্যস্ত। অনেকে তাঁবু খাটিয়ে পিকনিকের আয়োজনও করেছে।

একটা ব্যাপার খেয়াল করে বেশ অবাকই হচ্ছি আমরা। লাসার যেসব মেয়ে ইন্ডিয়ায় পড়াশোনা করে তিব্বতে ফিরে এসেছে তারা গোসল করার আধুনিক পোশাক পরে আছে। এই পোশাক নিয়ে তাদের গর্বের কোনও শেষ নেই।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর জুয়ার আসর বসল। সবশেষে একটা সুন্দর দিন উপহার দেওয়ার জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সন্ধ্যেবেলা নদীর পাশে ধূপ জ্বালানো হলো।

সাঁতারু হিসাবে আমি খুব দক্ষ হওয়ায় ওদের কাছ থেকে বাড়তি শ্রদ্ধা পাচ্ছি। পানি খুব ঠাণ্ডা, তাই তিব্বতীরা ভালোভাবে সাঁতার শিখতে পারে না। এখানে সাঁতার কাটা মানে পানির ওপর শুধু নিজেকে ভাসিয়ে রাখা। একজন দক্ষ সাঁতারুকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে ওরা। চারদিক থেকে আমাকে ডাকা হচ্ছে। সবাই আমার সাঁতার দেখতে চায়।

কিন্তু ঠাণ্ডা পানিতে সাঁতার কাটলেই আমার সায়াটিকার ব্যথা শুরু হয়ে যাচ্ছে। এখানকার পানির তাপমাত্রা কখনওই পঞ্চাশ ডিগ্রি ফারেনহাইটের ওপরে ওঠে না। বন্ধুদের খুশি করার জন্য মাঝে-মধ্যে পানিতে ডাইভ দিচ্ছি, তবে সবসময় সেটা করা সম্ভব না।

একদিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্কহ্যাঙ-এর অতিথি হবার সুযোগ পেলাম। নদীর পাশেই তাঁবু খাটিয়েছেন। সার্কহ্যাঙের একমাত্র ছেলে জিগমিও আমাদের সঙ্গে আছে। ভারতের একটা স্কুলে পড়াশোনা করছে সে। স্কুল ছুটি থাকায় পিকনিকে আসার সুযোগ পেয়েছে। জিগমি শব্দটার অর্থ 'ভয়হীন'। কীভাবে সাঁতার কাটতে হয় সেটা স্কুল থেকেই কমবেশি শিখেছে সে। এখানে সাঁতার কাটতে গিয়ে মরতে বসেছিল জাগমি। কোনওমতে তাকে বাঁচিয়ে তুললাম আমি।

এই ঘটনার পর সার্কহ্যাঙ পরিবারের ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম। বলা যায় তাদের পরিবারেরই একজন। সার্কহ্যাঙ অকপটে তাঁর বৈবাহিক জীবনের গল্প শোনালেন। তিব্বতের উঁচু শ্রেণীর মানুষদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানতে হলে তাঁদের খুব ঘনিষ্ঠ হতে হয়। সেদিক দিয়ে নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে।

প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে সার্কহ্যাঙের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এরপরের ঘটনা এতই জটিল যে সেটা এখানে উল্লেখ না করাই ভালো।

তিব্বতে যে কেউ একাধিক বিয়ে করতে পারে। এক্ষেত্রে স্ত্রীদের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক সেটা মুসলিম হারেমে প্রচলিত নিয়মের সঙ্গে একদমই মেলে না। তিব্বতে একই পরিবারের কয়েকজন মেয়েকে বিয়ে করার প্রচলন আছে। তবে এক্ষেত্রে সেই পরিবারে কোনও ছেলে বা উত্তরসূরী থাকলে চলবে না। এই ব্যবস্থার ফলে সেই পরিবারের সম্পত্তি বেহাত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। আমাদের মেজবান সারঙ বিয়ে করেছেন একই পরিবারের তিন বোনকে। তারপর দালাই লামার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সেই পরিবারের পদবি নিজের নামের আগে জুড়ে দিয়েছেন।

তিব্বতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমন উদ্ভট হওয়া সত্ত্বেও সেখানে বিবাহবিচ্ছেদ আমাদের দেশের তুলনায় কম। তিব্বতীরা ভাগ্যের বেগে গা ভাসিয়ে দেয় না। একই পরিবারের কয়েকজন ভাই একজন মেয়েকে নিয়ে সংসার করে।

BanglaBook.org

এক্ষেত্রে যে বড় সেই মেয়েটিকে ভোগ করার সুযোগ পায়। বড় ভাই যখন থাকে না বা অন্য কোথাও মজা করতে যায়, শুধু তখন অন্য ভাইরা কড়ায়-গণ্ডায় তাদের অধিকার বুঝে নেয়। তিব্বতে পুরুষরা মেয়েদের সাহচর্য থেকে নিজেদের দূরে রাখে না। কারণ এখানে মেয়ের কোনও অভাব নেই। অনেক পুরুষ আবার চিরকুমার থেকে আশ্রমে জীবন যাপন করেন। তিব্বতের প্রত্যেকটা গ্রামেই আশ্রম আছে।

জারজ শিশুদের কোনও সম্পত্তি দেওয়া হয় না। সব সম্পত্তি পায় বৈধভাবে জন্ম নেওয়া শিশু। তাই কোনও শিশু জন্ম নিলে সে কোন ভাইয়ের সেটা মোটেও গুরুত্ব বহন করে না। সব সম্পদ পরিবারের মধ্যে থাকাই হচ্ছে মূল ব্যাপার।

অতিরিক্ত জনসংখ্যা একটা দেশের কী ক্ষতি করতে পারে সে ব্যাপারে তিব্বতীরা কিছুই জানে না। যুগ যুগ ধরে দেশের জনসংখ্যা একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। এর কারণ শিশু মৃত্যু, বহুপতি আর সন্ন্যাস-জীবন।

হিসাব করে দেখেছি গড়ে মাত্র ত্রিশ বছর বাঁচার আশা করে তিব্বতীরা। এখানে শিশু মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি। সরকারী অফিসারদের মধ্যে মাত্র একজনই সত্তর বছর পার করতে পেরেছেন।

তিব্বত সম্পর্কে অনেক বই পড়া থাকায় আমি জানি এখানকার মেজবানদের একটা বাজে অভ্যাস আছে। তারা তাদের স্ত্রী কিংবা মেয়েকে অতিথিদের কাছে পাঠায়। সারঙ যদি আমাকে এই ধরনের কিছু পাঠাত, তবে সেটা হতো আমার জন্য দুর্ভাগ্যজনক।

তিব্বতে মাঝে মধ্যে সুন্দরী চাকরানিরাও হালকাভাবে হলেও প্রেমের প্রস্তাব দেয়। তবে বিয়ের আগে তাদের কাছ থেকে বাড়তি কোনও সুযোগ-সুবিধা আদায় করা যায় না। অবশ্য নিজেকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত এমন মেয়ের দেখা পাওয়া যায় পৃথিবীর সব জায়গাতে। এমন কি লাসাতেও এমন অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে যারা শুধু পেশাদারি মনোভাব নিয়ে ভালোবাসে।

আগে তিব্বতে মা-বাবাই ছেলেমেয়ের বিয়ে ঠিক করত। তবে যুগের হাওয়া এখন তিব্বতেও লেগেছে। ছেলেমেয়েরা পছন্দমতো নিজেদের জীবনসঙ্গী খুঁজে নিচ্ছে।

খুব কম বয়সেই বিয়ে করে ফেলে তিব্বতীরা। মেয়েদের ক্ষেত্রে ষোল বছর আর ছেলেরা বিয়ে করে সতেরো কিংবা আঠারো বছর বয়সে। অভিজাতশ্রেণীর ছেলেমেয়েরা তাদের সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করে জীবনসঙ্গী বাছাই করে। তিব্বতে কঠোরভাবে মেনে চলা হয় এই নিয়ম।

আন্তর্জনন যাতে না ঘটে সেজন্য সাত প্রজন্ম পার হওয়ার আগে আত্মীয়-স্বজনের কাউকে বিয়ে করা যায় না। একমাত্র দালাই লামা এই নিয়মের বাইরে।

আগেই বলেছি তিব্বতে ডিভোর্স হয় না বললেই চলে। ডিভোর্স হলে সেটা অবশ্যই সরকার অনুমোদিত হতে হবে। অবৈধ সম্পর্কের শাস্তি হিসাবে এখানে

BanglaBook.org

অপরাধীর নাক কেটে দেওয়া হয়। তবে অদ্ভুত ব্যাপার, আজ পর্যন্ত কাউকে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। একবার অবশ্য নাক কাটা একজন মহিলার দেখা পেয়েছিলাম। তার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ ছিল–তবে ওই নাক কাটার কারণ সিফিলিসও হতে পারে।

এখানে যৌনব্যাধি খুব সাধারণ একটা ব্যাপার। লাসায় যৌনব্যাধি আছে এরকম রোগী গুণে শেষ করা যাবে না। কিন্তু তারা এই অসুখকে একেবারেই আমলে নেয় না।

রোগীর অবস্থা বিপজ্জনক হওয়ার পর ডাক্তার ডাকা হয়। কিন্তু অনেক দেরি করায় তখন ডাক্তারের আর কিছু করার থাকে না। প্রতিষেধক বানাবার প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে পারদ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ বানান সন্ন্যাসীরা। যেসব বিদ্যালয়ে ওষুধ নিয়ে পড়ানো হয়, সেখান থেকে এই ধারণা পেয়েছেন সন্ন্যাসীরা। এছাড়া আর কোনও ওষুধের কথা তাঁদের জানা নেই।

তিব্বতের স্যানিটারি আর মেডিকেল ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কী করা যায় সেটা রীতিমতো গবেষণার বিষয়। সার্জারি জিনিসটা কী সে ব্যাপারে তিব্বতীদের কোনও ধারণা নেই।

আমি আর আফশেনেইটর সবসময় আতঙ্কে থাকি এই বুঝি এ্যাপিনডিসাইটিসের ব্যথা শুরু হলো। এই বিংশ শতাব্দীতে এসে যদি এ্যাপিনডিসাইটিসে মারা যাই তাহলে সেটা সত্যি খুব হাস্যকর হবে। সন্তানপ্রসবের সময় কী ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে সেটাও তিব্বতীদের অজানা।

তবে বিস্ময়কর হলেও সত্যি, তিব্বতে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করা হয়। ব্যবচ্ছেদ করে মাঝে মধ্যে আত্মীয়-স্বজনকে মৃত্যুর কারণ জানানো হয়, কিংবা মৃতদেহে যদি ইন্টারেস্টিং কিছু পাওয়া যায় তাহলে মেডিসিনের উৎসাহী কোনও ছাত্রকে জানানো হয় ব্যাপারটা।

দুর্ভাগ্যক্রমে যেসব স্কুলে মেডিসিন পড়ানো হয় সেগুলোতে কখনওই উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে না। গৌতম বুদ্ধ আর তাঁর শিষ্যরা যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন সে-সব অলঙ্ঘনীয় আইনে পরিণত হয়েছে। সেটাকে কাটছাট করার ক্ষমতা নেই কারও।

মাত্র দুটো স্কুল। ছোটটা চ্যাগপুরিতে, আর বড়টা শহরের নিচের দিকে। প্রতিটা আশ্রম থেকে প্রতিভাবান তরুণদের এই স্কুলে পাঠানো হয়। কোর্সের মেয়াদ দশ থেকে পনেরো বছর। শিক্ষিত, প্রবীণ সন্ন্যাসীরা ছাত্রদের পড়ান। ভাঁজ-করা হাঁটুর ওপর টেবিল রেখে, পায়ের ওপর পা তুলে বসে ছাত্ররা। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রঙিন ছবি ঝোলানো থাকে দেয়ালে। একবার স্কুলে গিয়ে দেখেছি একজন শিক্ষক ছাত্রদের ছবির সাহায্যে বিষক্রিয়ার লক্ষণ বোঝাচ্ছেন।

ভেষজ গাছপালা সংগ্রহ করার জন্য শরৎকালে সব স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়। সময়টা খুব ব্যস্তভাবে কাটালেও ছাত্ররা আনন্দের সঙ্গেই করে কাজটা। প্রতিদিন

BanglaBook.org

সকালে সুন্দর একটা জায়গায় ক্যাম্প ফেলা হয়। সারাদিনে সংগ্রহ করা গাছ-গাছালি এক জায়গায় জড়ো করে চাপিয়ে দেওয়া হয় ষাঁড়ের পিঠে।

তারপর ষাঁড়গুলোকে নিয়ে যাওয়া হয় ট্রা ইয়ারপায়। তিব্বতের পবিত্র জায়গাগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম। এখানে বেশ কয়েকটা বৌদ্ধ মন্দির আছে। ভেষজ গাছগুলো শুকাবার জন্য এসব মন্দিরে রাখা হয়। শীতকালে ছাত্রদের মধ্যে যার বয়স সবচেয়ে কম তাকে পাঠানো হয় মন্দিরে। সে এ-সব শুকনো গাছ-গাছালির শিকড় গুঁড়ো করে পাউডার বানায়। তারপর স্কুলের অধ্যক্ষ লেবেল লাগানো এয়ারটাইট চামড়ার ব্যাগে পাউডারগুলো ভরে রাখেন।

স্কুলগুলো আসলে ছাত্র পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ফার্মাসির কাজও করে। যে কেউ এখান থেকে ওষুধ কিনতে পারে। ভেষজ ওষুধের ব্যাপারে তিব্বতীরা খুব এগিয়ে আছে। তাদের পরিষ্কার ধারণা আছে কোন গাছের কি গুণ। যদিও এই ভেষজ ওষুধ খেয়ে আমার সায়াটিকার অবস্থা খুব একটা ভালো হয়নি, তবে তাদের ভেষজ চা খেয়ে অনেকবার জ্বর আর ঠাণ্ডার হাত থেকে বেঁচে গেছি আমি।

লাসার মেডিকেল স্কুলের অধ্যক্ষ খুব সম্মানীয় ব্যক্তি। তিনি তেরোতম দালাই লামার ব্যক্তিগত চিকিৎসক। কিন্তু চুয়ান্ন বছর বয়সে দালাই লামা যখন মারা গেলেন তখন অধ্যক্ষকে দায়ী করা হয়। তাঁকে ভাগ্যবানই বলতে হবে, কারণ নিজের সম্মান অটুট রেখে তিনি সময়মতো পালাতে পেরেছিলেন। তিব্বতীরা সম্ভবত তাঁকে চাবুক মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

শহর আর আশ্রমগুলোতে গিয়ে যে কেউ শুধু গুটিবসন্তের টিকা নিতে পারে। এছাড়া তিব্বতে আর অন্য কোনও টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। সঠিক চিকিৎসার অভাবে মহামারিতে প্রচুর মানুষ মারা যায় এখানে।

শান্ত আবহাওয়া আর পাহাড়ের নির্মল বাতাস তিব্বতীদের বাড়তি পাওনা। কিন্তু তিব্বতীরা কীভাবে পরিষ্কার থাকতে হয় সে-ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ। ধুলো আর বিচ্ছিরি স্যানিটারি ব্যবস্থার কারণে যে কোনও রোগ মহামারি আকার ধারণ করে। ঠাণ্ডা আবহাওয়া আর পাহাড়ের নির্মল বাতাস আছে বলে রক্ষে। তা না হলে তিব্বতীরা সব মরে সাফ হয়ে যেত। এই রকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মূল কারণ হচ্ছে কুসংস্কার।

তিব্বতে অনেক নারী-পুরুষ ভবিষ্যৎ বলে আর রাশি দেখে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রথমে তারা জন্মতারিখ জানতে চায়। তারপর নানরকম বই-পত্র ঘেঁটে হিসাব-নিকাশ করে। এরপর শুরু হয় বস্তা বস্তা উপদেশ দেওয়ার পালা। বিনিময়ে সামান্য ফি দিলেই তারা খুশি।

লামাদের বলা ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর তিব্বতীদের চরম আস্থা। এদের সঙ্গে আলাপ না করে নতুন কোনও কাজে হাত দেয় না তারা। নতুন অফিস নেওয়া কিংবা তীর্থযাত্রায় যাওয়ার জন্য কোন তারিখটা শুভ হবে সেটা আগে থেকে জেনে রাখা হয়।

BanglaBook.org

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, লাসায় খুব প্রভাবশালী একজন লামা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে রোগীদেরকে কয়েক মাস আগে খাতায় নাম লেখাতে হতো। মানুষের আতিথেয়তা গ্রহণের জন্য তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। রোগীরা তাঁকে এত বেশি উপহার দিত যে তিনি তাঁর দলবল নিয়ে খুব আনন্দে দিন কাটাতেন।

লামা হওয়ার আগে তিনি একজন সাধারণ সন্ন্যাসী ছিলেন। টানা বিশ বছর সবচেয়ে ভালো আশ্রমে লেখাপড়া করে পরীক্ষায় অসম্ভব ভালো ফলাফল করেন। এরপর তিনি নির্জনে ধ্যান করার উদ্দেশ্যে কয়েক বছরের জন্য একটা বিশেষ আশ্রমে চলে যান। এই ধরনের অসংখ্য আশ্রম তিব্বতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শুধু ধ্যান করার জন্যই সন্ন্যাসীরা এ-সব আশ্রমে থাকেন। সন্ন্যাসীদেরকে এখানে ঘিরে রাখে শিষ্যরা। এইসময় তাঁরা সাম্বা আর চা ছাড়া আর কিছু মুখে দেন না।

তিব্বতে মাত্র একজন মহিলাকে গৌতম বুদ্ধের প্রতিনিধি হিসাবে মান্য করা হয়। তাঁর আসল নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে 'বজ্রপাত'। বারখোরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখে আমার মনে হয়েছে তিনি ষোল বছরের একজন স্কুলপড়ুয়া মেয়ে। সন্ন্যাসিনীর বিশেষ পোশাক পরতেই বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করেন তিনি।

বজ্রপাত যেখানেই যান না কেন, সবসময় তাঁকে ঘিরে ভিড় লেগে থাকে। সবাই তাঁর আশীর্বাদ নিতে চায়। পরে লেক ইয়ামডর্কের একটা আশ্রমের অধ্যক্ষা হন তিনি ।

লাসার মানুষ গুজব শুনতে ও বলতে খুব ভালোবাসে। এখানে মহিলা পুরোহিত আর লামাদের সম্পর্কে অনেক অবিশ্বাস্য গল্প প্রচলিত আছে। এ-সব গুজব আর অবিশ্বাস্য গল্পের সত্যতা কতটুকু সেটা আমি নিজেই তদন্ত করে দেখেছি।

তবে মানুষের বিশ্বাসকে ছোট করে দেখার অধিকার কারও নেই। তিব্বতীরা তাদের বিশ্বাস নিয়ে সুখেই আছে। তারা কখনওই আমাদেরকে তাদের দলে ভেড়াবার চেষ্টা করেনি। দর্শক হিসাবে আমরা শুধু তাদের রীতিনীতি, ধরন-ধারণ, ধর্মীয় আচার ইত্যাদি দেখেছি আর ওদের নির্দেশমতো ভদ্রতা বজায় রাখবার জন্য অনেক মানুষকে সাদা সিল্কের চাদর উপহার দিয়েছি।

BanglaBook.org

দশ

লাসায় তিব্বতীদের জীবনযাত্রা-২

রাষ্ট্রীয় পুরোহিত / লাসার শরৎকাল / আমার ক্রিসমাস পার্টি / তিব্বতে বিদেশিদের জীবনযাত্রা।

সাধারণ মানুষের মতো তিব্বত সরকারও কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে রাষ্ট্রের ভবিষ্যদ্বক্তার সঙ্গে আলোচনা করে নেয়। এ-সময় একটা আনুষ্ঠানিক পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। বন্ধু ওয়াংডুলাকে বললাম, সুযোগ পেলে এরকম একটা পরামর্শ সভায় আমাকে যেন নিয়ে যাওয়া হয়।

কোনও রকম জানান না দিয়ে হঠাৎ একদিন সকালে আমার বাসায় এসে হাজির ওয়াংডুলা। সরকারী পরামর্শ সভায় নিয়ে যাবেন।

ওঁর সঙ্গে নাচাং আশ্রমের উদ্দেশে রওনা হলাম। ওয়াংডুলা জানালেন, উনিশ বছর বয়স্ক একজন দৈব্যজ্ঞানসম্পন্ন সন্ন্যাসী ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হিসাবে কাজ করবেন।

সন্ন্যাসীকে সাধারণ একটা ব্যাপারে ডাকা হয়েছে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার মাধ্যম হিসাবে তিনি যে উপহার দেবেন সেটাই হচ্ছে মূল আকর্ষণ।

সন্ন্যাসীদের একটা ব্যাপার আমার কাছে খুব দুর্বোধ্য লাগে। যতদূর জানি ধ্যানমগ্ন হতে হলে খুব মনোযোগী হতে হয়, আর এর জন্য প্রয়োজন পিনপতন নীরবতা। কিন্তু সন্ন্যাসী হাজার হাজার মানুষের সামনে কীভাবে এত দ্রুত মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন সেটা সত্যি গবেষণার বিষয়। হয়তো তাঁদের মনোযোগ দেবার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি, কিংবা ধ্যানমগ্ন হওয়ার জন্য তাঁরা হয়তো কোনও ধরনের ড্রাগ কিংবা বিশেষ কোনও কৌশলের আশ্রয় নেন।

ভবিষ্যৎ বলার জন্য সন্ন্যাসীর প্রথম কাজ হচ্ছে ধ্যানমগ্ন হওয়া। তারপর শরীর থেকে আত্মাকে বের করে দিতে হবে। এর ফলে সৃষ্টিকর্তাকে সুযোগ করে দেওয়া হয় তিনি যাতে তাঁর শরীরে ঢুকে কথা বলতে পারেন। এভাবেই সৃষ্টিকর্তা তাঁর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন। এটাই তিব্বতীদের বিশ্বাস।

আশ্রমে যাওয়ার পথে ওয়াংডুলা আর আমি এসব বিষয়ে আলোচনা করছিলাম।

BanglaBook.org

মন্দিরের গেটের কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনলে ভয় লাগে এমন কর্কশ গান স্বাগত জানাল আমাদের। ভেতরের পরিবেশ এত ভয়ংকর হবে সেটা আমার কল্পনায় ছিল না। দেয়াল থেকে কুৎসিত, কদাকার, বিকৃত সব মুখোশ ঝুলছে। প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে সেগুলো। হঠাৎ এসব দেখে আমার অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

এর সঙ্গে আবার যোগ হয়েছে শ্বাস বন্ধ করা ধূপের ধোঁয়া। সব মিলিয়ে পুরো পরিবেশটা অস্বাস্থকর। তরুণ ভবিষ্যদ্বক্তা কিছুক্ষণ আগে তাঁর বাসা থেকে এই ভূতুড়ে মন্দিরে এসেছেন। তার বুকে একটা গোল ধাতব আয়না ঝুলছে। সহকারীরা তাঁকে সিল্কের একটা গাউন পরিয়ে সিংহাসনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। হঠাৎ করেই মন্দিরে পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। কৃত্রিম ফাঁপা একটা আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

সন্ন্যাসী এবার ধ্যান শুরু করেছেন। খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছি আমি। তাঁর মুখ থেকে একমুহূর্তের জন্য আমার চোখ সরাচ্ছি না। দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন তাঁর নিজের মধ্যে নেই। শরীর থেকে তাঁর জীবনটা বুঝি বেরিয়ে যাচ্ছে।

এই মুহূর্তে তিনি একবিন্দু নড়াচড়া করছেন না। তারপর হঠাৎ তাঁর শরীর ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেল, দেখে মনে হচ্ছে তাঁর ওপর যেন বাজ পড়েছে। উপস্থিত সবাই নিজের অজান্তেই দম বন্ধ করে ফেলেছে।

সৃষ্টিকর্তা এখন তাঁর শরীরের ভেতর ঢুকে পড়েছেন। সন্ন্যাসীর পুরো শরীর থরথর করে কাঁপছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে। এ-সময় দুজন চাকর তাঁর মাথায় খুব সুন্দর একটা পাগড়ি পরিয়ে দিল। পাগড়িটা এত বড় আর ভারী যে সেটা একজনের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। পাগড়ির অসম্ভব ভারে সন্ন্যাসীর হালকা পাতলা দেহটা সিংহাসনের কুশনে আরও ডেবে যাচ্ছে। তরুণ ছেলেটা মরতে বসেছেন, মনে মনে ভাবলাম আমি। জানি না শারীরিক আর মানসিক এই চাপ আর কতক্ষণ সহ্য করতে পারবেন তিনি।

সন্ন্যাসীর শরীর এখন প্রচণ্ড ভাবে কাঁপছে। পাগড়িসহ মাথাটা এদিক-ওদিক দুলছে। চোখ দুটো যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। মুখটা অস্বাভাবিক ফোলা আর টকটকে লাল। সাপের মত হিসহিস শব্দ করছে। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন তিনি। তাঁকে ধরবার জন্য দৌড়ে এলো চাকররা।

কিন্তু তাদের হাত ফসকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। তারপর বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘুরে ঘুরে উন্মাদের মতো নাচতে শুরু করলেন। ফাঁপা আওয়াজ আছে বলে রক্ষে, তা না হলে শুধু তাঁর অসহ্য গোঙানি আর দাঁত কড়মড় করার আওয়াজ শুনতে হতো। এখন বুড়ো আঙুলে পরা বিশাল একটা রিঙ দিয়ে বুকের চকচকে বর্মের ওপর বিরতিহীন বাড়ি মেরে ঠন্-ঠন্ আওয়াজ করছেন।

এই আওয়াজে ড্রামের শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একপায়ে দাঁড়িয়ে চক্রাকারে

BanglaBook.org

নাচতে শুরু করলেন সন্ন্যাসী। বিশাল পাগড়ির ভারে খাড়া হয়ে পিছন দিকে হেলে পড়ছেন। দুজন চাকর সামনে গিয়ে তাঁর মাথা থেকে পাগড়ি খুলে ফেলল। ভারী পাগড়িটা বয়ে আনতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে তারা। সন্ন্যাসীর হাতে কিছু যবের দানা গুঁজে দিল সহকারীরা। সেগুলো দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন তিনি। তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে নিল সবাই।

বহিরাগত বলতে একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ নেই। তাই খুব ভয় পাচ্ছিলাম। যেমন হঠাৎ করে তাঁর পাগলামী শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ আবার শান্ত হয়ে গেলেন তিনি। কয়েকজন চাকর সামনে এগিয়ে ধরে ফেলল তাঁকে। একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার সামনে এসে তাঁর মাথার ওপর দিয়ে একটা চাদর ছুঁড়ে মারলেন। তারপর সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্রিসভার তৈরি করা প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইলেন তিনি।

নতুন গর্ভনর নিয়োগ, গৌতম বুদ্ধের নতুন প্রতিনিধি খোঁজা, যুদ্ধ আর শান্তি–এ-সব ব্যাপারে প্রশ্ন করা হচ্ছে সন্ন্যাসীকে। তাঁর উত্তর শোনার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সন্ন্যাসী মিন মিন করে উত্তর দেওয়ায় বেশিরভাগ প্রশ্নই কয়েকবার করতে হচ্ছে।

উত্তরগুলোর বোঝার চেষ্টা করলাম, কিন্তু উদ্ভট, অর্থহীন কিছু আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলাম না আমি। মন্ত্রীর অবস্থাও আমার মতো। ভবিষ্যদ্বক্তার কোনও কথাই বুঝতে পারছেন না। উত্তরগুলো বোঝার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন। এইসময় একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী একটা ফ্লাইং পেন দিয়ে উত্তরগুলো লিখতে শুরু করলেন। জীবনে তিনি কয়েকশ'বার এই কাজ করেছেন। এর আগের ভবিষ্যদ্বক্তার সেক্রেটারি ছিলেন তিনি।

অর্থহীন উত্তর লিখে মন্ত্রীকে বাঁচালেন তিনি। কোনও ভবিষ্যদ্বক্তা খারাপ উপদেশ দিলে এই কাজ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুব অযৌক্তিক মনে হয়েছে। যেহেতু ধরে নেওয়া হয় এই ভবিষ্যদ্বক্তার মাধ্যমে ঈশ্বর কথা বলছেন, তাই তাঁর সব কথাই তো বিশ্বাস করা উচিত। তবে তিব্বতে কোনটা যৌক্তিক আর কোনটা অযৌক্তিক সেটা বোঝার ক্ষমতা শুধু তিব্বতীদেরই আছে।

বিপদ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যদ্বক্তার এই পদটার ভীষণ চাহিদা। ভবিষ্যদ্বক্তাকে ডালামাকে একটা অফিস দেওয়া হয়। পদমর্যাদা অনুসারে তৃতীয় সারির কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ক্ষমতা দেওয়া হয় তাঁকে। সে নিচাং মঠের প্রধান অধ্যক্ষের মর্যাদা পায়, আর সেই সূত্রে মঠের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে।

ভবিষ্যদ্বক্তাকে শেষ একটা প্রশ্ন করলেন মন্ত্রী মহোদয়, ঈশ্বর কি তার শরীর থেকে বেরিয়ে গেছেন, কিংবা ঈশ্বরের মেজাজ কি ঠাণ্ডা হয়েছে? এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না ভবিষ্যদ্বক্তা।

মঠ থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। প্রচণ্ড রোদে চোখ দুটো ঝলসে গেল। কিছুক্ষণ

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে থেকে পুরো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না। এর আগে বহুবার এই ধরনের অনুষ্ঠানে এসেছি। কিন্তু কখনওই এইসব অদ্ভুত অনুষ্ঠানের কোনও ব্যাখ্যা বের করতে পারিনি।

অনুষ্ঠানের পর রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যদ্বক্তা যখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন তখন তাঁকে চেনা মুশকিল হয়ে যায়। আর দশটা সাধারণ মানুষের মতই সে হোটেলের টেবিলে বসে ঢক ঢক করে নুডুলস সুপ খায়। তবে আমি কখনওই তার সামনাসামনি বসে স্বাভাবিক থাকতে পারব না। রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা হলে মাথা থেকে হ্যাট খুলে সম্মান জানাই। উত্তরে তিনিও হেসে মাথা নত করেন আমার উদ্দেশে। তাঁর সেই লাল, কদাকার চেহারার সঙ্গে এখনকার এই সুদর্শন তরুণের কোনও মিল নেই। একই মানুষের দুই রূপ।

রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যদ্বক্তাকে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'বিশাল মিছিল'। দালাই লামাকে মন্দির দেখাবার জন্য শহরে আনার সময় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দালাই লামা যখন গরমকালের জন্যে নির্ধারিত বাগানবাড়িতে থাকেন তখন আরেকটা মিছিলের আয়োজন করা হয়। তবে সেই মিছিল আর এই মিছিল এক নয়। পার্থক্যটা বোঝাবার জন্য এখানে মিছিলের আগে বিশাল কথাটা যোগ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের দিন পুরো লাসা লোকে-লোকারণ্য হয়ে গেল। পা ফেলার মতো জায়গা নেই কোথাও। খোলা একটা জায়গায় তাঁবু টাঙানো হয়েছে। অনেক সন্ন্যাসী ভিড় করে আছেন তাঁবুর চারপাশে। কৌতূহলী মানুষকে চাবুক মারার ভয় দেখিয়ে কিছুটা দূরে রাখাই ওদের কাজ।

সাধারণ মানুষের কাছে এই তাঁবু একটা রহস্যের ডিপো। কারণ ভিতরে নিচাংয়ের ডালামা মোহগ্রস্ত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে ছ'শ' ত্রিশজন বহনকারীসহ দালাই লামা (গড কিং) পালকিতে চড়ে তাঁবুর কাছাকাছি এসে পড়েছেন।

তাঁবুর কাছে আসতেই থেমে গেল মিছিল। কারণ ভিতর থেকে টলমল করতে করতে বেরিয়ে এসেছেন সন্ন্যাসী। ইতিমধ্যে তাঁর মধ্যে সৃষ্টিকর্তা ঢুকে পড়েছেন। ফোলা মুখ দিয়ে অনবরত সাপের মতো হিসহিস করে শব্দ করছেন তিনি। পাগড়ীর ভারে মাথাটা এমনভাবে নিচের দিকে হেলে আছে যে দেখে মনে হচ্ছে আরেকটু হলেই মাটি ছুঁয়ে ফেলবে।

বহনকারীদের অগ্রাহ্য করে ভিড় ঠেলে পালকির সামনে চলে গেলেন তিনি। তারপর হঠাৎ কাঁধ দিয়ে পালকিটা উঠিয়ে দৌড়ে কয়েক কদম সামনে এগোলেন। দেখে মনে হচ্ছে এই বুঝি পালকিটা উল্টে যাবে।

কিন্তু সেরকম কিছু হওয়ার আগেই বহনকারীরা তাঁকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের কাঁধে পালকিটা উঠিয়ে নিল। এ-সময় সন্ন্যাসী ডালামা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে

BanglaBook.org

গেলেন ধপাস করে। একটা পালকিতে ওঠানো হলো তাঁকে। আগে থেকেই আনা হয়েছিল ওটা। এরপর সোজা পথে এগিয়ে চলল মিছিল। এই ধর্মীয় আচারের কী অর্থ সেটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না।

বৃষ্টি-প্রস্তুতকারক আর রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যদ্বক্তা ছাড়াও লাসায় আরও ছ'জন সৃষ্টিকর্তার মাধ্যম হিসাবে কাজ করেন। এদের মধ্যে একজন মহিলা। তাঁকে রক্ষাকারী দেবী হিসাবে গণ্য করা হয়। সামান্য কিছু ফি দিলেই তিনি দেবীর মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে রাজি হয়ে যান। এমন কি এক দিনে চারবার মাধ্যম হিসাবে কাজ করার ঘটনাও কয়েকবার ঘটেছে তাঁর জীবনে।

আরেক ধরনের মাধ্যম আছেন যারা মোহগ্রস্ত অবস্থায় বড় বড় তলোয়ার বাঁকিয়ে ফেলতে পারেন। আমার কয়েকজন বন্ধু তাদের বাড়ির সামনে বেদীতে বাঁকানো তলোয়ার রেখে দিয়েছে।

ইতিমধ্যে শরৎকাল এসে পড়েছে। বেশ কয়েক মাস হয়ে গেল লাসায় আছি। এতদিনে লাসার সবকিছুর সঙ্গেই নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়েছি আমরা। বছরের সবচেয়ে ভালো ঋতু শরৎকাল। সারঙের ফুলের বাগানে অনেক কাজ করেছিলাম। সেই বাগান এখন ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে।

ইতিমধ্যে গাছগুলোর রঙও পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। জাম, আপেল আর আঙ্গুরে ভরে গেছে গাছগুলো। বাজারে টমেটো আর শসার কোনও অভাব নেই। এই মৌসুমে লাসার অভিজাত পরিবারগুলো পার্টির আয়োজন করে। এসব পার্টিতে অতিথিদের জন্য অবিশ্বাস্য সব সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

পাহাড়ে চড়ার জন্য এটাই সবচেয়ে ভালো সময়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আনন্দ পাবার জন্যও কোনও তিব্বতী পাহাড়ে চড়ে না। শুধু বিশেষ দিনে সন্ন্যাসীরা তীর্থযাত্রী হিসাবে কিছু কিছু পবিত্র পাহাড়ের চূড়ায় ওঠেন।

এ-সময় অভিজাত শ্রেণীর মানুষেরা সৃষ্টিকর্তার ক্রোধ কমাবার জন্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁদের চাকরকে পাঠান। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ধূপ জ্বালায় তারা। উঁচু পাহাড়ে প্রার্থনাকারীদের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়। এ-সময় নতুন পতাকাও ওড়ানো হয় পাহাড়ে। উপহার হিসাবে দেওয়া সাম্বা খাওয়ার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে কাক উড়তে থাকে। দুই তিন দিন পাহাড়ে থাকার পর খুশি মনে সন্ন্যাসীরা শহরে ফিরে আসেন।

খেলাধুলোর কোনও ব্যবস্থা না থাকায় পাহাড়ে চড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা।

আমাদেরকে এত দ্রুত পাহাড়ে উঠতে দেখে অবাক হয়ে গেল তিব্বতীরা। একবার পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ধূপ জ্বালালাম আমি। এটা না করলে তিব্বতী বন্ধুরা বিশ্বাসই করতে চাইত না যে আমরা এত উঁচুতে উঠতে পেরেছি।

লাসা থেকে একটু দূরে একটা পাহাড়ের চূড়ায় সবচেয়ে বেশি মজা পেলাম আমি। বৃষ্টির মৌসুমে আসায় দেখে মনে হচ্ছিল লেকের পানি উপচে পড়ে শহরটাকে না

BanglaBook.org

ভাসিয়ে দেয়। পুরনো একটা মতবাদ অনুযায়ী এই লেক একটা সুড়ঙ্গ চ্যানেলের মাধ্যমে আরেকটা লেকের সঙ্গে সংযুক্ত। বলা হয় এই লেকের ওপরে কোথাও একটা মন্দির আছে।

লেকের আত্মার ক্রোধ কমাবার জন্য প্রতি বছর সরকার বিভিন্ন উপহারসহ কিছু সন্ন্যাসীকে এখানে পাঠায়। তীর্থযাত্রীরাও এই লেকের পানিতে খুচরো পয়সা ছুঁড়ে মারেন। পাশেই কিছু পাথরের ঘর আছে। আমি বুঝতে পারলাম লেকটা শহরের নিরাপত্তার জন্য মোটেও হুমকি নয়। পানি উপচে পড়লেও তাতে শহরের কোনও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।

কত আর পাহাড়ে চড়া যায়! একটু খেলাধুলো করার জন্য অস্থির হয়ে আছি। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এলো মাথায়। টেনিস কোর্ট বানালে তো মন্দ হয় না! বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বেশ কয়েকজনকে এ-ব্যাপারে আগ্রহী করে তুললাম। এল.টি.সি. নামে একটা ক্লাব করে সদস্য যোগাড় করলাম। অগ্রিম হিসাবে কিছু ফান্ডের ব্যবস্থাও হয়ে গেল। লাসার তরুণ থেকে শুরু করে ইন্ডিয়ান, সিকিমিজ আর নেপালিরাও আছে এল.টি.সি-তে। ফুটবলের প্রতি সরকারের মনোভাব মনে পড়ে যাওয়ায় প্রথমে ওরা কেউই সদস্য হতে চায়নি। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বোঝাতে রাজি হয়ে গেল। তা ছাড়া ব্রিটিশ লিগেশনে অনেক আগে থেকেই টেনিস কোর্ট আছে।

টেনিস কোর্ট তৈরি হয়ে যাওয়ার পর ছোট-খাট পার্টির আয়োজন করলাম। কিছুদিনের মধ্যেই টেনিস খেলাটা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল লাসায়।

শরৎকালে তিব্বতীরা অবসর সময় কাটায় ঘুড়ি উড়িয়ে। এটা তিব্বতের একটা ঐতিহ্য। বৃষ্টির মৌসুম শেষ হবার পর শরৎকালের আকাশ খুব পরিষ্কার থাকে। এ-সময় বিভিন্ন আকারের রঙিন ঘুড়িতে ভরে যায় বাজার।

বছরের অষ্টম মাসের প্রথম দিনে এই ঘুড়ি উৎসব শুরু হয়। একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এদিন। অভিজাতশ্রেণীর মানুষেরাও এ-সময় সবকিছু ভুলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যায়। প্রথম ঘুড়িটা ওড়ানো হয় পোটালার আকাশে। দেখতে না দেখতে রঙ-বেরঙের ছোটবড় হরেক রকম ঘুড়িতে ভরে যায় নীলিমা। চলে হরদম ঘুড়ি কাটাকুটি। ঘুড়ির সুতো ছিঁড়ে গেলে সেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোট ছেলেমেয়েরা। পুরো একমাস ধরে চলে এই ঘুড়ি উৎসব। অবসর পেলেই এই খেলায় মেতে ওঠে সবাই।

তারপর হঠাৎ একদিন ঘুড়ি উৎসবটা শেষ হয়ে যায়। ঠিক যেভাবে কোনও রকম জানান না দিয়েই আকাশ ভরে গিয়েছিল রঙিন ঘুড়িতে, একইভাবে একদিন হঠাৎ আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সব ঘুড়ি।

একদিন নানা আকৃতির ঘুড়ি দেখতে দেখতে বাজারের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। এ-সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক লোক আমার

BanglaBook.org

কাছে এসে ডায়ালহীন পুরনো একটা ঘড়ি দেখাল। বিক্রি করবে। এই নষ্ট ঘড়ি ঠিক করার ক্ষমতা তার নেই।

আমি ইউরোপিয়ান, চেষ্টা করলে ঠিক করতে পারব। এই ধরনের মনভোলানো কথা বলে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা ঘড়িটার জন্য কোনও নির্দিষ্ট টাকা চাইছে না। যা ইচ্ছে তা-ই দিলেই হবে। হাতে নিয়ে ভালো করে দেখতেই ঘড়িটা চিনে ফেললাম আমি। পশ্চিম তিব্বতে থাকার সময়ে আফশেনেইটর তার হাতঘড়ি বিক্রি করে দিয়েছিল। ঘুরে-ফিরে সেই ঘড়িটাই আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে। পানি নিরোধক, রোলেক্স কোম্পানির ঘড়ি। জিনিসটা খুব প্রিয় ছিল আফশেনেইটরের। মনে মনে ভাবছি ঘড়িটা ঠিক করতে পারলে খুব খুশি হবে ও। নামমাত্র মূল্যে লোকটার কাছ থেকে জিনিসটা কিনলাম। তারপর মোহাম্মিদান নামে একজন মিস্ত্রীকে দিয়ে ঠিক করালাম। জন্মদিনে ঘড়িটা উপহার দিলাম আফশেনেইটরকে। ওটা ফিরে পেয়ে ওর চেহারটা হলো দেখবার মতো।

শরৎকালে ঘোড়ার বাজার বসে। কয়েকশ' ঘোড়া নিয়ে সিকিং থেকে একের পর এক ক্যারাভ্যান আসছে। সিকিং তিব্বতের উত্তর-পশ্চিম দিকে। প্রাণবন্ত, জমজমাট দরকষাকষি চলে হরদম। দামাদামীতে তিব্বতীদের জুড়ি মেলা ভার। অভিজাতশ্রেণীর মানুষেরা এখানে ঘোড়া কিনতে আসেন। ভালো ঘোড়া পেলে দাম বেশি দিতে কার্পণ্য করেন না তাঁরা। এখানে একটা কথা না বললেই নয় যে কে কটা ঘোড়া ব্যবহার করছেন সেটা দেখে বোঝা যায় সমাজে তাঁর স্থান কোথায়। কারও কারও বিশটা পর্যন্ত ঘোড়া আছে।

ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকে কিছুটা উত্তেজনার ছোঁয়া পেলাম আমরা। আগে থেকেই বলা হয়েছিল এই দিন চন্দ্রগ্রহণ হবে। সন্ধ্যা হতেই সবাই বাড়ির ছাদে উঠে পড়ল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল পৃথিবীর ছায়া চাঁদটাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। এসময়ে কিছু মানুষ হইচই শুরু করল। তাদের দেখাদেখি এবার অন্যরাও চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে।

ভয় দেখিয়ে চাঁদকে গ্রাস করতে আসা অশুভ শক্তিকে তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে তারা। চন্দ্রগ্রহণ শেষ হতেই যে যার বাসায় ফিরে গেল। তবে আর সবকিছুর মতো এখানেই শেষ হলো না ব্যাপারটা। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জেতা উপলক্ষে বাসায় গিয়ে খেলা শুরু করে দিল সবাই।

আর কিছুদিন পরেই ক্রিসমাস শুরু হবে। সবাইকে অবাক করে দেওয়ার মতো কিছু একটা করতে চাই আমি। সিদ্ধান্ত নিলাম একটা ক্রিসমাস পার্টির আয়োজন করব। তিব্বতী বন্ধুরা আমার জন্য অনেক কিছু করেছে। তাদেরকে কিছু উপহার দেব ওই পার্টিতে।

পরবর্তী কয়েকদিন খুব ব্যস্ত থাকলাম আমি। আমার এক বন্ধুর নাম ট্রিথঙ। তার

BanglaBook.org

মৃত বাবা একসময় মন্ত্রী ছিলেন। ট্রিথঙ কয়েকদিনের জন্য তার বাড়িটা আমাকে ব্যবহার করতে দিল। কয়েকজন চাকর আর একজন রাঁধুনি ভাড়া করলাম।

আমার উপহার পেয়ে খুব খুশি হলো বন্ধুরা। বেশি কিছু না, কয়েকটা ইলেকট্রিক টর্চ, পকেট ছুরি, টেবিল টেনিস সেট, আর ঘরোয়া খেলার কিছু সরঞ্জাম। তবে সারঙ আর তাঁর পরিবারকে বিশেষ উপহার দেবো বলে ঠিক করেছি। আমার ক্রিসমাস পার্টির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ক্রিসমাস ট্রি।

মিসেস সারঙ আমাকে একটা জুনিপার গাছ ধার দিয়েছেন। গাছের পটটা আশ্চর্য রকম সুন্দর। গাছটাকে মোম, আপেল, বাদাম আর মিষ্টি দিয়ে সাজালাম। ব্যস! তৈরি হয়ে গেল আমার ক্রিসমাস ট্রি।

লাসায় যে-কোনও অনুষ্ঠান সাধারণত সকাল বেলাই শুরু হয়ে যায়। এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না। অনুষ্ঠানের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ওয়াংডুলা সাহায্য করছেন আমাকে। আমার আয়োজন বন্ধুদের পছন্দ হবে কিনা সে-ব্যাপারে খুব দুশ্চিন্তায় আছি। তিব্বতীদের অনুষ্ঠানের ধরন সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না। তাছাড়া এই প্রথম নিজ দায়িত্বে ক্রিসমাস পার্টির আয়োজন করেছি। কোথাও কোনও ভুল করে ফেললে লজ্জায় পড়তে হবে।

কিছুক্ষণ পর অতিথিরা আসতে শুরু করলেন আমার বাসায়। মিসেস সারঙের দেওয়া জুনিপার গাছটাকে নানাভাবে দেখতে লাগল তারা। ওটার নিচে রাখা মোম, আপেল আর বাদাম দেখেও খুব অবাক হচ্ছে ওরা। বাচ্চা ছেলের মতো সবাই খুব উৎফুল্ল হয়ে আছে।

সারাদিন হাসি-আনন্দে মেতে উঠলাম আমরা। সঙ্গে পেটপুজো, আর খেলাধুলোর ব্যবস্থা থাকায় দিন থেকে কখন সন্ধ্যা হয়ে গেল সেটা টেরই পেলাম না। এবার আসল চমকটা দেখাব ওদেরকে। পাশের ঘরে যাওয়ার অনুরোধ করলাম বন্ধুদের। সবাই চলে যেতেই ক্রিসমাস ট্রি লাইট জ্বেলে দিলাম। একই সঙ্গে সান্তা ক্লুস-এর অভিনয় শুরু করলেন ওয়াংডুলা। রেকর্ডে স্টিলি নাচাট, হিরিজি নাচাট গানটা ছাড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে চলে এলো বন্ধুরা। বিস্ফারিত চোখে ক্রিসমাস ট্রি দেখছে। ওদের বিস্ময় যেন বাঁধ মানছে না। গাছটাকে ঘিরে ঘুরছে ওরা। সবার আগে খ্রিস্টান লিউ গান গাইলেন। তারপর অতিথিদের মধ্যে ইংরেজি স্কুলে পড়েছেন তারাও সুর মেলালেন তাঁর সঙ্গে। দৃশ্যটা বড় অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে। বিভিন্ন জাতির মানুষ এশিয়ার এই প্রাণকেন্দ্র, তিব্বতে জড়ো হয়ে একটা ক্রিসমাস ট্রি-কে ঘিরে ঘুরছে আর খ্রিস্টানদের মতো ক্রিসমাসের গান গাইছে।

যে-কোনও পরিস্থিতিতে খুব সহজেই আবেগের লাগাম ধরে রাখতে পারি আমি। কিন্তু এখন আমাকে স্বীকার করতেই হবে এই দৃশ্য দেখে অনেক চেষ্টা করেও অশ্রু

BanglaBook.org

সংবরণ করতে পারলাম না। হঠাৎ বাসার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় খুব খারাপ লাগছে আমার।

অতিথিদের হাসি-তামাসা, আমার উপহার পেয়ে তাদের আনন্দ আর সামান্য একটু হুইস্কি থাকায় মনটা দ্রুতই ভালো হয়ে গেল আমার। বিদায় জানাবার সময় খুব প্রশংসা করল বন্ধুরা। বলল আমাদের জার্মান নিউ ইয়ার অনুষ্ঠানে দারুণ মজা পেয়েছে।

এক বছর আগে আমরা চ্যাঙহ্যাঙ ছিলাম। পরিষ্কার মনে আছে তখন কী করুণ অবস্থা ছিল আমাদের। কয়েক টুকরো রুটি আর ক্রিসমাস পার্টির জন্য কতই না ব্যাকুল ছিলাম। আজ একটা খাবারের টেবিলে গোল হয়ে বসে আছি। আর কী নেই সেই টেবিলে! কোন অধিকারে ভাগ্যকে দোষ দেবো!

নতুন বছরের উৎসবে ক্রিসমাস পার্টি ছাড়া আর কিছু করা হলো না। ইতিমধ্যে খাল বানাবার কাজ শেষ করেছে আফশেনেইটর। চুপ করে বসে থাকবে, সেরকম বান্দাই নয় ও; নতুন আরেকটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে।

বিশ বছর আগে লাসায় একটা ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট বসানো হয়েছিল। একজন সাবেক রাগবিয়ানের উদ্যোগে কাজটা করা হয়। কিন্তু লাসা এখন চরম অবহেলিত একটা রাষ্ট্র। এখানে কোনও বিদ্যুৎ দেওয়া হয় না। শুধু কর্মদিবসে মুদ্রা তৈরির কারখানা চালু রাখার জন্য বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। আবাসিক এলাকায় বিদ্যুৎ দেওয়া হয় শুধু শনিবার।

প্রয়োজনীয় কাগুজে নোট আর মুদ্রা তিব্বতেই তৈরি করা হয়। ডেসিমেল হিসাব করে স্যাঙকে ভাগ করা হয় শু আর কারমায়। খুব শক্ত কাগজ দিয়ে নোট বানানো হয় তিব্বতে। নোটগুলো হয় খুব উজ্জ্বল রঙের আর সেই সঙ্গে জলছাপও দেওয়া হয়। নোটের ওপর যে সংখ্যা লেখা থাকে সেটা খুব দক্ষতার সঙ্গে হাত দিয়েই পেইন্ট করা হয়।

হাত দিয়ে বানানো হলেও আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে নোটের এই সংখ্যার কারণেই এখন পর্যন্ত কেউ নকল করতে পারেনি। তিব্বতের ব্যাংকনোট দেখতে খুব সুন্দর। সোনা, রুপো আর তামার মুদ্রাও ব্যবহার করা হয়।

স্ট্যাম্পে তিব্বতের ছবি আছে–পাহাড় আর সিংহ। ডাকবিভাগের স্ট্যাম্পেও প্রায় একই রকম ছবি ছাপানো হয়েছে। পার্থক্য শুধু সূর্য ওঠার একটা দৃশ্য আছে ওটায়।

পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ না থাকায় নোট আর মুদ্রা তৈরিতে অনেক বাধার সৃষ্টি হয়। এ-ব্যাপারে কথা বলার জন্য আফশেনেইটর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করল। ও দেখতে চায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা মেরামত করার কোনও উপায় আছে কিনা। কর্মকর্তাদের জানাল মেরামত করলেও অবস্থার খুব একটা উন্নতি হবে না। পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ পাওয়ার একমাত্র উপায় কইচু নদীর পানি ব্যবহার করা। এখন খুব ছোট একটা নদী থেকে বিদ্যুৎ

BanglaBook.org

উৎপাদন করা হচ্ছে। স্রোত কম থাকায় সেখান থেকে যথেষ্ট বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে না।

সবাই ভয় পাচ্ছিল পবিত্র পানির অপব্যবহার করা হলে সৃষ্টিকর্তা লাসাকে শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু আফশেনেইটর তা মানবে কেন! কর্তৃপক্ষকে রাজী করিয়ে ফেলল ও। কাজটা করতে গিয়ে কি পরিমাণ কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে কে জানে! প্রথমে ওকে জরিপ করার অনুমতি দেওয়া হলো। প্রতিদিন দীর্ঘ যাতায়াতের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য শহরের বাইরে একটা বাগান বাড়িতে থাকার সিদ্ধান্ত নিল আফশেনেইটর।

*

ওর সঙ্গে মাঝে-মধ্যে দেখা হয় আমার। শিক্ষকতা করতে গিয়ে আমাকে শহরেই থাকতে হচ্ছে। ইদানিং কাউকে কাউকে টেনিস খেলাটাও শেখাচ্ছি। ছোট-বড় সবরকম ছাত্রই আছে। পড়াশোনায় ভালোই এগোচ্ছে ওরা। তবে লেগে থাকা বলতে যা বোঝায়, সেরকম নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহ ও চেষ্টার কমতি আছে তিব্বতীদের। নতুন কিছু শেখার জন্য প্রথম প্রথম সবার মধ্যে চরম কৌতূহল দেখা গেলেও, কিছুদিন পরেই তাদের সব আগ্রহ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। একারণে প্রায়ই ছাত্র হারাতে হয় আমাকে।

তাদের পরিবর্তে আবার নতুন ছাত্র যোগাড় করা কঠিন কিছু নয়। তবে তারাও খুব বেশিদিন আগ্রহ ধরে রাখতে পারে না। অবস্থা যখন এরকম তখন এটা নিয়ে সন্তুষ্ট হই কী করে। শিক্ষিত পরিবারের কিছু ছাত্র পেয়েছিলাম। সবাই তারা খুব বুদ্ধিদীপ্ত আর চালাক চতুর। তুলনামূলকভাবে আমাদের ইউরোপিয়ান বাচ্চাদের চাইতে কোনও অংশে কম নয়।

বিস্ময়করই বলতে হবে, ইন্ডিয়ান স্কুলে ইউরোপিয়ান ছাত্রদের সঙ্গে তিব্বতের শিক্ষিত পরিবারের ছাত্রদের রীতিমতো হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। ভুলে গেলে চলবে না তিব্বতী ছাত্রদেরকে নতুন একটা ভাষা শিখতে হয়। ভাষা না জানলে স্যারের দেওয়া লেকচারের কিছু বুঝতে পারে না তারা। নতুন একটা ভাষা শেখা চাট্টিখানা কথা নয়। এত বড় একটা বাধা থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অনেকেই ক্লাসের এক নম্বর রোলটা নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়।

এখানে বিশেষভাবে একটা ছেলের কথা না বললে অপরাধ হয়ে যাবে। লাসা থেকে দার্জিলিং-এর স্কুলে পড়াশোনা করতে গিয়ে বাজিমাত করে দিয়েছে সে। শুধু পড়াশোনা নয়, সবরকম খেলাধুলোতেও সবাইকে টপকে গেছে।

ছাত্র পড়ানো ছাড়াও আয়-রোজগারের অনেক নতুন উপায় খুঁজে পেয়েছি আমি। লাসায় রাস্তায় বসেই যে কেউ রোজগার করতে পারে। শুধু মানুষকে একটু আনন্দ দিতে পারলেই হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় খাঁটি দুধ আর ঘি বানাবার জন্য একটা ডেইরি ফার্ম খুলে বসতে পারি অনায়াসে, কিংবা ইন্ডিয়া থেকে একটা আইস মেশিন এনেও ব্যবসা করা যায়।

ঘড়ি মেরামতকারী, জুতোর কারিগর আর মিস্ত্রীর অসম্ভব চাহিদা আছে তিব্বতে। কেউ যদি ইংরেজিতে একটু ভালো হয় তাহলে তো কথাই নেই। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো

BanglaBook.org

লুফে নেয় তাদের। তবে দোকানদার হওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই আমাদের। টাকা কামাবার উদ্দেশ্যে এখানে আসিনি আমরা।

টাকার প্রয়োজন আছে আমাদের। তবে সেটা কামাবার জন্য এমন কোনও কাজ করতে রাজি নই যেটা করতে আমাদের ভালো লাগবে না। তবে সবকিছুর ঊর্ধ্বে আমরা সরকারকে সন্তুষ্ট করতে চাই। সরকারের কোনও কাজ পেলে টাকার কথা মাথাতেই আনি না। কাজ করার পর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসা, সম্মান আর আতিথেয়তাই আমাদের জন্য অনেক কিছু।

ইতিমধ্যে সরকারী সব বিষয় নিয়েই কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়ে তাঁদেরকে কমবেশি সাহায্য করতে পারায় আমরা খুব খুশি। তবে সমস্যা হচ্ছে তিব্বতীরা মনে করে আমরা সব কাজেই দক্ষ। মোটামুটি জানি বা কিছুই জানি না এমন ব্যাপারে ওরা আমাদের সাহায্য চাইলে খুব অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যেতে হয়।

একবার মন্দিরের একটা মূর্তি নতুন করে সাজাতে বলা হলো আমাদের। কিন্তু মিহি সোনা থেকে কীভাবে রঙ তৈরি হয় সেটা জানি না। ভাগ্যগুণে সারঙয়ের লাইব্রেরিতে একটা বই পেয়ে গেলাম। সেখানে এ-ব্যাপারে বিস্তারিত লেখা আছে। বইটা না পেলে খুব লজ্জায় পড়ে যেতাম। অর্ডার দিয়ে কিছু কেমিকেল আনালাম ইন্ডিয়া থেকে। তবে লাসার নেপালিরা সোনা থেকে রঙ তৈরির কাজে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু তারা তাদের এই গুণ নিয়ে এতই গর্বিত যে সেটা অন্য কাউকে জানতে দিতে নারাজ।

তিব্বতে প্রচুর সোনা আছে। তবে মাটি থেকে কীভাবে সোনা তুলতে হয় সে-ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না। বহু বছর আগে হরিণের শিং দিয়ে চ্যাঙথ্যাঙ থেকে মাটি তুলেছিল তিব্বতীরা। এ-ব্যাপারে একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার।

তাঁর মতে ওই মাটিতে সোনা আছে কিনা সেটার জানার জন্য আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। তবে প্রয়োজন থাকলেও তিব্বতে এখন আর সোনা পাওয়ার জন্য মাটি খোঁড়া হয় না। কারণ তাদের ধারণা, মাটি খুঁড়লে পাতালের দেবতাকে বিরক্ত করা হবে। খামোখা বিপদ ডেকে এনে কি লাভ কাজেই কুসংস্কারের কারণে আরেক ধাপ পিছিয়ে গেল তিব্বত।

তিব্বতে এশিয়ার অনেক সুপরিচিত নদীর উৎস রয়েছে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে থাকায় এসব উৎস থেকে প্রচুর সোনা এশিয়ার অনেক নদীতে চলে যায়। প্রতিবেশী দেশগুলো তিব্বতের মতো পিছিয়ে নেই। কাজেই নদীর মাধ্যমে দেশে সোনা এলেই সেটা কাজে লাগায় তারা।

তবে এখনও তিব্বতের কিছু কিছু অংশে সোনা তোলা হয়। তুলনায় ওসব এলাকায় সোনার ব্যবসাটা লাভজনক। তিব্বতের পুব এলাকায় কিছু নদী আছে, এ-সব নদীর ঝরনাগুলো ছোট ছোট গর্তে হারিয়ে গেছে। এখান থেকে সোনা পাওয়ার জন্য বিশেষ

BanglaBook.org

কিছু করতে হয় না। কিছুদিন পর গেলেই যে কেউ সোনা নিতে পারে ওখান থেকে।

এই সোনা প্রাকৃতিক সম্পদ, জেলা সরকারের কড়া নজর থাকায় আগের মতো এখন আর যে-কেউ হয়তো সোনা নিতে পারে না ওখান থেকে।

এই সোনার ব্যাপারে তিব্বতীদের মনোভাব দেখে অবাক হতে হয়। চোখের সামনে সোনা রয়েছে, অথচ সেটা নেওয়ার আগ্রহ আছে তিব্বতে এরকম কোনও মানুষ পাওয়া যাবে না। লাসার যে কোনও উষ্ণ প্রস্রবণে ডুব-সাঁতার দিলে আপনার চোখে পড়বে রাশি রাশি স্বর্ণকণা। সূর্যের আলো লেগে চিকচিক করে ওগুলো।

পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে এরকম খোলা অবস্থায় সোনা পাওয়া গেলে নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। তবে তিব্বতীরা এক্ষেত্রে নির্বিকার। এর কারণ তিব্বতীদের জন্যে এই সোনা তোলার সহজ কাজটাই অনেক কঠিন।

*

আর কিছুদিন পরই নতুন বছরের উৎসব শুরু হবে। তিব্বতে এটা আমাদের দ্বিতীয় বছর। এ-সময় হঠাৎ বাসা থেকে একটা চিঠি পেলাম। গত তিন বছরে এই প্রথম বাসা থেকে চিঠি এলো। এটা হয়তো অনেক আগেই পাঠানো হয়েছে। আমাদের হাতে আসার আগে এগুলোকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়েছে।

একটা এনভেলাপে রিকযাভিক-এর পোস্টমার্ক দেখে বুঝতে পারলাম পুরো পৃথিবী ঘুরতে হয়েছে ওটাকে। যাক, অবশেষে বাসার সঙ্গে যোগাযোগ করার একটা উপায় পাওয়া গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই নাজুক।

বেশ কয়েক বছর তিব্বতে থাকলেও এখন পর্যন্ত ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি নিয়ে কাউকে কথা বলতে শুনিনি। যাই হোক, চিঠিতে ভালো কোনও খবর পেলাম না। শিগগির বাড়ি ফেরার কোনও উপায় নেই। কাজেই লাসায় থাকার ইচ্ছেটা আরও জেঁকে বসল আমাদের মনে।

ভাবছি একটা বাড়ি বানিয়ে এখানে স্থায়ী হয়ে যেতে পারলে মন্দ হয় না। ভ্রমণপিপাসু হওয়ায় বাড়ির সঙ্গে আমাদের বন্ধন কখনওই খুব বেশি দৃঢ় ছিল না।

পৃথিবীর ছাদ নামে পরিচিত এই শান্তিপূর্ণ দেশে বেশ অনেক দিন হলো আমরা আছি। এতে আমাদের চরিত্রগত কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এখন আমরা বাস্তব অবস্থা বিচার করে খুব দ্রুত গঠনমূলক চিন্তা করতে পারি। তিব্বতীদের চরিত্র এবং তাদের স্বভাব সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হয়েছে।

এখানেই শেষ নয়, তিব্বতী ভাষাটা বেশ ভালোভাবেই আয়ত্ত করতে পেরেছি আমরা। এখন শুধু নিজেদের কথা নয়, যে-কোনও বিষয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ওদের ভাষায় আলোচনা করতে পারি। একটা সাধারণ আলোচনায় কীভাবে কথা বলতে হবে সে ব্যাপারে আর কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই আমাদের।

ছোট একটা অয়ারলেস সেট দিয়ে বাইরের বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি আমরা। একজন মন্ত্রীর কাছ থেকে যন্ত্রটা পেয়েছিলাম। অয়ারলেস সেটটা দেওয়ার

BanglaBook.org

সময় তিনি আমাকে বাইরের বিশ্বের, বিশেষ করে মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক খবর জানাতে বলেছিলেন। ছোট্ট যন্ত্রটা থেকে এতো স্পষ্ট শব্দ শোনা যায় যে মাঝে-মধ্যে অবাস্তব বলে মনে হয়।

সকালে আমার প্রথম কাজ অয়ারলেস সেট দিয়ে খবর শোনা। খবর শুনে কত রকম বিচিত্র জিনিস যে জানা যায় তার কোনও ইয়াত্তা নেই। শুনতে শুনতে তিব্বতীদের কথা ভেবে নিজের অজান্তেই মাথা নাড়ি আমি। ভাবি তিব্বতের মানুষ কত পিছনে পড়ে আছে।

এরা জানেই না কোন বিষয়ের কি গুরুত্ব। একটা ষাঁড় যেমন হেলেদুলে সামনে এগিয়ে যায়, তিব্বতীদের জীবনের গতিও ঠিক সেরকম। হাজার বছর ধরে তারা এভাবেই বেঁচে আছে। তিব্বতকে স্থানান্তর করা হলে কি এখানকার মানুষেরা খুশি হবে? কোনও সন্দেহ নেই, ইন্ডিয়ায় যাওয়ার একটা রাস্তা হলে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মান এবং গতি–দুটোই বাড়ত। তবে এতে হিতে-বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

এভাবে সময়ের আগে তিব্বতীদের জীবনের মান বাড়ানোর খারাপ দিকও থাকতে পারে। হঠাৎ করে পুরো পৃথিবী চোখের সামনে উন্মোচিত হলে ওদের চাহিদা অসম্ভব বেড়ে যাবে। আর সেটা পূরণ করতে গিয়ে নিজেদের শান্তি নিজেরাই নষ্ট করে ফেলবে ওরা।

তিব্বতীরা এখন যে অবস্থায় আছে সেখান থেকে রাতারাতি উন্নতি করা সম্ভব নয়। গায়ের জোরে চেষ্টা করলে বুমেরাং হয়ে দেখা দিতে পারে। এ-ব্যাপারে তিব্বতীরা খুব সুন্দর একটা কথা বলে–'পোটালা রাজপ্রাসাদের নিচতলায় পা না রেখে সরাসরি পাঁচ তলায় ওঠা আক্ষরিক অর্থেই যে কারও জন্য সাধ্যের বাইরে।'

তিব্বতীদের সংস্কৃতি আর জীবনযাত্রা আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধার সঙ্গে তাল মেলাচ্ছে, নাকি তার চেয়ে পিছিয়ে আছে সেটা একটা বড় প্রশ্ন। এখানকার মানুষের যে ভদ্রতাজ্ঞান সেটার সঙ্গে পশ্চিমা মানুষের ভব্যতা বোধ তুলনা করা যায় না।

এখানে কেউ কাউকে অসম্মান করে না। আগ্রাসন কি জিনিস সেটা ওদের অজানা। এমন কি রাজনৈতিক দলগুলোও একে অপরের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখায়। এখানকার শিক্ষিত ভদ্রমহিলারা খুব পরিশীলিত ও মার্জিত। পোশাক-আশাক দেখেই তাদের মার্জিত রুচি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

এখানেই শেষ নয়, অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রেও তাদের জুড়ি মেলা ভার। কাজকর্ম করার জন্য বাসায় দুজন বা একজন মহিলা সঙ্গিনী রাখলে তিব্বতীরা সেটা ভালো চোখেই দেখবে। কয়েকজন তিব্বতী বন্ধু বাসায় অন্তত একজন সঙ্গিনী রাখার জন্য অনেক উৎসাহ দিয়েছে আমাদেরকে।

একাকী থাকলে ব্যাপারটা নিয়ে প্রায়ই চিন্তা করি। তিব্বতে চোখে পড়ার মতো অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে নিজেকে আমি জড়াতে পারব না।

BanglaBook.org

আত্মার সম্পর্ক বলতে যা বোঝায় তিব্বতী মেয়েদের সঙ্গে সেটা কখনোই হবে আমার। কাজেই তাদেরকে বিয়ে করলে আমি সন্তুষ্ট হতে পারব না। খুশি হতাম দেশে বিয়ে করে এখানে স্থায়ী হতে পারলে।

প্রথমদিকে এরকম একটা চিন্তা থাকলেও তখন আমার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু পরে রাজনৈতিক সমস্যার কারণে ওই চিন্তাকে আর বাস্তব রূপ দিতে পারিনি।

তাই তিব্বতে আমাকে একাকী থাকতে হচ্ছে। কিন্তু পরে দালাই লামার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর এই একা থাকার অনেক সুবিধা পেয়েছি আমি। বিয়ে করলে তিব্বতের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে হয়তো কথাই বলতে পারতাম না। কারণ নারীর সঙ্গ তাদের জন্য নিষিদ্ধ। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে সমকামিতা এখানে খুব সাধারণ একটা ব্যাপার।

এমন কি সন্ন্যাসীদের স্ত্রীরাও তাঁদের এই বদভ্যাসকে মৌন সম্মতি দেন। বিয়ে করা সন্ন্যাসীদের জন্য নিষিদ্ধ হলেও, মাঝে-মধ্যে ওঁরাও প্রেমে পড়েন। বিয়ে করতে হলে তো তপস্বী জীবন-যাপন ছাড়তে হবে, কাজেই কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন সন্ন্যাসীরা। এক্ষেত্রে সহজেই কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়া যায়। উচ্চবংশীয় কোনও সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে আশ্রমে থাকার সময় তাঁর যে পদমর্যাদা ছিল, সেটা বহাল রাখা হয়। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর কোনও সন্ন্যাসীকে এই সুযোগ দেওয়া হয় না। আশ্রম ছাড়ার পর তিনি স্বাধীনভাবে বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারেন। যে-সব সন্ন্যাসী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া মেয়েদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তাঁদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছায় একাকী জীবন-যাপন করা সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছে সময় খুব দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে। অবসর সময়টা পড়াশোনা আর ঘোরাঘুরি করে কাটাচ্ছি। কাজের জন্য আফশেনেইটর আর আমি একসঙ্গে থাকতে না পারলেও, প্রতিদিনই ওর সঙ্গে দেখা হচ্ছে আমার।

এ-সময় আমরা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ভাগাভাগি করি। যে কাজে ব্যস্ত আছি সেটা আমাদের দুজনের কাউকেই পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারছে না। সময়টাকে কীভাবে আরও ভালোভাবে কাজে লাগানো যায় সে ব্যাপারে ওর সাথে আলোচনা হয় আমার। লাসায় আসার সময় দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের মতো পুরো তিব্বত জুড়ে এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে যেতে হয়েছে আমাদের। কাজেই তিব্বত সম্পর্কে আমাদের চেয়ে ভালো আর কে জানবে! বাজি রেখে বলতে পারি এর আগে কোনও ইউরোপিয়ান তিব্বতকে এভাবে জানার সুযোগ পাননি।

একদিন কথায় কথায় ওর একটা সুপ্ত বাসনার কথা জানাল আফশেনেইটর। তিব্বতে ন্যামটেসো নামে একটা দেশীয় সাগর আছে। সেখানে পুরো একবছর থাকার সাধ হয়েছে আফশেনেইটরের। ওর খুব ইচ্ছে ওই সাগরের স্রোত নিয়ে গবেষণা করবে।

লাসায় আসার পর প্রথম প্রথম যে অনুভূতি ছিল সেটা ধীরে ধীরে ম্লান হতে শুরু

BanglaBook.org

করেছে। তবে লাসায় আসা এবং এখানে থাকতে পারা যে বিরল একটা সৌভাগ্য, সেটা আমরা মুহূর্তের জন্য ভুলে যাচ্ছি না।

বিভিন্ন দেশ থেকে আসা চিঠি অনুবাদ করার সরকারী কাজ পেয়েছি আমরা। বিভিন্ন পেশার মানুষের চিঠি আসে আমাদের কাছে। বেশিরভাগ মানুষ তিব্বতে ঢোকার জন্য আবেদন করেন। অনেকে আবার তিব্বতে থাকার সুযোগ পাওয়ার বিনিময়ে সরকারী কাজও করে দিতে চান। কিন্তু এদের কারও চিঠির কোনও উত্তর দেওয়া হয় না।

কর্তৃপক্ষ আর যাতেই রাজি হোক, বাইরের কাউকে তিব্বতে ঢুকতে দিতে নারাজ। তিব্বত যে একটা নিষিদ্ধ দেশ, সেটা সবাইকে বোঝাবার জন্য এই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের কখনও কোনও পরিবর্তন করা হয়নি, হবেও না।

তবে অসুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে তিব্বতের কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট নমনীয়। যক্ষা রোগে আক্রান্ত অনেকেই তিব্বতে আসার আবেদন জানায়। আশা হিমালয়ের নির্মল বাতাসে তাদের এই মরণব্যাধি ভালো হয়ে যাবে। এ-সব চিঠির উত্তর পাঠাতে দেরি করে না কর্তৃপক্ষ। চিঠিতে দালাই লামার আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা বার্তাও থাকে। এখানেই শেষ নয়, মাঝে-মধ্যে কিছু আর্থিক সাহায্যও করা হয় আবেদনকারীকে।

লাসায় টানা পাঁচ বছর থাকা হয়েছে। এই পাঁচ বছরে যে কজন বিদেশীকে দেখেছি তাঁরা সংখ্যায় সাতজনের বেশি হবেন না।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ কার্যালয়ের সুপারিশে আমারি ডি রেইনকোট নামে একজন ফ্রেঞ্চ সাংবাদিককে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ভদ্রলোক তিন সপ্তাহ ছিলেন তিব্বতে। একবছর পর বিখ্যাত তিব্বত বিশেষজ্ঞ, প্রফেসর টুসি রোম থেকে তিব্বতে আসেন। এবার নিয়ে সাতবার তিব্বতে এলেও এই প্রথম লাসায় ঢোকার সুযোগ পান তিনি।

তিব্বতের ইতিহাস আর সভ্যতার একজন অন্যতম বিশেষজ্ঞ হিসাবে গণ্য করা হয় তাঁকে। চাইনিজ, নেপালিজ, ভারতীয় আর তিব্বতীরা তাঁদের দেশের ইতিহাস সম্পর্কে প্রফেসর টুসির জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হয়ে যান।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। একবার এক অনুষ্ঠানে তিব্বতীদের সামনে আমাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মতো একজন অসম্ভব জ্ঞানী মানুষের কাছ থেকে এরকম কথা শুনতে হবে, সেটা আমরা কল্পনায় ছিল না। পৃথিবীর আকার নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়। তিব্বতীদের বিশ্বাস পৃথিবীর আকার চেপ্টা।

প্রফেসর টুসিকে এ-ব্যাপারে সমর্থন জানাতে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। তিব্বতীদের ভুল ভাঙাবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাই আমি। বেশ কিছুক্ষণ লেকচার দেওয়ার পর তিব্বতীদের বোঝাতে পারি যে পৃথিবীর আকার গোল। আশা

BanglaBook.org

করেছিলাম প্রফেসর টুসি নিজের ভুল বুঝতে পেরে আমাকে সমর্থন করবেন।

কিন্তু সমর্থন তো দূরের কথা, উল্টো তিনি আমাকে কেমন জানি সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। অবাক হওয়ার তখনও অনেক বাকি। হঠাৎ করে বলে বসলেন তাঁর মতে বিজ্ঞানীরা এতদিন পর্যন্ত যত থিওরি আবিষ্কার করেছেন সেগুলোর সবই আবার নতুন করে গবেষণা করা উচিত। তাঁর বিশ্বাস এটা করা হলে পৃথিবীর আকারের ব্যাপারে তিব্বতীদের বিশ্বাস একসময় সত্য বলে প্রমাণিত হবে। শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম!

পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীদের এক কথায় উড়িয়ে দিলেন তিনি। তাঁর কথা শুনে তিব্বতীরা নিঃশব্দে হাসছিল। ওদেরকে আমি ভূগোলবিদ্যা পড়াই। কাজেই কার কথা বিশ্বাসযোগ্য সেটা ওরা ভালোই বুঝতে পারছে।

যাই হোক, আটদিন লাসায় থেকে তিব্বতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আশ্রম সাময়ী-তে চলে গেলেন তিনি। সেখানে কিছুদিন থেকে তিব্বত থেকে বিদায় নেন। তবে যাবার আগে পোটালা প্যালেস থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লাগে এমন কিছু নমুনা আর গুরুত্বপূর্ণ অনেক বই নিয়ে যান।

১৯৪৯ সালে লয়েল থমাস নামের একজন আমেরিকান ভদ্রলোক বেড়াতে আসেন তিব্বতে। সঙ্গে নিজের ছেলেকেও নিয়ে এসেছিলেন। পুরো এক সপ্তাহ থাকেন এখানে। সম্মান দেখিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমন্ত্রণও জানানো হয়েছিল তাঁদেরকে। এমন কি দালাই লামার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হননি তাঁরা। বাবা আর ছেলে–দুজনের কাছেই সিনে ক্যামেরা থাকায় লাসার আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্যগুলো ক্যামেরাবন্দী করতে তাঁরা ভুল করেননি। বাবা পেশায় রেডিওর ধারাভাষ্যকার। কাজেই দালাই লামার সঙ্গে তাঁর কথা হওয়ার সময় ভবিষ্যতে প্রচার করার জন্য তিনি যে ওটা রেকর্ড করবেন তাতে আর অবাক হওয়ার কি আছে!

ছেলেও কোনও অংশে কম যায় না, এক্ষেত্রে বরং সে বাবাকেও ছাড়িয়ে গেছে। সবাইকে অবাক করে তাদের ভ্রমণ কাহিনির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে একটা বেস্ট সেলার লিখে ফেলল। সত্যি বলতে কি, ওঁদের ছবি তোলার আধুনিক ক্যামেরা আর অফুরন্ত ফিল্ম দেখে আমার কিছুটা ঈর্ষা হতো! ওই সময় আমি আর ওয়াংডুল্ল, দুজন মিলে একটা লিকা কিনেছিলাম। কিন্তু তিব্বতে ফিল্মের খুব অভাব থাকায় কখনওই মন ভরে ছবি তুলতে পারিনি। কীভাবে জানি না, আমেরিকান ভদ্রলোক আমার দুঃখ বুঝতে পেরেছিলেন এবং বোঝার পর আর দেরি করেননি। একদিন হঠাৎ আমাকে অবাক করে দিয়ে দুটো কালার ফিল্ম উপহার দিলেন।

BanglaBook.org

এগার

সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র

দালাই লামার একজন শ্রোতা / সেরার সন্ন্যাসীদের ষড়যন্ত্র / গৌতম বুদ্ধের স্মৃতিরক্ষার্থে ধর্মীয় উৎসব

ইতিমধ্যে বছর শেষ হয়ে এসেছে। আগেরবার শারীরিক অসুস্থতার জন্য নতুন বছরের সবগুলো অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিতে পারিনি। কিন্তু এবার সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি কোনও অনুষ্ঠানই বাদ দেবো না।

নববর্ষ উৎসবে যোগ দেয়ার জন্য লাসায় প্রায় হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে। এই বছরটাকে তিব্বতীরা 'ফায়ার-পিগ-ইয়ার' শুরুর উৎসব হিসাবে গণ্য করেছে। এবারের অনুষ্ঠানের জৌলুস আগেরবারের চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়। ঐতিহাসিক পোশাক পরা এক হাজার সৈনিকের মিছিলটাই সবচেয়ে ভালো লাগল আমার। এই পোশাক একটা ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

অনেক বছর আগে একদল মুসলিম সৈন্য লাসায় মার্চ করছিল। হঠাৎ একটা তুষারঝড় এসে পড়ায় সবাই মারা যায়। ঝড়টা তাদেরকে নিনচেনথাংলা পাহাড়ের পাদদেশে উড়িয়ে নিয়ে আসে। টন টন তুষারের নিচে চাপা পড়ে সৈনিকরা।

এটাকে লাসার একটা বিজয় ধরে নিয়ে সেই এলাকার পনপোরা তুষারে চাপা পড়ে যাওয়া সৈনিকদের সব অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে আসে। এখন নববর্ষের উৎসব এলে প্রদর্শনীর জন্য বের করা হয় ওই অস্ত্র।

মজার ব্যাপার, সে-সময় পরিবেশটা যেরকম ছিল এই মিছিলেও ঠিক সেই একই পরিবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরো ব্যাপারটা এত নিখুঁত যে দেখে মনে হচ্ছে না মিছিলটার সাজসজ্জা অনেক বছর আগের। বর্তমান সময়টা পিছিয়ে যায়নি, বরং আগের সেই সময়টাকেই যেন বর্তমানে নিয়ে আসা হয়েছে।

দুজন জেনারেল পুরো দলটাকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বারখোরের মধ্যে দিয়ে শহরের শেষ প্রান্তে একটা খোলা জায়গায় যাচ্ছে তারা। সেখানে একটা বিশাল আগুন

BanglaBook.org

জ্বালানো হয়েছে। উত্তেজনায় অধীর হয়ে হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষা করছে সেখানে।

ঘি আর খাদ্যশস্য দিয়ে কিছুক্ষণ পর পর আগুনটাকে উস্কে দেওয়া হয়। মরা মানুষের খুলি আর শয়তানের আত্মারূপী কৃত্রিম প্রতিকৃতি আগুনে ছুঁড়ে মারছেন সন্ন্যাসীরা। দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো উপভোগ করছে এই দৃশ্য।

পাহাড়চূড়া লক্ষ করে কামান দাগা চলছে। কিছুক্ষণ পর সন্ন্যাসীরা আগুনের দিকে এগিয়ে এলেন। সবচেয়ে উত্তেজনাকর মুহূর্ত এটা। এরপর সন্ন্যাসীরা তাঁদের সেই উদ্ভট নাচ শুরু করলেন। এতক্ষণ দর্শকরা চুপচাপ অনুষ্ঠান দেখছিল। কিন্তু সন্ন্যাসীরা নাচ শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও চিৎকার শুরু করল। এটা তাদের কাছে একটা আনন্দের ব্যাপার।

১৯৪৯ সালে জার্মান অভিযাত্রীদের একমাত্র যে দলটি তিব্বতে এসেছিল তার সদস্যরা নববর্ষের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পুরোহিতদের ছবি তোলার কারণে পুলিশ তাদেরকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল। কোনওমতে অকুস্থল থেকে পালাতে পেরেছিল তারা। পুলিশ বাহিনী কোনও রাজনৈতিক কারণে তাদেরকে পাথর মারেনি। এর মূলে ছিল ধর্মান্ধ তিব্বতীদের কুসংস্কার।

এই কুসংস্কারের কারণে তিব্বতে প্রায়ই এই ধরনের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা শোনার পর দালাই লামার ছবি তোলার সময় আমি খুব সতর্ক হয়ে যাই। ছবি তোলার জন্য উত্তেজনাকর মুহূর্ত দরকার। আর লাসায় এই একটা জিনিসের কোনও অভাব নেই।

একদিন হঠাৎ করে পোটালা প্রাসাদের কিছু কর্মকর্তা আমাদেরকে জানালেন নববর্ষের উৎসবে দালাই লামা আমাদেরকে দাওয়াত করেছেন। দালাই লামাকে সামনাসামনি অনেকবার দেখেছি আমরা। শুধু তাই নয়, মিছিলের সময় তিনি আমাদেরকে দেখে হেসে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আমরা তাঁর অপরিচিত নই। তবুও পোটালায় তাঁর প্রাসাদে যাওয়া আমাদের জন্য খুবই রোমাঞ্চকর। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এই দাওয়াত আমাদের জন্য বিশেষ কিছু বয়ে আনবে। পরে বুঝতে পেরেছি আমরা ধারণা ভুল ছিল না। কারণ দাওয়াতটা ছিল আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা শুরুর প্রথম ধাপ।

ফারকোট পরে রওনা হলাম আমরা। দালাই লামাকে উপহার দেওয়ার জন্য সবচেয়ে দামী চাদর নিয়ে যাচ্ছি। তাঁর প্রাসাদটা পাহাড়ের ওপরে।

জমকালো পোশাক পরা সন্ন্যাসী, যাযাবর আর মহিলাদের ভিড়ে মিশে গেছি আমরা। সবাই খুব হাসিখুশি আর প্রাণচঞ্চল। পাহাড় বেয়ে যতই ওপরে উঠছি, নিচের শহরটাকে ততই সুন্দর দেখাচ্ছে। ওপর থেকে শহরের বাগান আর ভিলার মতো বাড়িগুলো দেখে আমরা মুগ্ধ। আরও কিছুক্ষণ ওঠার পর রাজপ্রাসাদের মূল গেটে প্রবেশ করলাম।

অন্ধকার একটা করিডোর দিয়ে এগোচ্ছি। দেয়ালে রক্ষাকারী দেব-দেবীর অদ্ভুত

BanglaBook.org

সব ছবি ঝোলানো। করিডোরটা অনেকগুলো বিল্ডিঙের গ্রাউন্ড ফ্লোর হয়ে একটা উঠানের দিকে চলে গেছে। সেখানে খাঁড়া করে অনেক লম্বা মই রাখা। মই বেয়ে উঠতেই একটা ফ্ল্যাটের ছাদে চলে এলাম আমরা।

খেয়াল করে দেখলাম অতিথিরা খুব সাবধানে আর নিঃশব্দে মই বেয়ে ওপরে উঠছে। মানুষের ভিড়ে গিজ গিজ করছে ছাদ। নববর্ষে দালাই লামার কাছ থেকে আশীর্বাদ নেওয়ার অধিকার সবার আছে। কেউ এই সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না।

ছাদে কয়েকটা ছোট বিল্ডিং আছে। সেগুলোর ছাদ আবার সোনার রং দিয়ে গিলটি করা। এ-সব বিল্ডিংই দালাই লামার অ্যাপার্টমেন্ট। সন্ন্যাসীরা পথ দেখিয়ে একটা গেটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সবাইকে। পিছনে ভক্তদের বিশাল লাইন। সন্ন্যাসীদের ঠিক পিছনেই আছি আমরা।

আরও কিছুদূর এগিয়ে দর্শকদের হলে ঢুকলাম। আমার চোখ দুটো জীবন্ত গৌতম বুদ্ধকে এক পলক দেখার জন্য অসংখ্য মানুষের ভিড়ে তল্লাশি শুরু করল। তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতে বুঝলাম তিনিও আমাদের দেখা পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এর-ওর কাছ থেকে আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছেন তিনি। বোধহয় সেজন্যই আমাদের ব্যাপারে তাঁর এত আগ্রহ।

কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে সিংহাসনে বসে আছেন দালাই লামা। ভঙ্গিটা অবিকল গৌতম বুদ্ধের মতো। সিংহাসনটা সোনার কারুকাজ করা কাপড় দিয়ে ঢাকা। এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে লাইন ধরে এগোতে থাকা ভক্তদের আশীর্বাদ করছেন তিনি। সিংহাসনের নিচে টাকার ব্যাগ, রেশমি কাপড় আর কয়েকশ' সাদা চাদর পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আছে। আমরা জানি দালাই লামাকে সরাসরি চাদর দেওয়ার নিয়ম নেই। একজন মঠাধ্যক্ষ আমাদের কাছ থেকে এগুলো নিয়ে যাবেন।

লাইন ধরে এগোচ্ছি আমরা। ইতিমধ্যে দালাই লামার অনেক কাছে চলে এসেছি। আর একজনের পরেই আমার পালা। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নোয়াবার সময় চোখ তুলে একবার তাঁকে কাছ থেকে দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না।

কৈশোরসুলভ অকৃত্রিম হাসিতে তাঁর মুখটা জ্বলজ্বল করছে। আশীর্বাদ করার জন্য ডান হাতটা এক মুহূর্তের জন্য আমার মাথার ওপর রাখলেন তিনি। এরপর সবকিছু খুব দ্রুত ঘটে গেল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য দালাই লামার পাশে বসে থাকা প্রশাসকের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা। কী কারণে জানি না তিনিও আমাদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। গলায় মন্ত্র পরা লাল চাদর পরিয়ে দিলেন একজন মঠাধ্যক্ষ। তারপর আমাদেরকে অবাক করে দিয়ে কুশনে বসার প্রস্তাব রাখলেন তিনি।

কিছুক্ষণ পর ভাত আর চা দেওয়া হলো। নিয়ম অনুসারে সৃষ্টিকর্তাকে উপহার দেওয়ার জন্য ফ্লোরে কিছু খাদ্যশস্য ছুঁড়ে মারলাম।

এক কোণে বসায় অনুষ্ঠানের কোনও কিছুই আমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

ভক্তদের লাইন ছোট হওয়া তো দূরের কথা, বরং আরও বড় হচ্ছে সেটা। দালাই লামার আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য সবাই ব্যাকুল। আশীর্বাদ নেওয়ার সময় তারা নিজেদেরকে অদ্ভুতভাবে উপস্থাপন করছে। আনুগত্য প্রকাশের জন্য মাথা নোয়াবার সময় জিভ বের করছে প্রত্যেকে।

মুখ তুলে দালাই লামার দিকে তাকাবার সাহস পাচ্ছে না কেউ। সবাই কিছু না কিছু উপহার নিয়ে এসেছে। কারও হাত খালি নেই। রঙ উঠে যাওয়া একেবারে জীর্ণ চাদরও নিয়ে এসেছে কয়েকজন। তবে এমন তীর্থযাত্রীর সংখ্যাও অনেক, দুহাত ভরে উপহার নিয়ে এসেছে দালাই লামার জন্য ।

উপহার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা খাতায় টুকে রাখছে কোষাধ্যক্ষ। বাসার কাজে ব্যবহার করা যায় এমন উপহারগুলো পোটালায় রেখে দেওয়া হয়। উপহার হিসাবে অনেকেই দালাই লামাকে টাকাও দেয়। এই টাকা দালাই লামার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই বিশাল সম্পত্তি রাখা হয় সোনা আর রূপা দিয়ে বানানো ঘরে। উত্তরাধিকার সূত্রে এ-সব সম্পত্তির মালিক হয় গৌতম বুদ্ধের প্রতিনিধিরা।

দালাই লামার কাছ থেকে আশীর্বাদ পেয়ে অনেক ভক্ত হাতে যেন চাঁদ পেয়ে যায়। তাদের কাছে এটা জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। অনেকে কয়েকশ' মাইল পথ পাড়ি দিয়ে দালাই লামার আশীর্বাদ নিতে আসে। এই বিশাল পথ পাড়ি দিতে অনেকের কয়েক মাস সময় লেগে যায়।

দীর্ঘ ভ্রমণে ঠাণ্ডা আর খাবারের অভাবে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে যেভাবেই হোক, সবকিছু তুচ্ছজ্ঞান করে পোটালার রাজপ্রাসাদে ঠিকই পৌঁছে যায় তারা। এত কষ্ট সহ্য করে প্রাসাদে আসার পর একটা জীর্ণ সিল্কের চাদর দেওয়া হয় তাদেরকে। আমার মনে হয় দালাই লামার প্রতি তাদের এই ভালোবাসার পুরস্কার হিসাবে উপহারটা খুবই অপ্রতুল। তবে চাদরটা যখন তাদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় তখন তারা আনন্দের অতিশয্যে পথকষ্টের কথা ভুলে যায়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লকেট কিংবা ওয়ালেটে সেলাই করেও চাদরটা নিজেদের কাছে রাখে তারা। তাদের ধারণা, এটা সঙ্গে থাকলে অশুভ কিছু ছুঁতে পারবে না। সবাইকে এক ধরনের চাদর দেওয়া হয় না। পদমর্যাদা অনুসারে চাদরের ধরনও পাল্টে যায়। প্রত্যেকটা চাদরে তিনটে করে গিঁট দেওয়া আছ। মনে করা হয় এই গিঁটগুলো আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন। এই গিঁট দেওয়ার কাজ করে সন্ন্যাসীরা। তবে মন্ত্রী কিংবা উঁচু পর্যায়ের কোনও মঠাধ্যক্ষদের যে চাদর দেওয়া হয় সেটাতে দালাই লামা নিজেই গিঁট দেন।

মানুষের ভিড়, ধূপের ধোঁয়া আর পচা মাখনের গন্ধে হলের পরিবেশ অসহনীয় হয়ে উঠছে। অনুষ্ঠান শেষ হতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম আমরা।

তীর্থযাত্রীরা সবাই চলে যাবার পর দালাই লামা সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। চাকররা তাঁকে ব্যক্তিগত অ্যাপার্টমেন্টের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে

BanglaBook.org

সঙ্গে আমরাও দাঁড়িয়ে তাঁর উদ্দেশে মাথা নত করলাম।

হল ছেড়ে বেরিয়ে আসব, এ-সময় একজন সন্ন্যাসী আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে একশ' স্যাঙের নোট দিয়ে বলল, 'গাইলাপো রিমপোচি কি সোরি রি'—'দালাই লামার পক্ষ থেকে দেওয়া উপহার।'

এবার আমাদের অবাক হওয়ার পালা। যখন শুনলাম লাসায় আমরাই প্রথম এই ধরনের পুরস্কার পেয়েছি তখন আমাদের বিস্ময় আর আনন্দের সীমা থাকল না। এই বিশেষ পুরস্কারের কথা আমরা কাউকে বলিনি, অথচ পরে বুঝতে পেরেছি প্রাসাদে আমাদেরকে যে বিশেষ সম্মান জানানো হবে এটা লাসার সবাই জানত।

সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে বহু বছর এই নোটটা আমরা রেখে দিয়েছিলাম। তিব্বত ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আমরা নিজেদের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি যে নোটগুলো সত্যি সৌভাগ্যের প্রতীক।

হল থেকে বের হলাম আমরা। তারপর তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে পোটালা রাজপ্রাসাদের পবিত্র জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম। পৃথিবীতে যত বিস্ময়কর দালান আছে, পোটালা তাদের মধ্যে অন্যতম।

রাজপ্রাসাদের এখনকার যে চেহারা সেটা তিনশ' বছর আগে পঞ্চম দালাই লামার সময়ে তৈরি করা হয়েছিল। এর আগে এখানে দুর্গ ছিল। আর সেই দুর্গের মালিক ছিলেন তিব্বতের রাজারা। পরে মোঙ্গলিয়ানদের আক্রমণে দুর্গটা ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর শ্রমিকদের দিয়ে জোর করে এখানে বিশাল বিশাল সব পাথর আনা হয়। দক্ষ মিস্ত্রীদেরকে দিয়ে পাথরগুলো ভাঙা হয় কোনও যন্ত্রপাতি ছাড়াই। এই পাথর দিয়েই খাড়া বিশাল দালান তৈরির কাজ শুরু করা হয়।

এ-সময় হঠাৎ পঞ্চম দালাই লামা মারা যাওয়ায় দালানের কাজ চিরতরে বন্ধ হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। কিন্তু প্রশাসক দালান বানাবার অসম্ভব কাজটা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। জানতেন পঞ্চম দালাই লামার মৃত্যু সংবাদ জানানো হলে দালানের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তাই মৃত্যুসংবাদটা প্রচার না করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

প্রথমে ঘোষণা করা হলো দালাই লামা খুব অসুস্থ। অসুস্থতার জন্য ধ্যানের জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেছেন।

দালানের কাজ শেষ হতে দশ বছর সময় লেগেছিল, এই দশ বছর জনগণকে অন্ধকারে রেখেছিলেন প্রশাসক। এটা অবশ্যই জনগণের সঙ্গে প্রতারণার সামিল। তবে আজ অদ্ভুত সুন্দর এই রাজপ্রাসাদটার দিকে তাকালে প্রশাসকের সেই অপরাধকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে কারুরই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

বেশ কয়েকটা মন্দির দেখবার পর প্রাসাদের পশ্চিম দিকে চলে এলাম আমরা। এখানে দুশ' পঞ্চাশজন সন্ন্যাসী থাকেন। প্রাসাদের এই অংশটাকে বলা হয়

BanglaBook.org

নামগায়ত্রাতসং। অসংখ্য বাঁক আর প্যাসেজ, সেগুলো খুব সঙ্কীর্ণ হওয়ায় কোনও ইউরোপিয়ানের চোখে নামগায়ত্রাতসং আকর্ষণীয় কিছু নয়।

তবে এটার ছোট জানালাগুলো দিয়ে বাইরে তাকালে মনের সব বিষণ্ণতা আর হতাশা মুহূর্তে গায়েব হয়ে যায়। এখান থেকে এলোমেলো, অনিয়মে তৈরি লাসার বাড়িগুলো চোখে পড়ে। ওপর থেকে শহরটাকে খুব সুন্দর দেখায়। সুন্দর লাগার অন্যতম কারণ লাসার ধুলোয় ভরা সরু রাস্তাগুলো দেখা যায় না এত ওপর থেকে।

পোটালা রাজপ্রাসাদে আমার কিছু বন্ধু আছে। তাদের অতিথি হিসাবে প্রাসাদে থাকার সুযোগ পাচ্ছি। এই ধরনের ধর্মীয় দুর্গে থাকবার সময় যে কারও মনে হতে পারে, সে কোনও মধ্যযুগীয় জায়গায় চলে এসেছে। কারণ প্রাসাদের কোথাও আধুনিকতার এতটুকু ছোঁয়া নেই। কদাচ হয়তো বর্তমান সময়ের দু-একটা জিনিস চোখে পড়ছে।

সন্ধ্যের সময় কোষাধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রাসাদের সব গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা সেটা দেখবার জন্য প্রহরীরা পুরো প্রাসাদটা চক্কর দিয়ে বেড়ায়। তাদের হাঁক-ডাক, করিডোর ধরে এগোবার সময় ঘন্টার আওয়াজ, প্রাসাদের নীরবতা ভেঙে খান খান করে দেয়।

সবাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ায় রাতটা হয় খুব দীর্ঘ আর শান্তিপূর্ণ। নিচে শহরের জীবনযাপন আর এখানকার জীবনযাপন সম্পূর্ণ ভিন্ন। শহরের সামাজিক জীবনের যে চঞ্চলতা সেটার কোনও ছোঁয়া নেই এখানে।

এখান থেকে সামার গার্ডেনে যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পান দালাই লামা। একে প্রাসাদের এই নীরবতা, তার ওপর কাছাকাছি মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই। সব মিলিয়ে একটা শিশুর জন্য এই পরিবেশ রীতিমতো ভীতিকর। মা-বাবার কাছ থেকে শুভেচ্ছা আর শহরের খবরাখবর নিয়ে মাঝে-মধ্যে প্রাসাদে আসেন লবস্যাঙ স্যামটেন। এই সময় কিছুটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন দালাই লামা।

দালাই লামার নিজস্ব একটা হাতি আছে। তিব্বতে হাতি বলতে এই একটাই। নেপালের মহারাজার কাছ থেকে হাতিটা উপহার পেয়েছিলেন তিনি। দালাই লামার অনেক ধর্মীয় অনুসারী আছেন নেপালে। অনেক নেপালি তিব্বতের আশ্রমগুলোয় যাওয়া-আসা করেন। বৌদ্ধ ধর্মের ওপর তাঁদের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে।

আশ্রমে তাঁরা আলাদা একটা সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচিত, দক্ষ আর সপ্রতিভ বলে খুব সুনাম আছে তাঁদের। শ্রদ্ধা জানাতে নেপালের মহারাজা দুটো হাতি দিয়েছিলেন দালাই লামাকে। কিন্তু হিমালয়ের দুর্গম পথ পাড়ি দিতে গিয়ে তার মধ্যে মারা যায় একটা।

নেপাল থেকে লাসার দূরত্ব সাতশ' মাইল। রাস্তার সব পাথর পরিষ্কার করা হয়েছিল হাতি আনার সময়। যাত্রাবিরতিতে যেখানে যেখানে থামতে হয়েছে সেখানেই

BanglaBook.org

বিশেষ আস্তাবলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত একটা হাতি অক্ষত অবস্থায় লাসায় পৌঁছাতে পারে।

তিব্বতীরা এত বড় প্রাণী এর আগে কখনো দেখেনি। তারা হাতিটার নাম দিল 'ল্যাঙচেন রিমপোচি'। পোটালার উত্তরদিকের একটা আস্তাবলে হাতিটাকে রাখা হয়েছে। মাঝে মধ্যে অত্যন্ত দামি রেশমি ফেস্টুনে জড়িয়ে মিছিলে আনা হয় সেটাকে। মিছিলের ঘোড়াগুলো এত বড় আকারের জন্তু দেখে অভ্যস্ত নয়। তাই ঘোড়ার মালিকরা হাতিটার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলে।

নববর্ষের উৎসব এখনও চলছে। এই সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটল। হঠাৎ করেই মারা গেলেন দালাই লামার বাবা। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিব্বতীদের রীতি অনুযায়ী সবকিছুই করা হলো। সন্ন্যাসী আর ওষুধ বিশেষজ্ঞরা সব রকম প্রতিষেধক ব্যবহার করলেন। একটা পুতুল বানিয়ে জাদু করে সেটার ভিতর তাঁর অসুখটাকে ভরেও দেওয়া হলো। তারপর ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে নদীর তীরে এনে পোড়ানো হলো পুতুলটাকে।

কিন্তু সব বৃথা। আমার মতে এত কিছু না করে একজন ইংলিশ ডাক্তারকে ডাকা উচিত ছিল। তবে তিব্বতে ধর্মীয় রীতিনীতি মানার ব্যাপারে দালাই লামার পরিবারকে একটা মডেল হিসাবে ধরা হয়। তাই যত বড় বিপদই আসুক না কেন, ধর্মীয় ঐতিহ্য ভাঙা তাঁদের সাজে না।

*

১৯৪৭ সালে হঠাৎ করেই লাসায় ছোট-খাট একটা আন্দোলন শুরু হলো। সাবেক প্রশাসক, রেতিং রিমপোচি স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আবার তাঁকে ক্ষমতার লোভ পেয়ে বসেছে।

ক্ষমতায় থাকার সময় প্রশাসনের অনেকেই তাঁর ভক্ত ছিল। শুধু তাই নয়, দেশের কিছু মানুষের কাছেও তিনি খুব জনপ্রিয়।

রেতিং রিমপোচি আবার ক্ষমতায় আসতে চান, এটার জানার পর তাঁর ভক্তরা এবার মাঠে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বর্তমান প্রশাসকের বিরুদ্ধে রীতিমতো আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে তারা। রেতিংকে তারা ক্ষমতায় দেখতে চায়।

প্রশাসনের উঁচু পর্যায়ের একজন ভক্ত নিজের পরিচয় গোপন রেখে বিস্ফোরক যোগাড় করে দিল। উদ্দেশ্য বর্তমান প্রশাসক, তাগত্রা রিমপোচিকে খুন করা। কিন্তু বোমটা তাগত্রার কাছে পাঠাবার আগেই বিস্ফোরিত হয়।

সৌভাগ্যই বলতে হবে যে এতে কেউ হতাহত হলো না। কিন্তু এই বিস্ফোরণের ফলে তাগত্রার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছিল সেটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

ক্ষিপ্রতা আর দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলেন তাগত্রা। একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে একদল

BanglaBook.org

আর্মি রেতিংয়ের আশ্রমে গিয়ে তাঁকে অ্যারেস্ট করল। এদিকে এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল সেরার সন্ন্যাসীরা।

ইতিমধ্যে শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। মালপত্র সরিয়ে দোকানপাট বন্ধ করে দিচ্ছে মালিকরা। নেপালিরা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে তাদের রাষ্ট্রদূতের কার্যালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। অভিজাত পরিবারগুলো সারাক্ষণ তাদের বাড়ির সব গেট বন্ধ করে রেখেছে। নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র হাতে গেট পাহারা দিচ্ছে চাকররা। পুরো শহরে একটা থমথমে অবস্থা।

রেতিংকে গ্রেপ্তার করার ঘটনাটা আফশেনেইটরের কাছ থেকে জানতে পারলাম। সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে রেতিংয়ের বাসার দিকে যেতে দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে। তারপর আমার কাছে এসে পুরো ঘটনাটা খুলে বলেছে। দুজন মিলে সারঙের বাড়ির নিরাপত্তার দায়িত্ব নিলাম আমরা।

দেশের মানুষ রাজনৈতিক এই অস্থিরতা নিয়ে যতটা না চিন্তিত তারচেয়ে বেশি আতঙ্কিত সেরার সন্ন্যাসীদের নিয়ে। সেরায় কমপক্ষে কয়েক হাজার সন্ন্যাসী আছেন। যে-কোনও সময় শহরে এসে লুটপাট শুরু করে দিতে পারেন তাঁরা। দেশের সেনাবাহিনীর ওপর অনেকেরই কোনও আস্থা নেই। সামরিক অভ্যুত্থান লাসার ইতিহাসে অপরিচিত কিছু নয়।

সাবেক প্রশাসককে কয়েদি হিসাবে দেখা যাবে–ব্যাপারটা একই সঙ্গে উত্তেজনা, কৌতূহল আর ভয়ের একটা মিশ্র অনুভূতি সৃষ্টি করল মানুষের মনে। কিন্তু ঠিক এ-সময় জানা গেল রেতিংকে জেলখানায় নয়, বরং গোপনে তাঁকে নেওয়া হচ্ছে পোটালা রাজপ্রাসাদে। রেতিংয়ের ভক্ত সন্ন্যাসীরা ভেবেছিলেন তাঁরা তাঁদের নেতাকে জেলখানা থেকে বের করে আনবেন।

কিন্তু রেতিংকে পোটালায় নেওয়া হচ্ছে শুনে তাঁরা বিভ্রান্তিতে পড়ে গেলেন। আসলে রেতিংকে যখন গ্রেপ্তার করা হলো তখনই তাদের সব আশার গুড়ে বালি পড়ে। কিন্তু এখনও তাঁরা তাঁদের চরমপন্থী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। বেপরোয়াভাবে শহরে গোলাগুলি শুরু করেছেন।

পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে বাধ্য হয়ে শহরে বোমা ব্যবহার শুরু করল সরকার। সেরার আশ্রমে ছোট কামান দিয়ে আক্রমণ চালানো হলো। কয়েকটা বাড়ি বিধ্বস্ত হওয়ার পর অবস্থা বেগতিক দেখে রণে ভঙ্গ দিল সন্ন্যাসীরা।

সেনাবাহিনীর এই সফলতায় আবার শান্ত-স্বাভাবিক হয়ে এলো শহর। অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করাতে কয়েক সপ্তাহ খুব ব্যস্ত থাকল সরকার।

বিদ্রোহ বন্ধ হয়ে গেছে, তবে হালকা গোলাগুলি চলছে এখনও। এ-সময় খবর পাওয়া গেল সাবেক প্রশাসক মারা গেছেন। দাবানলের মতো খবরটা ছড়িয়ে পড়ল শহরে।

মরে গিয়েও তিনি এখন টক অফ দ্য টাউন। কীভাবে মারা গেছেন সে-ব্যাপারে

BanglaBook.org

নানারকম গুজব ডালপালা মেলতে শুরু করছে। অনেকেই মনে করছে কুটিল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই তাঁকে জীবন দিতে হয়েছে।

তবে বেশিরভাগ মানুষের ধারণা, তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়নি। গভীর মনোযোগ আর প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ধ্যান করে স্বেচ্ছায় তিনি পরকালে চলে গেছেন।

হঠাৎ করে তাঁর এই অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে শহরজুড়ে অবিশ্বাস্য, অসম্ভব সব গল্প ছড়িয়ে পড়ল। একবার এক তীর্থযাত্রী তাঁর মাটির পাত্রে পানি গরম করছিলেন। পানি ফোটার পর রেতিং নাকি দুই হাতে চেপে ধরে পাত্রটার মুখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন। পাত্রটা যেন মাটির নয়, নরম কোনও প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি।

যতই গুজব ছড়াক, তিনি কীভাবে মারা গেছেন সে-ব্যাপারে সরকার এখন পর্যন্ত কোনও ঘোষণা দেয়নি। আসলে কী ঘটেছে সেটা সম্ভবত হাতে গোনা কিছু মানুষ জানে।

ক্ষমতায় থাকবার সময় ভক্তর পাশাপাশি অনেক শত্রুও ছিল সাবেক প্রশাসক রেতিং রিমপোচির। সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করায় একবার এক মন্ত্রীর চোখ তুলে নেওয়া হয়। সচরাচর রাজনীতিতে যেমন উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো হয়, এক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটল। একজন মন্ত্রীর অপরাধের জন্য রেতিংয়ের যত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সবাইকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একজন কর্মকর্তা আত্মহত্যা করেন। এতদিন ধরে তিব্বতে আছি, অথচ কারও আত্মহত্যা করার ঘটনা এই প্রথম শুনলাম।

সেরার বেশিরভাগ সন্ন্যাসী চিনে পালাচ্ছে। তিব্বতে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হলেই চিনারা গায়ে পড়ে নাক গলাতে আসে। সরকার বিদ্রোহীদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল। তারপর সেগুলো বিক্রি করে দেওয়া হলো নিলামে।

রেতিংয়ের সব বাড়ি আর প্যাভিলিয়ন ভেঙে ফেলা হলো আর ফলের গাছগুলো নিয়ে যাওয়া হলো অন্য বাগানে। তাঁর দায়িত্বে থাকা আশ্রমও ভেঙে ফেলল সৈন্যরা। রেতিংয়ের সোনার কাপ আর সোনার সুতো দিয়ে ডিজাইন করা কাপড় বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হলো। সংখ্যায় ওগুলো এতই বেশি যে বাজারে নিয়ে আসতেই এক সপ্তাহ সময় লেগে গেল। কমপক্ষে কয়েক মিলিয়ন রুপি জমা হলো ট্রেজারিতে। তিব্বতে একটা মানুষ কী মাত্রায় ধনী হতে পারে সেটা বোঝার জন্য এই একটা উদাহরণই যথেষ্ট। রেতিং ছিলেন খুব সাধারণ একজন মানুষ। বাল্যকালেই তাঁকে পুনর্জন্ম লাভ করার সম্মান দেওয়া হয়। তখন থেকেই শুরু হয় তাঁর উত্থান।

BanglaBook.org

বার

সরকারি কাজ পাওয়া

গার্ডেন অব জুয়েলে / নিজের বাসা / তিব্বতের ওপর বিশ্বরাজনীতির প্রভাব / বিভিন্ন আশ্রমে দালাই লামার সাক্ষাৎ / স্কেটিং

তিব্বতী বছরের চতুর্থ মাসে গৌতম বুদ্ধের জন্ম আর মৃত্যুর স্মৃতি রক্ষার্থে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের ফলে ধীরে ধীরে সশস্ত্র বিদ্রোহের ঘটনাটা ম্লান হয়ে গেল।

তারপর হঠাৎ বসন্তকালে সরকার দাওয়াত দিল আমাদেরকে। প্রথমে বুঝতেই পারিনি কী বিরাট কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে। গোটা শহরের নকশা বানানো কি ছেলের হাতের মোয়া!

আফশেনেইটর নিজের কাজ বন্ধ করে দিয়ে আমার সঙ্গে যোগ দিল। প্রথমে দুজন মিলে শহরটা জরিপ করলাম আমরা। এখন পর্যন্ত তিব্বত শহরের কোনও নিখুঁত নকশা করা হয়নি। গত দশকে ইন্ডিয়ার কিছু সিক্রেট এজেন্ট শহরের বাড়িগুলোর স্ক্র্যাচ ম্যাপ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সেগুলো বানাবার সময় কোনও চুলচেরা হিসাব করা হয়নি। শুধু স্মৃতি থেকে যতটুকু পাওয়া যায় তা দিয়েই বানানো হয়েছে। তাই ওটা ভুলে ভরা।

যাই হোক, প্রথমে সারঙের থিওডোলাইট ব্যবহার করে পবিত্র নগরীর প্রতিটি অংশ মাপতে শুরু করলাম। খুব সকালে উঠে কাজ শুরু করতে হচ্ছে। কারণ বেলা একটু বাড়লেই কৌতূহলী মানুষের ভিড়ে কাজ করতে পারছি না। আমাদের পক্ষে এই ভিড় সামাল দেয়া অসম্ভব।

অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার দুজন পুলিশকে পাঠাল ভিড় সামলাবার কাজে। কিন্তু তারপরও কৌতূহলী মানুষ হাল ছাড়তে রাজি নয়। পথিকেরা আসা-যাওয়ার সময় উল্টো দিকে দিয়ে আফশেনেইটরের সার্ভে গ্লাসে চোখ রাখছে। এভাবে প্রতি মুহূর্তে কাজ করতে গিয়ে বাধা পাচ্ছি আমরা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় নোংরা রাস্তা দিয়ে পা টেনে টেনে এগোতে হচ্ছে। তার ওপর আবার মানুষের এই অযাচিত কৌতূহল। সব মিলিয়ে কাজটা করতে গিয়ে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে আমাদের।

পুরো শীতকালটাই ব্যস্ত থাকতে হবে সার্ভে করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

BanglaBook.org

যোগাড় করতে। বিভিন্ন ব্লকের বাড়িগুলো চিহ্নিত করতে ছাদে উঠতে হচ্ছে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আমি এক হাজার বাড়ির মালিকদের নাম যোগাড় করলাম। দালাই লামা আর গুরুত্বপূর্ণ সরকারী অফিসে পাঠাবার জন্য নকশাটা যখন বানানো হলো তখন নতুন একটা ঘরোয়া খেলা শুরু হলো তিব্বতে। নকশা পড়ার পদ্ধতি শিখে ফেলল তিব্বতীরা। সেখানে নিজেদের বাড়ি দেখে ওরা বিস্ময়ে বিমূঢ়।

নকশা বানাবার কাজটা শেষ হতেই সরকার আধুনিক ড্রেনেজ আর বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব দিল আমাদেরকে। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের কোনও পড়াশোনা নেই। তবে আফশেনেইটর অঙ্ক কষতে ওস্তাদ। এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় অঙ্কটা সে ভালোই শিখেছে। ইতিমধ্যে আফশেনেইটরকে এক মাসের বেতন দেওয়া হয়েছে।

দালাই লামার সঙ্গে দেখা করবার কয়েক মাস পরের ঘটনা। হঠাৎ একদিন মাঝরাতে আমাকে নরবুলিংকা প্যালেসে ডাকা হলো।

নদীর পানি বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে আরেকটু হলেই সেটা উপচে সামার গার্ডেন ভাসিয়ে দেবে। ওদের ধারণা আমি এই সমস্যার একটা সমাধান বের করতে পারব। এমনিতে সারা বছর শান্তই থাকে নদী, তবে মৌসুমি বৃষ্টি শুরু হলেই দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে পানি। কোনও কোনও জায়গায় নদীর পানি এক মাইল পর্যন্ত চওড়া হয়ে যায়।

নদীর কাছে গিয়ে দেখি পুরনো বাঁধটার আয়ু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। যে-কোনও সময় ভেঙে পড়বে। সঙ্গে একজন বডিগার্ড নিয়ে এসেছি আমি। আমার নির্দেশে মাটির নতুন একটা বাঁধ বানাবার কাজ শুরু করল সে। একে তো প্রচন্ড বৃষ্টি, তার ওপর যে লণ্ঠনটা সঙ্গে করে এনেছি সেটার আলো খুবই কম।

অনেক কষ্টে নতুন বাঁধ তৈরি করে পুরনো বাঁধটা মেরামত করলাম আমরা। রাতের মধ্যে ওটাতে আর ফাটল ধরবে না। সকালে বাজারে যত চটের বস্তা ছিল সব নিয়ে এলাম আমি। তারপর সেগুলোতে কাদামাটি আর ঘাসের চাপড়া ভরলাম। পাঁচশো সৈন্য আর কুলি হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে। অবশেষে পুরনো বাঁধের ফাটলের ওপর একটা শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা গেল।

এই সময় গ্যাডঙের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রককে ডাকা হয়েছিল। বাঁধের কাজ শেষ করতে বেশ কয়েক দিন সময় লাগে। এই সময় আবহাওয়া নিয়ন্ত্রক আমার প্রতিবেশী হিসাবে রাজপ্রাসাদের একটা বাড়িতে থাকতেন।

আমাদের দুজনের একটাই মিশন ছিল–যে করেই হোক বন্যা আটকাতে হবে। সৌভাগ্যই বলতে হবে, শুধু পুরোহিতের ওপর আমাদের ভরসা করতে হয়নি। ৫০০ শ্রমিকের এক হাজার হাত একসঙ্গে কাজ করায় অসম্ভব কম সময়ের মধ্যে বাঁধটা মেরামত করতে পেরেছি আমরা।

মেরামতের শেষ পর্যায়ে কোদাল দিয়ে বাঁধের ওপর মাটি ফেলছিলাম। কাজটা

BanglaBook.org

শেষ হতেই পুরোহিত টলমল পায়ে বাঁধের ওপর উঠে তাঁর উন্মত্ত নাচ শুরু করল। সেই দিনই বৃষ্টি আর বন্যা দুটোই একসঙ্গে থেমে গেল। যাই হোক, কাজটার পুরস্কার হিসাবে দালাই লামার কাছ থেকে প্রশংসা পেলাম আমরা।

এই বন্যা প্রতি বছর ভয়ংকর হয়ে ওঠে। তাই আমাকে স্থায়ী একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হলো। খুশি মনেই রাজি হলাম আমি। ভাবছি, আফশেনেইটরের সাহায্য পেলে একটা উপায় ঠিকই বের করে ফেলব। তিব্বতীরা খাড়া দেয়াল দিয়ে বাঁধ তৈরি করে। এই কারণে খুব সহজেই ফাটল ধরে যায় তাতে।

১৯৪৮ সালে, বসন্তের সময়, কাজ শুরু করলাম আমরা। বর্ষা শুরু হবার আগেই কাজটা শেষ করতে হবে। পাঁচশ' সৈনিক আর এক হাজার কুলি দেওয়া হয়েছে আমাকে। এর আগে তিব্বতে কাউকে এত শ্রমিক দেওয়া হয়নি।

শ্রমিকদের কাজ করার ব্যাপারে নতুন নীতি চালু করার প্রস্তাব দিলাম সরকারকে। যুক্তি দিয়ে বোঝালাম জোর করে কাজ না করিয়ে তাদেরকে যদি বেতন দেওয়া হয় তাহলে স্বতস্ফূর্তভাবে কাজ করবে ওরা।

আমার প্রস্তাব মেনে নিল সরকার। যার যা পাওনা সেটা দিন শেষে সবাইকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেখা গেল, বেতন পেয়ে খোশমেজাজে কাজ করছে শ্রমিকরা। তবে তাদের কাজের গতির সঙ্গে ইউরোপিয়ান শ্রমিকদের কাজের গতির তুলনা করলে বোকামি হবে। শারীরিক শক্তির দিক দিয়ে এখানকার শ্রমিকরা অনেক পিছিয়ে আছে। কীভাবে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে হয় সেটা শ্রমিকদেরকে দেখালাম আমি। আমার কাজের ধরন দেখে ওরা অবাক হয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক, মাটি খোঁড়ার সময় বাধ্য হয়ে বার বার কাজ থামিয়ে দিচ্ছে শ্রমিকরা। কেউ কোদালে কোনও পোকা দেখলেই চিৎকার করে উঠছে। তারপর মাটি সরিয়ে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পোকাটাকে নিরাপদ জায়গায় ছেড়ে আসছে।

তিব্বতী শ্রমিকদের কাজের গতি কম হওয়ার কারণ খাবারের স্বল্পতা। সাম্বা, মাখন দিয়ে বানানো চা আর লাল মরিচ দিয়ে মুলো–এই হচ্ছে ওদের খাবার। কাজ করবার সময় সারাদিন একটু পর পর মাখন চা খাচ্ছে ওরা। কেউ কম বা বেশি না, সবার চা ভাগ করে দেওয়া আছে। দিনের মাঝামাঝিতে সুপ দেওয়া হলো শ্রমিকদের।

সৈনিক আর শ্রমিকদের জন্য চল্লিশটা নৌকার একটা বহর দেওয়া হলো আমাকে। নৌকাগুলো ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে বানানো। স্থানীয় মাঝিরা এসব নৌকার মালিক। তারা নিজেরাই তাদের বোট তৈরি করে। পশুর চামড়া ব্যবহার করা বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলিত বিশ্বাসের পরিপন্থী। তাই চর্মশিল্পী হিসাবে তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হয়।

*

একবার দালাই লামা সামি-র আশ্রমে যাওয়ার জন্য একটা গিরিপথ পার হচ্ছিলেন। মাঝিরাও এদিক দিয়েই নদীর দিকে যায়। দালাই লামা আসবেন বলে গিরিপথটা

BanglaBook.org

পবিত্র করা হলো। তখন থেকে জায়গাটা মাঝিদের জন্য নিষিদ্ধ।

অন্য কোনও উপায় না থাকায় পিঠে নৌকা নিয়ে অনেক উঁচু আর কঠিন গিরিপথ দিয়ে যাতায়াত করতে হতো মাঝিদের। একেকটা নৌকার ওজন দুশ' পাউন্ডের বেশি তো কম নয়। আর গিরিপথগুলোর উচ্চতাও প্রায় ষোলশ' ফুট।

অযথা সময় আর শক্তির এই অপচয় থেকেই বোঝা যায় তিব্বতীদের সাধারণ জীবন যাত্রার ওপর ধর্মীয় শক্তির প্রভাব কতটুকু। পিঠে ভারী নৌকা নিয়ে তাদেরকে পা টেনে টেনে চলতে দেখে খুব খারাপ লাগে আমার। তীর ঘেঁষে, স্রোতের বিপরীতে আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে যায় তারা।

প্রত্যেক মাঝির সামনে একটা করে ভেড়া থাকে। ভেড়াগুলোকে দিক-নির্দেশনা দিতে হয় না, পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে নিজে থেকেই সামনে এগিয়ে চলে। যেন কুকুরের মত এদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। মালিক পানির কাছে যেতেই ভেড়ার পাল লাফ দিয়ে নৌকায় উঠে পড়ে।

বাঁধ বানাবার জন্য নৌকা করে কোয়ারি থেকে গ্র্যানেট আনতে হবে। স্রোতের বিপরীতে যেতে হচ্ছে, তাই কাজটা সহজ নয়। পাথরগুলো যাতে ভেঙে না যায় সেজন্য নৌকার দুপাশে বোর্ড দিয়ে মজবুত করা হয়েছে।

মাঝিদের শারীরিক গঠন খুব বলিষ্ঠ। অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় তাদেরকে বেশি মজুরি দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় সারির নাগরিকরা যেমন নিম্নশ্রেণীর বা নগণ্য হয়, এদেরকে দেখে ঠিক সেরকম মনে হচ্ছে না। নিজেদের একটা সমবায় সংঘ আছে মাঝিদের, আর সেটা নিয়ে তারা খুব গর্বিত।

হঠাৎ করে, বলা যায় দৈবক্রমে ঠিক করা হলো টেরাডুনের পনপো আমার কাজে সহযোগিতা করবেন। তাঁর কাজ প্রতিদিন দুপুরে সবাইকে মজুরি দেওয়া। সময় পেলেই আমরা দুজন পুরনো দিনের গল্প করছি। টেরাডুনের থাকবার সময় খুব খারাপ সময় গেছে আমার। এখন আমি সে-সব দিনের কথা মনে করে হাসতেই পারি।

তাঁর সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তিনি কী একটা পরিদর্শনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে বিশজন চাকর ছিল। আমাদের সঙ্গে ঠিক একজন বন্ধুর মতো আচরণ করেছিলেন তিনি। কে ভেবেছিল, একদিন দুজন একসঙ্গে কাজ করব আমরা আর আমি হব তাঁর চিফ?

একটা ব্যাপার ভেবে সত্যি খুব অবাক হয়ে যাই আমি। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছে চার বছর আগে। কীভাবে এত দ্রুত চারটা বছর কেটে গেল কে জানে! এই চার বছরে আমি পুরোপুরি না হলেও আধাআধি তিব্বতী হয়ে গেছি। একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারি নিজের অজান্তেই আমি তিব্বতীদের মতো অঙ্গভঙ্গি করছি। দিনের মধ্যে কম করে হলেও একশ'বার নিজের এই পরিবর্তন চাক্ষুষ করি আমি।

আমার কাজ দালাই লামার বাগান রক্ষা করা। আমি যেমন অনেক লোকের চিফ,

BanglaBook.org

ঠিক তেমনি আমারও অনেক চিফ আছেন। তাঁরা হলেন উঁচুস্তরের সন্ন্যাসী।

সরকার আমার কাজটাকে অনেক গুরুত্ব দিচ্ছে। সেক্রেটারি আর চাকরবাকরদের নিয়ে প্রায়ই পুরো কেবিনেট আসছে আমাদের কাজ দেখতে। প্রশংসা তো পাচ্ছিই, সেই সঙ্গে উপহার হিসাবে দামি চাদর আর টাকাও দেওয়া হচ্ছে আমাদের দুজনকে। শুধু আমাদেরকে নয়, কেবিনেট মিনিস্টাররা এলে শ্রমিকদেরকেও পুরস্কার হিসাবে টাকা দেওয়া হয়। সেদিন আধ বেলা ছুটি ঘোষণা করায় শ্রমিকরাও একটু বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পায়।

জুন মাসে আমার বাঁধ শেষ হলো। বলা যায়, একেবারে সময় মতোই কাজটা শেষ হয়েছে। আর কিছুদিন পরই বন্যা শুরু হবে।

বন্যা শুরু হতে বুঝলাম এবার আগের চেয়ে অনেক উঁচুতে উঠছে নদীর পানি। কিন্তু বাঁধগুলো ঠিকমতোই কাজ করছে। যে জায়গা প্রতিবছর বন্যার পানিতে ভেসে যেত সেখানে উইলো বুনলাম আমরা। উইলো গাছের সবুজ পাতা বাড়তি সৌন্দর্য যোগ করল সামার গার্ডেনে।

জুয়েল গার্ডেন রক্ষা করার জন্য বাঁধের কাজ করার সময় উঁচু পর্যায়ের কর্মকর্তারা আমাকে প্রায়ই সাপারের দাওয়াত দিতেন। শুধু সাপার খাইয়েই তাঁরা ক্ষান্ত হননি। রাতে রাজপ্রাসাদে থাকারও প্রস্তাব দিয়েছেন। আমিই প্রথম ইউরোপিয়ান যাকে সামার গার্ডেন আর রাজপ্রাসাদে থাকার অনুমতি দিয়েছেন তাঁরা। যার ফলে বাগানের অদ্ভুত সুন্দর ফলের গাছ আর কনিফারের প্রশংসা করার সুযোগ পেয়েছি আমি।

পার্কের মাঝখানে জীবন্ত গৌতম বুদ্ধের নিজস্ব বাগান আছে। পুরো বাগানটা একটা উঁচু হলুদ রঙের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বাগানের দুটো গেট। দুটো গেটেই সবসময় কড়া পাহারা থাকে গার্ডদের। ক্যাবিনেট মিনিস্টারদেরও এখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না। চেষ্টা করলে বাইরে থেকে, পাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে মন্দিরের সোনার ছাদ এক পলকের জন্য দেখা সম্ভব।

তবে ময়ূরের ডাক ছাড়া ভিতর থেকে আর কোনও আওয়াজ বাইরের মানুষ শুনতে পায় না। কেউ জানে না ভিতরের পবিত্র জায়গাটাতে কি হচ্ছে না হচ্ছে। বাইরে থেকে শুধু দেয়াল দেখবার জন্য অনেক তীর্থযাত্রী এখানে আসে। ওয়াল ধরে ঘড়ির কাঁটার মত বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে তারা। কিছুদূর পর পর দেয়ালের ওপাশে কুকুরদের থাকার জন্য ঘর বানানো হয়েছে। লম্বা লোমওলা হিংস্র কুকুরগুলো কাউকে কাছে আসতে দেখলেই ঘেউ ঘেউ শুরু করে।

প্রতি বছর বাগানের বাইরে বিশাল একটা পাথরের স্টেজে নাটকের আয়োজন করা হয়। এ-সময় নাটক দেখার জন্য প্রচুর মানুষ ভিড় করে এখানে। অনুষ্ঠানটা এক সপ্তাহ ধরে চলে। নাটক শুরু হয় সূর্য ওঠার সময়, আর শেষ হয় সূর্যাস্তের পর। পুরুষ অভিনেতাদের কয়েকটা দল সবগুলো নাটকের মূল চরিত্রে অভিনয় করে। বেশিরভাগ

BanglaBook.org

চরিত্রই ধর্মীয়। অভিনেতারা কেউই দক্ষ নয়। তারা একেক জন একেক পেশার মানুষ।

পুরো সপ্তাহজুড়ে অভিনয় করে নিজেদের পেশায় ফিরে যায় তারা। একই নাটক দেখানো হচ্ছে বছরের পর বছর। সংলাপগুলো গান গাওয়ার মতো, সুর করে আবৃত্তি করা হয়। সেই সঙ্গে ড্রাম আর বাঁশীর ছন্দে শুরু হয় নাচ। চমৎকার কস্টিউমগুলো সরকারের সম্পত্তি। অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সামার প্যালেসে রাখা হয় ওগুলো।

অভিনেতাদের মোট সাতটা দল আছে। তার মধ্যে গাইয়ামালুঙ্গার জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। শুধু এই গ্রুপটাই আমাকে মুগ্ধ করতে পারল। তাদের অভিনয়ের সহজ, স্বাভাবিক ভাব আর অকপটতা দেখে যে কেউ অবাক হবে।

নিজেদের দুর্বলতা, এমন কি ধর্মীয় আচার-আচরণ নিয়ে হাস্য-কৌতুকও করা হয় এ-সব নাটকে। এর ফলে এটাই প্রমাণিত হয় যে তারা মানসিকভাবে সুস্থ। পুরোহিতদের অনুকরণে ধ্যানমগ্ন হয়ে উন্মত্ত নাচ শুরু করে দেয় অভিনেতারা। এ-সময় জোর করতালি পড়ে। পুরুষেরা সন্ন্যাসিনীর পোশাক পরে। তারপর মেয়েদের মতো হাস্যকর ভঙ্গিতে ভিক্ষুকের অভিনয় করে।

স্টেজে যখন সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসিনীরা নিজেদের মধ্যে ফষ্টিনষ্টি শুরু করে তখন হেসে গড়িয়ে পড়ার অবস্থা হয় দর্শকদের। কেউই হাসি থামাতে পারে না। এমন কি, হাসতে হাসতে গম্ভীর মঠাধ্যক্ষদেরও চিবুক বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে তখন।

জালের মতো পরদা টাঙানো জানালার সামনে দাঁড়িয়ে একটা প্যাভিলিয়নের ফার্স্ট ফ্লোর থেকে এই অনুষ্ঠান দেখেন দালাই লামা। আর অফিসের কর্মকর্তারা স্টেজের দুই দিকে কয়েকটা তাঁবুতে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

সামার গার্ডেনে নাট্যানুষ্ঠান শেষ হবার পর অভিনেতাদের অভিজাত পরিবারের বাড়ি আর আশ্রমে অভিনয় করার আমন্ত্রণ জানানোর নিয়ম। এভাবে পুরো অনুষ্ঠান আসলে এক মাস ধরে চলে এবং যথারীতি এসব অনুষ্ঠানেও উপচে পড়ে দর্শক হয়। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রায়ই কঠিন হতে হয় পুলিশকে।

এ-বছর আর্থিক দিক থেকে শুরু করে সবকিছুই খুব ভালো যাচ্ছে আমার। আমি এখন আত্মনির্ভরশীল। থাকার জন্য নিজের একটা বাড়ি পেয়েছি, যেখানে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। সারঙ আমাদের জন্য যথেষ্ট করেছেন। তাঁর বাড়ির গেট আমাদের জন্য সবসময় খোলা। লাসায় আসার পর থাকবার জায়গা ঠিক করার ব্যাপারে তিনিই প্রথম সাহায্য করেন।

আয়-রোজগার হওয়ার পর থেকে আমি তাঁকে কিছু ভাড়াও দিয়েছি। সম্প্রতি অনেক বন্ধু আমাকে তাদের মফস্বলের বাড়ি আর বাগান ব্যবহার করার প্রস্তাব দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমার সেবা করার জন্য কিছু চাকরও দিতে চাইছে তারা।

যাই হোক, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সারঙের অনেকগুলো বাড়ির মধ্যে একটা বাড়ি পছন্দ হলো আমার। তিব্বতীদের দৃষ্টিতে এটাই শহরের সবচেয়ে আধুনিক বাড়ি। তবে

BanglaBook.org

প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি ঘর আছে এখানে।

বাড়তি ঘরগুলো তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখলাম। বেডরুমের জন্য এমন একটা ঘর বাছাই করলাম যেখানে সকালবেলা সূর্যের আলো এসে পড়ে। আমার খাটের পাশে একটা অয়ারলেস সেট আছে। দেয়ালে আঠা দিয়ে আলপ্‌স্ পর্বতমালার কিছু রঙিন ছবি টাঙিয়েছি।

ছবিগুলো একটা ক্যালেন্ডার থেকে পেয়েছি। আর ক্যালেন্ডারটা লাসায় এসেছে সম্ভবত সুইস ঘড়ির সঙ্গে। হাড়ি-পাতিল রাখার আলমারি আর সিন্দুকটা খুব সুন্দর রঙ আর খোদাই করা। আমাদের দেশে কৃষকদের বাসায় এই ধরনের আসবাব দেখা যায়। সবগুলো ঘরের মেঝেই পাথরের তৈরি। মেঝে পরিষ্কার করার কাজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করে আমার চাকর। আয়নার মতো ঝকঝক না করা পর্যন্ত থামে না।

তরল মোম দিয়ে মেঝে ঘষামাজা করার পর উলেন কাপড় দিয়ে মোছা হয়। কাজটা খুব আনন্দের সঙ্গে করে সে। প্রতি ঘরেই রঙিন কম্বলের ছড়াছড়ি। লাসার প্রায় সব বাড়ির সিলিং অনেকগুলো পিলারের ওপর থাকায় ঘরগুলোয় বড় কার্পেট রাখা যায় না। এজন্য সব কার্পেটই হয় ছোট আকারের। তাঁতীরা বাসায় গিয়ে মালিকের পছন্দ অনুসারে নির্দিষ্ট ডিজাইন আর আকারের কার্পেট তৈরি করে দেয়। ওগুলো কয়েক প্রজন্ম টেকে।

বসার ঘরে লেখার টেবিল আর বিশাল একটা ড্রইং বোর্ড আছে। লাসার স্থানীয় কাঠমিস্ত্রীরা পুরনো আসবাব মেরামতের ব্যাপারে খুবই দক্ষ। তবে নতুন কিছু বানাতে বললেই তারা বিপাকে পড়ে যায়। লাসার কোনও পেশাতেই সৃজনশীলতার তেমন ছোঁয়া নেই। স্কুল কিংবা প্রাইভেট, এন্টারপ্রাইজও এ-ব্যাপারে কাউকে কোনও উৎসাহ দেয় না।

বসার ঘরে একটা বেদি আছে। আমার চাকররা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে ওটার যত্ন নেয়। সৃষ্টিকর্তার জন্য প্রতিদিন সাতটা গামলায় পানি ভরা হয় আর বাটার ল্যাম্প কখনওই নেভানো হয় না। বেদির ওপর রাখা মূর্তিগুলোর মাথায় এক ধরনের মুকুট আছে। মুকুটটা খাঁটি সোনা আর রত্নখচিত। আমি সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতাম এই বুঝি জিনিসগুলো চুরি হয়ে যায়। তবে ভাগ্যক্রমে কিছু বিশ্বস্ত চাকর পেয়েছি আমি।

বাড়ির ছাদে চারকোণায় চারটা গাছ। এ-সব গাছে প্রার্থনা পতাকা টাঙানো থাকে। একটা গাছে অয়ারলেসের এরিয়াল বসালাম আমি। ধূপ ছাড়াও সৌভাগ্য বয়ে আনে এমন আরও কিছু আনুষঙ্গিক জিনিস পোড়াতে হয় বলে তিব্বতের প্রত্যেক বাড়িতেই স্টোভ আছে। বাড়ির সবকিছু নিয়ম অনুযায়ী চলছে কিনা সে ব্যাপারে সবসময় কড়া নজর রাখতে হচ্ছে আমাকে।

তিব্বতীদের জাতীয় প্রথা, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি ব্যাপারেও আমাকে সতর্ক থাকতে হচ্ছে। বলা যায়, আমার পুরোপুরি তিব্বতী হয়ে যাওয়ার রাস্তাটা আরও প্রশস্ত

BanglaBook.org

হচ্ছে দিন দিন।

টুকটাক কিছু জিনিস ঠিক করার পর বাড়িটা সম্পূর্ণ বলে মনে হলো আমার। কাজ শেষে কিংবা কারও সঙ্গে দেখা করবার পর বাসায় ফেরার সময় সত্যি খুব ভালো লাগে। চাকর নাইমা গরম পানি আর চা নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষায় থাকে।

বাড়ির সবকিছুই খুব পরিপাটি, ছিমছাম আর সাজানো গোছানো। তবে এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সবটাই আমি উপভোগ করতে পারছি না। নাইমার কারণে কিছুটা প্রাইভেসি নষ্ট হচ্ছে আমার। তিব্বতের চাকররা মালিকের সেবা করার জন্য সবসময় একপায়ে খাড়া থাকে। এটা ওদের অভ্যাস। মাঝে মাঝে হঠাৎ কোনও কিছু বুঝতে না দিয়ে ঘরে ঢুকে চা ঢালা শুরু করে দেয়।

এমনিতে নাইমা আমার সব কথাই শোনে। কিন্তু যেভাবে সে আমার সঙ্গে ছায়ার মত লেগে আছে, সেটা সত্যি খুব অস্বস্তিকর। রাতে আমি কারও বাসায় গেলে আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে সে। তারপর যতক্ষণ না আমি ওই বাসা থেকে বের হই ততক্ষণ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। এমন কি মানা করলেও শোনে না। তার ভয় বাসায় ফেরার পথে আমার ওপর হামলা হতে পারে। এই কারণে নিজের সঙ্গে একটা রিভলভার আর তলোয়ার রাখে সে। তাকে দেখে মনে হয় সে আমার জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়ার অপেক্ষায় আছে। তার এই ভক্তিতে আমি কিছুটা বিরক্ত হই, তবে বুঝি যে এতে আমার রাগ করা সাজে না।

চাকরের কাছ থেকে ছেলেমেয়েদের প্রতি তিব্বতী মা-বাবার ভালোবাসার ধরন সম্পর্কে জানতে পারলাম আমি।

একবার নাইমার এক ছেলে অসুখে পড়ল। শহরের সবচেয়ে ভালো লামাকে আনতে চাইলে বেশ খরচ হবে। ছেলের অসুখ সারাবার জন্য নাইমা অতিরিক্ত খরচ করার পক্ষপাতী নয়।

চাকররা যাতে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে সেজন্য আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করি। কারণ আমার আশেপাশে যারা থাকে তাদের সবার হাসিমুখ দেখতে চাই আমি। ভ্যাকসিন আর সুচিকিৎসা নেওয়ার জন্য তাদেরকে ইন্ডিয়ান ফরেন মিশনে পাঠাই। তবে তারা তাদের উঠতি বয়সি ছেলেমেয়েদের অসুখের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন থাকে। এব্যাপারে সবসময় তাদের পিছনে লেগে থাকতে হয় আমাকে।

ব্যক্তিগত চাকরকে আমি মাসে পাঁচ পাউন্ড দিই। কিছুদিন পর সরকার একজন বার্তাবাহক আর একজন সহিস পাঠালেন আমার জন্য। নরবুলিংকায় কাজ করবার সময় থেকে ঘোড়ার চড়ার সুযোগ পাচ্ছি আমি। প্রয়োজন হলেই রাজকীয় আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিই।

একটুও বানিয়ে বলছি না, একেক দিন আমাকে একেক ঘোড়ায় চড়তে হয়। কারণ আস্তাবল যিনি দেখাশোনা করেন তিনি চান না কোনও ঘোড়াকে অতিরিক্ত কাজ করানো

BanglaBook.org

হোক। কোনও ঘোড়া যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে সেজন্য তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হতে পারে।

একেক দিন একেক ঘোড়াকে নিয়ে বের হওয়া যে কতটা বিরক্তিকর সেটা কাউকে বলে দিতে হয় না। ঘোড়াগুলো চলতে চলতে হঠাৎ থেমে ঘাস খেতে শুরু করে। তারপর সরু রাস্তায় এসে ট্রাফিক জ্যাম থেকে শুরু করে যা কিছু দেখে সবকিছুতে ভয় পায়।

অনেক কষ্টে সপ্তাহে একটা ঘোড়া নেওয়ার ব্যবস্থা করলাম আমি। আগের মতো আর প্রতিদিন ঘোড়া পরিবর্তন করতে হয় না। এখন মোট তিনটে ঘোড়াকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করি। কিছুদিন পর ঘোড়াগুলো আমার সাহচর্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠল।

আমার বাড়ির সামনে একটা বাগান আছে। ওখানেই আস্তাবল, রান্নাঘর আর চাকরদের থাকার জায়গা। বাগানটা বেশ বড়ই। বিভিন্ন ফুল আর শাকসবজির বীজ বুনলাম। লনে ব্যাডমিন্টন আর কোকেই খেলার জায়গাও আছে। সেখানে পিং-পং খেলার একটা টেবিল বসিয়েছি আমি।

ছোট্ট একটা গ্রিন হাউজে কিছু শাকসবজির চাষ করলাম। এই বছরই এ-সব শাকসবজি আমার খাদ্যতালিকায় জায়গা করে নিল। যারা দেখা করতে আসছে তারা সবাই আমার চাষাবাদ দেখে প্রশংসা না করে পারছে না।

বাগান করতে গিয়ে মিস্টার রিচার্ডসনের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটা আমাকে জানালেন তিনি। সকাল দুপুর নেই, সারাদিনই আমি বাগান নিয়ে ব্যস্ত আছি। কিছুদিন পর এই পরিশ্রমের ফল পেলাম। প্রথম বছরেই টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি আর লেটুস পাতা–সবই খুব দ্রুত বড় হচ্ছে।

সবচেয়ে বড় কথা সবজিগুলোর আকার অতিরিক্ত বড় হলেও স্বাদে কোনও হেরফের নেই। এর জন্য আমাকে অবশ্য খুব একটা মাথা ঘামাতে হয়নি। ব্যাপারটা খুব সহজ। মূল ব্যাপার হচ্ছে শিকড়ে ঠিকভাবে পানি যাচ্ছে কিনা সেটা দেখা। শুকনো বাতাস আর সূর্যের উষ্ণতা পুরো ঘরে একটা উত্তাপ সৃষ্টি করে। যার ফলে সবকিছুই খুব দ্রুত বেড়ে ওঠে, আর সেই সঙ্গে সবজির মানও হয় খুব ভালো।

তবে প্রেশার পাইপ না থাকায় জলসেচ করতে অনেক সমস্যা হচ্ছে। বাগানে পানি ছিটাবার জন্য হোস পাইপও ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এখানে এমনভাবে বীজ বুনতে হবে যাতে পানির ছোট একটা নদী বাগানের সব জায়গায় পৌঁছাতে পারে। একার পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় আগাছা পরিষ্কার করার জন্য দুজন মহিলাকে রাখলাম। আগাছাগুলো খুব দ্রুত বেড়ে ওঠায় সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। সবদিকে সতর্ক দৃষ্টি আর কঠোর পরিশ্রম করায় শাকসবজির মতো ফুল আর ফলেরও বাম্পার ফলন হলো।

সত্তর বর্গফুট জায়গাজুড়ে টমেটোর বেড় করেছি আমি। ওখান থেকে চারশো পাউন্ডেরও বেশি টমেটো পাচ্ছি। কয়েকটা টমেটোর ওজন আধ পাউন্ড। অন্যান্য

BanglaBook.org

শাকসবজিও ঠিক একইভাবে বেড়ে উঠছে। আমার ধারণা, তিব্বতে গ্রীষ্মকালটা খুব ছোট হলেও এখানে সব ধরনের ইউরোপিয়ান শাকসবজি ফলানো সম্ভব।

এই সময় বিশ্ব-রাজনীতি লাসার মতো শান্তিপূর্ণ শহরেও উত্তাপ ছড়াল। চিনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে লাসায় অবস্থানরত চিনাদের মধ্যে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। চিনের রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত লাসা, এটা বোঝাবার জন্য একদিন চিনা মন্ত্রীকে তাঁর চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিল সরকার। কমপক্ষে একশো লোক এই সিদ্ধান্তে দারুণভাবে প্রভাবিত হলো। কিন্তু এর বিরুদ্ধে আপিল করার কোনও উপায় নেই।

এরপর তিব্বতী কর্তৃপক্ষ তাদের স্বভাবসুলভ দক্ষতা আর চাতুর্যের পরিচয় দিল। লোক পাঠিয়ে ট্রান্সমিটিং সেট নিয়ে আসা হলো চাইনিজ রেডিও অপারেটরের বাসা থেকে। কিন্তু রেডিও অপারেটর ঘুণাক্ষরেও কিছু টের পেল না, কারণ তখন সে টেনিস খেলছিল।

চিনা মন্ত্রীকে তিব্বত থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে–এটা শোনার পর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল তার। বাসায় ট্রান্সমিটিং সেট না থাকায় চিনা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারল না সে। রেডিও অপারেটরের বাসা থেকে শুধু ট্রান্সমিটিং সেট নিয়ে এসেই ক্ষান্ত হয়নি তিব্বতী কর্তৃপক্ষ, দুই সপ্তাহের জন্য শহরের সব পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ অফিসও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এই অবস্থায় সবার ধারণা হলো তিব্বতেও বুঝি একটা গৃহযুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে। বহিষ্কৃত চিনা কূটনীতিকদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখানো হলো। তাঁদের বিদায় উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কূটনীতিকদের কাছে তিব্বতী যত টাকা ছিল সেগুলো নিয়ে তাঁদেরকে ইন্ডিয়ান রুপি দেওয়া হলো। বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রেও ঠকানো হচ্ছে না তাঁদেরকে। শুধু তাই নয়, বিনামূল্যে ভারতীয় সীমান্তে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হলো। আসলে কি ঘটেছে সে-ব্যাপারে তাঁদের স্বচ্ছ কোনও ধারণা নেই। তবে তিব্বত ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে সবারই মন খারাপ। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ চিন বা ফোরমাসায় ফিরে গেল। কিছু গেল সরাসরি পিকিং-এ, ওখানে মাও সেতুং ইতিমধ্যে সরকার গঠন করেছেন।

এ-সময় দুই চিরশত্রু চিন আর তিব্বতের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটল। চিনা কমিউনিস্টরা কূটনীতিক আর তাঁর স্টাফকে বহিষ্কারের ঘটনাটিকে দেখল প্ররোচনা হিসাবে। তাদের দৃষ্টিতে তিব্বত সরকার শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ করেছে। এদিকে লাসার মানুষও বুঝতে পারল লালচিনের কারণে তিব্বতের স্বাধীনতা আর ধর্মীয় ঐতিহ্য হুমকির সম্মুখীন। এ-সময় পুরোহিতদের কাছ থেকে এমন সব কথা শোনা গেল, যার ফলে আর কোনও আশাই দেখতে পেল না লাসাবাসী।

সরকার সিদ্ধান্ত নিল চারজন উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাকে ওয়ার্ল্ড ট্যুরে পাঠাবে।

BanglaBook.org

উদ্দেশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারকে তিব্বতের সংস্কৃতি এবং উন্নয়ন সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া। এতে তারা বুঝতে পারবে তিব্বত একটা সভ্য দেশ। এই কারণে কর্মকর্তা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।

এই মিশনের লিডার-শেকাবপা একজন ফাইন্যান্স সেক্রেটারি। বাকি তিনজন সন্ন্যাসী। তাঁদের মধ্যে চ্যাঙখাইম্পা আর প্যাঙড্যাটস্যাঙ, দুজনই খুব ধনী ব্যবসায়ী। সবার শেষে আছেন জেনারেল সারকাঙ। তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ছেলে। এদের মধ্যে প্যাঙড্যাটস্যাঙ এবং জেনারেল সারক্যাঙ পশ্চিমা রীতিনীতি আর তাদের অভ্যাস সম্পর্কে কিছুটা ধারণা রাখেন। তাঁরা কাজ চালাবার মতো ইংরেজিও জানেন । প্রথমে তিব্বত থেকে ইন্ডিয়ায় গেলেন তাঁরা, তারপর সেখান থেকে চিনে। চিনে কিছুদিন থাকার পর আকাশপথে ফিলিপাইন আর হাওয়াই হয়ে পৌঁছালেন সান ফ্রান্সিসকো। আমেরিকায় গিয়ে বিভিন্ন কল-কারখানায় ঘুরলেন, বিশেষ করে যে-সব কারখানায় তিব্বতী কাঁচামাল ব্যবহার করা হচ্ছে।

সচরাচর যেমন দেখা যায়, মন্ত্রী-মিনিস্টাররা বিদেশে গেলে দেশে ফেরার নাম করেন না, এক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটল। প্রায় দুবছর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ালেন চারজন। তাঁরা দেশে চিঠি পাঠালেই লাসায় একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হতো।

দেশে ফিরে এসে চার মন্ত্রী দেখলেন তিব্বতী উল কেনার জন্য অনেক নতুন ক্রেতা এসেছে। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে প্রচুর কৃষি যন্ত্রপাতি, তাঁত, কার্পেট বানাবার মেশিন, ইত্যাদি আরও অনেক জিনিসের প্রসপেক্টাস। শুধু তাই নয়, একটা জিপ গাড়ির সব পার্টস আলাদা আলাদাভাবে আনা হয়েছে।

তেরোতম দালাই লামার শোফার পার্টসগুলো জোড়া লাগাল। গাড়িটা মাত্র একবার চালিয়েই লোকচক্ষুর আড়ালে সরিয়ে ফেলা হয়। লাসায় অনেক উচ্চবিত্ত লোকজন এখনই গাড়ি চড়তে চায়, তবে দেশটার যে অবস্থা তাতে মনে হয় এখনও সে-সময় আসেনি। আমেরিকা থেকে চারজন মিনিস্টার অনেক সোনা নিয়ে এসেছেন। এগুলো আনার সময় অত্যন্ত কড়া পাহারার ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

চারজন মন্ত্রী যখন ওয়ার্ল্ড ট্যুরে, তখন এশিয়ার রাজনীতিতে বিশাল একটা পরিবর্তন হয়। ইন্ডিয়াকে একটা স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো। আর পুরো চিনে জয়লাভ করল কমিউনিস্টরা। কিন্তু এ-সব ঘটনা লাসায় খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারল না। কারণ তিব্বতীদের কাছে বিশ্ব-রাজনীতির চেয়ে দালাই লামার বিভিন্ন আশ্রমে যাওয়ার অনুষ্ঠানটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অফিসে বসার ক্ষমতা অর্জন করার আগে প্রত্যেক তরুণ দালাই লামাকে ড্রিবাঙ আর সেরার আশ্রমগুলোতে যেতে হয়। সেখানে ধর্মীয় আলোচনায় অংশ নিয়ে তাঁদেরকে প্রমাণ করতে হয়ে যে তাঁরা যথেষ্ট পরিপক্ক। ব্যাপারটা একটা পরীক্ষার মতো। পরীক্ষার প্রস্তুতি কেমন হবে, সে-ব্যাপারে মাসের পর মাস আলোচনা চলে।

BanglaBook.org

একদিন জমকালো একটা মিছিল ড্রিবাঙের আশ্রমের দিকে যাত্রা শুরু করল। চারজন বিশিষ্ট মঠাধ্যক্ষ তাদের সঙ্গী-সাথী নিয়ে মিছিলটার জন্য অপেক্ষা করছে। মিছিলটা ড্রিবাঙে পৌঁছাতেই মঠাধ্যক্ষরা দালাই লামাকে স্বাগত জানিয়ে তাঁকে রাজপ্রাসাদের দিকে নিয়ে গেলেন।

আমার কিছু সন্ন্যাসী বন্ধু আছে। তারা আমাকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এতদিন তীর্থযাত্রীদের মতো শুধু মন্দির আর বাগানগুলো দেখে আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। আজ ভিতরে ঢোকার সুযোগ পাব। আশ্রমের জীবনযাত্রা কেমন সেটা স্বচক্ষে দেখার খুব ইচ্ছে আমার।

বন্ধুরা একটা পাথুরে ঘরে নিয়ে গেল আমাকে। সেখানে আমাকে লজিং দেওয়া হলো। পিমা নামে একজন সন্ন্যাসী আমার গাইড হিসাবে কাজ করছেন। তিনি এবার ফাইনাল পরীক্ষা দেবেন। কথায় কথায় জানতে পারলাম তাঁর কিছু ছাত্রও আছে। শহরের আশ্রম আর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত জানালেন তিনি। আমাদের ইউরোপীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এগুলোর কোনও তুলনাই চলে না। মন্দির আর আশ্রমগুলোর ভিতরে ঢুকলে মনে হয় কয়েক যুগ পিছনে চলে গেছি।

বিংশ শতাব্দীর কোনও কিছুই সেখানে স্থান পায়নি। মোটা, ধূসর রঙের দেয়ালগুলো অনেক পুরনো। বাসী মাখন আর নোংরা সন্ন্যাসীদের গায়ের দুর্গন্ধ যেন পাথুরে বিল্ডিংগুলোর অনেক গভীরে ঢুকে গেছে।

প্রতিটা বাড়িতে পঞ্চাশ থেকে ষাটজন থাকে। সব ফ্লোরেই কিচেন আছে। আর যাই হোক, এখানে খাবারের কোনও অভাব নেই। বেশিরভাগ সন্ন্যাসী জাগতিক বিষয়-বস্তু নিয়ে মাথা ঘামায় না। তবে যারা বুদ্ধিমান তাঁরা পড়াশোনার মাধ্যমে নিজেদেরকে একটা ভালো অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। বাটার ল্যাম্প, অথবা একটা প্রতিমা, কিংবা খুব বেশি হলে হয়তো তাবিচ-কবজের বাক্স–এই হচ্ছে সন্ন্যাসীদের সম্পত্তি।

নিজেদের আরাম-আয়েশের কোনও ব্যবস্থাই রাখেন না তাঁরা। ঘুমাবার জন্য সাধারণ একটা খাট পেলেই হলো। ওদের জন্য সংযমী থাকাটা আইনের পর্যায়ে পড়ে। ছাত্ররা শিশু বয়সেই আশ্রমে ভর্তি হয়। তারপর কিছুদিন বাদেই মাথায় লাল টুপি পরেন তাঁরা। জীবনের বাকি সময়ও এই টুপি পরে থাকতে হয় তাদেরকে। প্রথম কয়েক বছর শিক্ষকরা তাঁদেরকে চাকরের মত খাটিয়ে নেয়। যারা বুদ্ধিমান তাঁরা খুব দ্রুত লেখা আর রিডিং পড়াটা শিখে পরীক্ষায় অংশ নেন। মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন পাস করে এক গ্রেড থেকে আরেক গ্রেডে উঠতে পারে।

বেশিরভাগ ছাত্রই তাদের চাকরের মতো জীবনকে মেনে নেন। ফাইনাল পরীক্ষায় পাস করতে হলে ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর গৌতম বুদ্ধের নির্দেশিত শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করতে হয়। এই পরীক্ষায় পাস করতে পারলে আশ্রমে উচ্চপদে চাকরি পাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে আশ্রমগুলো হাই স্কুলের ভূমিকা পালন করে। এখান থেকে যারা গ্রাজুয়েট হয়, তাদেরকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্টাফ করা হয়। সরকারের

BanglaBook.org

আশ্রম বিষয়ক কর্মকর্তারা সেডরাঙ স্কুল থেকে তাঁদের পড়াশোনা শেষ করেছেন।

আশ্রমের স্কুলগুলোতে বছরে একবার ফাইনাল পরীক্ষা হয়। পুরো তিব্বত থেকে বাছাই করা হয় মাত্র বাইশজন পরীক্ষার্থীকে। পরীক্ষার পর তাদেরও সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। ভাইভা নেন দালাই লামার শিক্ষক। সবশেষে, পরীক্ষা আর ভাইভা হওয়ার পর, মাত্র পাঁচজন পরীক্ষার্থী টেকে।

এরপর ছাত্ররা হয় ধর্মীয় কাজে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখে, কিংবা একদিন প্রশাসক হবে, মনে এরকম একটা আশা নিয়ে আর সবার মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করে। কিন্তু তাঁদের আশা সচরাচর আলোর মুখ দেখে না। কারণ প্রশাসকের পদটা আগে থেকেই পুনর্জন্মিতদের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

তবে ১৯১০ সালে অদ্ভুত এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ওই সময় প্রশাসকের পদ অভিজাতশ্রেণীর কাউকে কিংবা জীবন্ত গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা নিয়েছে, এমন কাউকে দেওয়া হয়নি। চিনারা হামলা করার আগেই তেরোতম দালাই লামা তিব্বত ছেড়ে পালিয়েছিলেন। সে-সময় একজন প্রতিনিধিকে তাঁর জায়গায় বসানো হয়েছিল।

ড্রেবাঙে দশ হাজার সন্ন্যাসী আছেন। কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে তাঁদেরকে। আলাদা আলাদা মন্দির আর বাগান আছে সব দলের। সকাল থেকেই ধর্মীয় আলোচনা শুরু করেন সন্ন্যাসীরা। তারপর মাখন চা আর সুপ খেয়ে দুপুরের সময় পড়াশোনা করার জন্য বাসায় রওনা হয়। ধর্মীয় আলোচনা এবং পড়াশোনা করার পর বাইরে ঘোরাফেরা আর খেলাধুলোর জন্য যথেষ্ট সময় পান তাঁরা। দলগুলোকে এমনভাবে ভাগ করা হয় যাতে সদস্যরা তাদের নিজস্ব এলাকা থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকে।

বিনামূল্যে খাবার আর থাকার জায়গা ছাড়াও সরকারের কাছ থেকে কিছু হাত খরচ এবং তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে প্রায়ই নানারকম উপহার পান সন্ন্যাসীরা। কোনও সন্ন্যাসী দামী উপহার পেলে ধনী ব্যবসায়ী কিংবা অভিজাতশ্রেণীর কেউ উপহারটা কিনে নেন। তিব্বতের বেশিরভাগ জায়গাই মন্দিরের দখলে। আর এই বিশাল সম্পত্তির সবটাই ভোগ করেন আশ্রমের সন্ন্যাসীরা।

প্রতিটি আশ্রমে একজন ডিলার আছে। সে খাবার আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস যোগাড় করে। আশ্রমগুলোর পিছনে যে বিশাল খরচ হয় সেটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। একবার এক সন্ন্যাসী আশ্রমগুলোর এক মাসের খরচ হিসাব করেছিলেন। সাহায্য করার জন্য তার সঙ্গে ছিলাম আমি। সরকার আশ্রমগুলোতে তিন টন চা, পঞ্চাশ টন ঘি পাঠাবে, যার আনুমানিক মূল্য চল্লিশ হাজার পাউন্ডেরও বেশি। শুধু খাবারেই চল্লিশ হাজার পাউন্ড বেরিয়ে যাচ্ছে, এর সঙ্গে সন্ন্যাসীদের হাত খরচ যোগ করলে অঙ্কটা কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে!

ড্রিবাঙ, সেরা আর গ্যানডেন—এই তিন জায়গাকে রাষ্ট্রের ভিত হিসাবে ধরা হয়। কারণ ওখানে তিব্বতের সব গুরুত্বপূর্ণ আশ্রম আছে। পুরো দেশের রাজনীতি এ-সব শহর থেকে

BanglaBook.org

নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আশ্রমের অধ্যক্ষ এবং আটজন সরকারী কর্মকর্তা–এরাই জাতীয় পরিষদের পরিচালক বা প্রধান নির্বাচিত হন। অধ্যক্ষদের সম্মতি ছাড়া কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না।

স্বাভাবিকভাবেই অধ্যক্ষরা কোনও সিদ্ধান্তে সম্মতি দেওয়ার আগে সেটা তাঁদের আশ্রমের জন্য ভালো হবে কিনা সে-ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। যার ফলে সোনার ডিম পাড়বে এরকম অনেক সিদ্ধান্ত তাঁদের কারণে বাস্তবের মুখ দেখে না।

একসময় আফশেনেইটর আর আমার দিকে অধ্যক্ষরা অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাতেন। ভাবটা এমন, আমরা যেন তাদের বাড়া ভাতে ছাঁই দিতে এসেছি। তবে কিছুদিন পর তাঁরা বুঝলেন তিব্বতে আসার পিছনে আমাদের কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। এখানকার সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক রীতিনীতির ব্যাপারেও কোনও ভূমিকা নেই আমাদের।

আগেই বলেছি, আশ্রমগুলোকে মন্দিরের হাই স্কুল হিসাবে দেখা হয়। একারণে প্রত্যেক লামা, তিব্বতে তাঁদের সংখ্যা এক হাজারের বেশি, সবাই আশ্রমে লেখাপড়া করেন। তিব্বতের বৌদ্ধ পুরোহিত কিংবা ধর্মযাজকদের লামা বলা হয়। তিব্বতীরা মনে করে লামারা পুনর্জন্মিত। এ কারণে তীর্থযাত্রীদের কাছে লামারা খুব বড় আকর্ষণ।

দালাই লামা যখন ড্রিবাঙে আসেন, তখন সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে লামারা উপস্থিত থাকেন। মঞ্চের একেবারে সামনে বসেন তাঁরা। এই সময় মঠাধ্যক্ষদের একজন আশ্রমের ছায়াঘেরা বাগানে বসে প্রতিদিন দালাই লামার সঙ্গে ধর্মীয় আলোচনা করেন। একজন লামার ধর্মীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় এটা। ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখতে পাওয়ার বিন্দুমাত্র আশা নেই আমার মনে।

একদিন সকালের ঘটনা। লবস্যাঙের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করছি আমি। হঠাৎ করে সে জানাল, ইচ্ছে করলে আমি তার সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারি। ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত ছিল যে কিছুক্ষণের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। আমি জানি ওই অনুষ্ঠানে অন্য ধর্মের অনুসারীদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। লবস্যাঙ এ-ব্যাপারে আমাকে বিশেষ সুযোগ দিচ্ছে। তার এই ঋণ আমি কখনো শোধ করতে পারব না।

সঙ্গে লবস্যাঙ থাকায় আমাকে কেউ বাগানে ঢুকতে বাধা দিল না। সেখানে ঢুকতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলাম আমি। প্রায় দুই হাজার লাল টুপি পরা সন্ন্যাসী কাঁকর বিছানো বাগানে উবু হয়ে বসে আছেন। তাঁদের পিছনে, প্রায় অন্ধকার একটা জায়গায়, অসংখ্য গাছের সারি।

দালাই লামা উঁচু একটা জায়গা থেকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন। এই প্রথম তাঁর শিশুসুলভ কণ্ঠ পরিষ্কার শুনতে পেলাম আমি। একজন আত্মবিশ্বাসী পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতো নির্দ্বিধায় কথা বলছেন তিনি।

এই প্রথম সন্ন্যাসীদের সামনে ভাষণ দিচ্ছেন দালাই লামা। মাত্র চোদ্দো বছর বয়স

BanglaBook.org

হলে কী হবে, ধর্মীয় বিষয়ে তিনি অনেক বছর ধরে পড়াশোনা করছেন। এখন সচেতন সন্ন্যাসীদের সামনে তাঁকে বুঝে-শুনে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে। এরা সবাই বোদ্ধা। এখানে ভুল বলার কোনও সুযোগ নেই।

প্রথম বক্তৃতা দালাই লামার ভাগ্য নির্ধারণ করবে। যদিও এটা সত্যি যে দালাই লামাকে কখনোই নির্দিষ্ট জীবনযাত্রার বাইরে যেতে দেওয়া হবে না, তবু আজকের বক্তৃতায় তিনি কতটুকু দক্ষতা দেখাতে পারবেন তার ওপর নির্ভর করছে তিনি সন্ন্যাসীদের পথপ্রদর্শক হবেন, নাকি শুধু শাসক হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাঁকে।

তাঁর পূর্বসূরীদের সবাই পঞ্চম আর তেরোতম দালাই লামার মতো অতটা দক্ষ ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে অনেককেই সারাজীবন শিক্ষকদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হয়েছে। ট্রেনিং নিতে নিতেই জীবন শেষ হয়ে যায় তাঁদের। এক্ষেত্রে দেশের ক্ষমতা চলে যায় প্রশাসকের হাতে।

তিব্বতীরা চোদ্দো বছর বয়সের এই ছেলের বুদ্ধিমত্তাকে অলৌকিক বলে মনে করে। বলা হয় কোনও বই একবার রিডিং পড়লেই সেটা দালাই লামার মুখস্থ হয়ে যায়। দেশে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে-ব্যাপারে তাঁর কৌতূহলের কোনও শেষ নেই। জাতীয় সম্মেলনে নেওয়া সিদ্ধান্তের সমালোচনা বা প্রশংসা, দুটোই করেন তিনি।

কিছুক্ষণ পর বিতর্ক শুরু হলো। এরকম একটা বিতর্কে উপস্থিত থাকতে পারব সেটা কখনো কল্পনাও করিনি। বিতর্ক অনুষ্ঠানে যা দেখলাম তাতে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। দালাই লামার ক্ষমতা সম্পর্কে যে-সব কথা বলা হয়ে থাকে তার কোনওটাই আসলে অতিরঞ্জিত নয়।

নিজের জায়গা ছেড়ে কাঁকর বিছানো বাগানে বসলেন তিনি। এতে বোঝা যায় জন্মসূত্রে পাওয়া ক্ষমতা নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র অহংকার নেই। এরপর রীতি অনুযায়ী আশ্রমের একজন অধ্যক্ষ তাঁর উদ্দেশে একের পর এক প্রশ্ন রাখলেন। সাবলীলভাবে প্রতিটি প্রশ্নে উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন দালাই লামা। এখানে অধ্যক্ষরা দালাই লামার প্রতিপক্ষ।

কিছুক্ষণ পর পুরো চিত্রটা পাল্টে গেল। প্রতিপক্ষ অধ্যক্ষ এবার নিজেই উত্তরদাতা। এখন প্রশ্ন করবেন দালাই লামা। প্রশ্ন-উত্তরের পর্বটা স্বচক্ষে দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবে এর মধ্যে কোনও কূট-কৌশল নেই, অর্থাৎ দালাই লামার বুদ্ধিমত্তা দেখাবার জন্য ব্যাপারটা আগে থেকে সাজানো নয়। আক্ষরিক অর্থেই এখানে একটা কঠিন প্রতিযোগিতা চলছে। আর দালাই লামার সঙ্গে এই প্রতিযোগিতায় নিজেদের বিজয়ী প্রমাণিত করতে রীতিমতো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন অধ্যক্ষরা।

বিতর্ক শেষ হওয়ার পর দালাই লামা আবার তাঁর সোনার সিংহাসনে গিয়ে বসলেন। মহীয়সী মা এক কাপ চা দিলেন তাঁকে। পুরো অনুষ্ঠানে তিনিই একমাত্র মহিলা। কাপটা সোনার তৈরি।

এ-সময় আমার দিকে একবার চোরা চোখে চাইলেন দালাই লামা। ভঙ্গিটা এমন,

BanglaBook.org

আমি যে তাঁর বক্তৃতায় সন্তুষ্ট হয়েছি সে-ব্যাপারে তিনি যেন নিজেকে নিশ্চয়তা দিতে চাইছেন। সত্যি কথা বলতে কি, আসলে যা দেখলাম আর শুনলাম তাতে দালাই লামার প্রশংসা না করে উপায় নেই।

সাধারণ একটা পরিবারের ছেলে তিনি। কিন্তু তাঁর মানসিক দৃঢ়তা সত্যি অবাক করার মতো। বলা যায় না, আমাকে পুনর্জন্মে বিশ্বাসী করতে সফলও হয়ে যেতে পারেন তিনি।

বিতর্ক শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পর সবাই মিলে কোরাস ধরে প্রার্থনায় মগ্ন হলেন। বেশ অনেকক্ষণ ধরে চলল এই প্রার্থনা।

এরপর অধ্যক্ষদের পাহারায় রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন দালাই লামা। একটা ব্যাপার ভেবে খুব অবাক লাগে আমার। এই কিশোর বয়সে দালাই লামা কীভাবে একজন বুড়ো মানুষের মতো ধীর-স্থির পদক্ষেপে চলাফেরা করেন। এখন বুঝতে পারছি এটা আসলে একটা ধর্মীয় নিয়ম। এভাবেই তাঁকে চলাফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ মনে করা হয় গৌতম বুদ্ধ এভাবেই হাঁটা-চলা করতেন। একই সঙ্গে এরকম ভাবগাম্ভীর্য ধরে রাখায় দালাই লামার সম্মানও অনেক বেড়ে যায়।

আমার খুব ইচ্ছা ছিল এরকম একটা অনুষ্ঠানের ছবি তুলব। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি সঙ্গে ক্যামেরা না থাকায় বড় বাঁচা বেঁচে গেছি।

এই অনুষ্ঠানের পরদিন আমার বন্ধু ওয়াংডুলা আশ্রমের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দালাই লামার একটা ছবি তোলেন। একজন সন্ন্যাসীর চোখে পড়ে যায় সেটা। আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাজির করা হয় প্রশাসকের সেক্রেটারির কাছে। সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে ইন্টারোগেট। শাস্তি হিসাবে অফিসের উচ্চপদ থেকে নামিয়ে আনা হয় তাঁকে। সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে অফিস থেকে পুরোপুরি বরখাস্ত করা হয়নি বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করা উচিত। ব্যাপারটা নিয়ে সবাই খুব উত্তেজিত হলেও, ওয়াংডুলা ছিলেন একদম শান্ত। চাকরি জীবনের চড়াই-উৎরাই সম্পর্কে তাঁর ভালোই জানা আছে।

দালাই লামার প্রোগ্রাম মাউন্ট গায়ামবি উটসি পাহাড়ের সতেরো হাজার ফুট উঁচু চূড়ায় ওঠা। ওই চূড়াটা ড্রেবাঙ আশ্রমের ভাবগাম্ভীর্য শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

সকালবেলাই কাফেলা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দালাই লামা। কাফেলায় সব মিলিয়ে একহাজার লোক আর কয়েকশ' ঘোড়া আছে। চূড়ায় পৌঁছে প্রার্থনা শুরু করলেন তিনি।

চূড়া থেকে কখন ধূপের ধোঁয়া উঠবে সেটা দেখার জন্য পাহাড়ের নিচে শত শত লোক অপেক্ষা করছে।

সেদিনই আবার আশ্রমে ফিরে গেলেন দালাই লামা। কিছুদিন পর সেরার আশ্রমে গিয়ে পাবলিক বিতর্কে অংশগ্রহণ করলেন তিনি।

ভালোই সময় কাটছে আমার। পত্র-পত্রিকায় ছাপা হওয়া বিভিন্ন খবর আর প্রতিবেদন অনুবাদ করার সরকারী কাজ পেয়েছি। মাঝে-মধ্যে বাঁধ আর জলসেচ বানাবার কাজেও

BanglaBook.org

ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে।

আফশেনেইটরও খাল বানাবার কাছে নিজের মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছে। মজার বিষয়, খাল খুঁড়তে গিয়ে কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে পাচ্ছে সে।

কিন্তু লামারা কেউ বলতে পারলেন না এ-সব নিদর্শন কোথা থেকে এসেছে। এমন কি ইতিহাসের কোনও বইতেও এ-ব্যাপারে কিছু লেখা নেই।

ইন্ডিয়ার আর্কিওলজিক্যাল জাদুঘরে এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন জমা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফশেনেইটর। চিনা কমিউনিস্টরা হামলা চালালে তিব্বত থেকে চলে আসি আমরা। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো সঙ্গে নিতে ভুলিনি।

কিছুদিন পর লাসা থেকে বাইরে যাওয়ার একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেলাম আমি। তিব্বতী কিছু বন্ধু সরেজমিনে তাদের বাড়ি-ঘর দেখার অনুরোধ করল আমাকে। সম্পত্তির উন্নয়নের জন্য কি কি করা যেতে পারে সে-ব্যাপারে পরামর্শ দিতে হবে আমাকে। আগেই বলেছি, আমি এখন একজন সরকারী কর্মচারী। তবে বন্ধুরা কীভাবে কীভাবে যেন সরকারের কাছ থেকে আমার ছুটি আদায় করে নিল।

তিব্বতের অপরিচিত কিছু জায়গায় ঘোরার সুযোগ পেয়ে ভালোই লাগছে আমার। চাষাবাদ থেকে শুরু করে প্রতিটা ক্ষেত্রেই তিব্বতীরা এখনও সেই মধ্যযুগীয় সময়ে পড়ে আছে। তাদেরকে কিছু উপদেশ দিলাম আমি।

প্রায় কয়েক সপ্তাহ ধরে অনেক জায়গায় ঘুরলাম। ঘোড়া ছাড়া আরও অনেক বাহনে চড়েছি আমি। ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে বানানো বোটে চড়ে ব্রহ্মপুত্র নদীতেও গেলাম। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় ক্যামেরাটা সঙ্গে নিতে ভুলিনি। তাই ইচ্ছেমতো ছবি তোলাও হলো।

লাসায় ফিরে দেখি ইতিমধ্যে শীত পড়ে গেছে। কোইচু নদী জমে বরফ হয়ে গেছে। নতুন একটা বুদ্ধি আসল মাথায়। কয়েকজন বন্ধু মিলে স্কেটিং ক্লাব গঠন করলাম আমরা।

প্রথমে কেউ ভালোভাবে স্কেটিং করতে পারছিলাম না। আমাদেরকে ধুপ-ধাপ পড়ে যেতে দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ছে দর্শকরা। তবে কিছুদিন পরই দক্ষ হয়ে উঠলাম আমরা। স্কেটিং-এর প্রতি ছেলেমেয়েদের প্রবল উৎসাহ দেখে তাদের মা-বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন যেভাবেই হোক স্কেট করা তাঁরা শিখবেনই।

অদ্ভুত খেয়ালের বশে নিজের জুতোর সোলে একটা ছুরি বেঁধে বরফের ওপর দৌড়ানো–খেলাধুলোর প্রতি অনাগ্রহী, পিছিয়ে পড়া অভিজাতশ্রেণীর মানুষ ব্যাপারটা হজম করতে পারছে বলে মনে হলো না।

BanglaBook.org

তেরো

সমস্যা মোকাবেলার জন্য তিব্বতের প্রস্তুতি

দালাই লামার ছবি / তিব্বতীদের আতিথেয়তা / সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানো এবং ধর্মীয় প্রভাব বৃদ্ধি / প্রিন্টিং প্রেস আর বই / দালাই লামার জন্য সিনেমা হল

দালাই লামা তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে আমাদের নতুন খেলা সম্পর্কে শুনেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর রাজপ্রাসাদের ছাদ থেকে বরফের মেঝেটা দেখা যায় না। আমাদের খেলা দেখার ব্যাপারে তিনি খুব কৌতূহলী। ছাদ থেকে দেখা যায় না তো কি হয়েছে! সিনে ক্যামেরা তো আছে।

লোক মারফত আমাকে একটা সিনে ক্যামেরা পাঠালেন তিনি। আমার কাজ হচ্ছে স্কেটারদের ছবি তোলা। সিনে ক্যামেরা আগে কখনো ব্যবহার করিনি, তাই কাজ করবার আগে ওটার প্রসপেক্টাস আর ব্যবহারবিধি ভালো করে পড়ে নিলাম। আমার নিজের খেলার ছবি তুলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দিয়ে ফ্লিমটা ডেভলপ করার জন্য ইন্ডিয়ায় পাঠালাম।

দুই মাস পর ছবিগুলো দালাই লামার হাতে পৌঁছাল। ছবিগুলো হয়েছে একেবারে নিখুঁত। এই ছবি দিয়েই দালাই লামার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা শুরু হলো। ভাবতে অবাকই লাগে, বিংশ শতাব্দীর একটা সিনে ক্যামেরা নতুন একটা সম্পর্কের ভিত গড়ে দিচ্ছে।

এই ঘটনার কিছুদিন পর লবস্যাঙ স্যামটেন আমাকে নতুন একটা খবর দিলো। দালাই লামা চান আমি সব অনুষ্ঠান আর উৎসবের ছবি তুলি। ছবির ব্যাপারে তাঁর কৌতূহল দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ক্যামেরাটা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সে-ব্যাপারে সবসময় আমাকে নির্দেশনা দিচ্ছেন তিনি–কখনো লিখে, কিংবা লবস্যাঙের মাধ্যমে মৌখিকভাবে। কীভাবে দাঁড়ালে ক্যামেরার আলোটা সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহার করা যাবে সে ব্যাপারেও তিনি আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে খবর পাঠাচ্ছেন অমুক অনুষ্ঠান সময়মতোই শুরু হবে। আমি যেন ক্যামেরা নিয়ে সেখানে পৌঁছে যাই।

সরাসরি না হলেও এভাবে তাঁর সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল আমার। সুযোগটা হেলায় হারাতে চাইছি না। তাই আমিও তাঁকে ম্যাসেজ পাঠিয়ে বললাম, মিছিলের সময়

BanglaBook.org

তিনি যেন ঠিক ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ছবি তোলার সময় কেউ যাতে আমাকে সহজে দেখতে না পায় সে ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকতে হচ্ছে। দালাই লামাও এই ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন। সবার অগোচরেই কাজটা আমাকে করতে বলেছেন তিনি। আর সেটা যদি না পারি তাহলে ছবি তোলা বন্ধ করে দিতে হবে।

আমি ক্যামেরা হাতে ছবি তুলে যাব আর কেউ আমাকে দেখবে না, এরকম আশা করাটা ভুল। বুঝতে পারলাম অনেকেই খেয়াল করছে যে আমি ছবি তুলছি। তবে যখন সবাই জানল এটা দালাই লামার আদেশ, তখন কেউ আমাকে বাধা দিতে এল না। এভাবে তিব্বতের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কিছু দুর্লভ ছবি তুলতে পেরেছি। দালাই লামার সিনে ক্যামেরা ছাড়াও আমার কাছে সবসময় একটা লাইকা থাকে। সেটা দিয়েও অনেক দুর্লভ ছবি তুলেছি।

স্যাগ ল্যাগ খ্যাঙ মন্দিরের কিছু চমৎকার ছবিও তোলা হয়েছে। মন্দিরটার ভিতরে গৌতম বুদ্ধের সবচেয়ে মূল্যবান মূর্তি আছে। সতেরো শতব্দীতে বিখ্যাত রাজা সরঙগৎসেন গ্যামপোর শাসনামলে এটা তৈরি করা হয়েছিল। তাঁর দুই সহধর্মিনী বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন।

তাঁদের মধ্যে একজন নেপাল থেকে এসে লাসায় দ্বিতীয় বৃহত্তম মন্দির স্থাপন করেন। মন্দিরটার নাম রিমপোচি। অন্যজন ছিলেন চিনা। লাসায় আসার সময় সঙ্গে একটা সোনার মূর্তি নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

তাঁদের স্বামী, সরঙগৎসেন, প্রাচীন ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু বউদের পাল্লায় পড়ে তিনিও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হয়ে যান। আর এভাবেই বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পায়।

সোনার মূর্তিটা রাখার জন্য মন্দিরটাকে বাড়ির আদল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন সরঙসেন। কিন্তু পোটালা রাজপ্রাসাদের মতো এখানেও একই খুঁত থাকল। বাইরে থেকে দেখে অনেক বিশাল আর খুব জমকালো মনে হলেও, ভিতরটা অন্ধকারে ঢাকা। আর সেই সঙ্গে অসংখ্য বাঁকের ছড়াছড়ি তো আছেই।

মন্দিরটা নানারকম উপহারে ঠাসা। মন্দিরে গেলেই সিদ্ধপুরুষদের মূর্তির জন্য নকশা করা রেশমি কাপড়ের পোশাক এবং খাঁটি সোনার তৈরি থালা নিয়ে যান মন্ত্রীরা। এ-সব থালায় আবার রাখা হয় ঘি। ঘি পোড়ানো হয় অসংখ্য ল্যাম্পের মাধ্যমে। গ্রীষ্ম আর শীতকালে ঘি পোড়ানোর দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে যায়।

একমাত্র ইঁদুর ছাড়া এই উপহারগুলো আর কারও কোনও কাজে লাগে না। মন্দিরের ভিতর হাজার হাজার ইঁদুর আছে। মন্দিরটা এমনভাবে বানানো হয়েছে যে বাইরে থেকে একবিন্দু আলো ভিতরে ঢুকতে পারে না। বেদির ওপর রাখা বাটার ল্যাম্পের আলোই একমাত্র ভরসা। পবিত্র মন্দিরের লোহার গেটটা নির্ধারিত সময়ের আগে কখনও খোলা হয় না।

অন্ধকার, সংকীর্ণ একটা প্যাসেজ ধরে এগোবার সময় দেখলাম ছাদ থেকে একটা ঘণ্টা ঝুলছে। ওটার গায়ে লেখা টি ডিয়াম লাউডামাস। প্রথম দেখায় নিজের চোখকে

BanglaBook.org

বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এটা কীভাবে সম্ভব!

সম্ভবত এটাই চ্যাপেলের সর্বশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। বহু শতাব্দী আগে ক্যাথলিক মিশনারিরা এই ঘণ্টা বানিয়েছিলেন। তাঁরা তিব্বতে তাঁদের বাসস্থান টিকিয়ে রাখতে পারেননি। কিন্তু তিব্বতীদের মন্দিরে ক্যাথলিকদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন–ব্যাপারটা সত্যি অবিশ্বাস্য! অন্য ধর্মের প্রতি তিব্বতীদের শ্রদ্ধার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে।

দুপুরবেলা মন্দিরটা প্রার্থনাকারীদের ভিড়ে ঠাসা থাকে। লোহার গেটটা খোলার পর গৌতম বুদ্ধের বেদির সামনে মানুষের বিশাল লাইন তৈরি হয়। প্রত্যেকে নত মাথায় গৌতম বুদ্ধের মূর্তি ছোঁয়, তারপর যার যেমন সামর্থ্য কিছু উপহার দেয় একজন সন্ন্যাসী আজলা ভরে জাফরান মেশানো পবিত্র পানি দেন ভক্তদের। কিছুটা পান করে বাকিটা মাথায় ঢালে প্রার্থনাকারীরা। অনেক সন্ন্যাসী সারাজীবন মন্দিরেই থাকেন। বাটার ল্যাম্পগুলো ভরে দেওয়া আর মন্দিরের সম্পত্তি দেখাই তাঁদের দায়িত্ব।

মন্দিরে একবার বৈদ্যুতিক বাতি লাগাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু শর্ট সার্কিট হওয়ায় আগুন ধরে যায়। যারা কাজ করছিল তারা সবাই মারা পড়ে দুর্ঘটনায়। এরপর থেকে কৃত্রিম বাতির কথা বলার সাহস করেনি কেউ।

তিব্বতীদের জীবনে বন্ধুকে বিদায় দেওয়া এবং বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা–দুটোই খুব আকর্ষণীয়। কেউ যদি কিছুদিনের জন্য শহর ছেড়ে চলে যায়, বন্ধুরা শহরের বাইরে কয়েক মাইল রাস্তার ওপর তাঁবু টাঙিয়ে রাখে।

শুধু তাই নয়, বন্ধুর জন্য খাবার নিয়ে সেখানে অপেক্ষায় থাকে তারা। খাবার দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্ধু যাতে তাড়াতাড়ি তার ভ্রমণ শেষ করতে পারে। সাদা চাদর আর আশীর্বাদ না নেওয়া পর্যন্ত কোনও বন্ধুকে শহর ছেড়ে যেতে দেওয়া হয় না।

ফিরে আসার সময়ও একইরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাড়ি ফেরার পথে অনেক জায়গা থেকে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। হয়তো দেখা গেল সকাল বেলাই পোটালা রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি চলে এসেছে বন্ধু। লাসায় পৌঁছাতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয় তার। কিন্তু শুভেচ্ছা জানাতে রাস্তায় রাস্তায় বন্ধু-বান্ধবরা তাঁবু টাঙিয়ে তার জন্য অপেক্ষায় থাকে। যার ফলে শহরে আসতে আসতে দুপুর পার হয়ে যায়। বন্ধু-বান্ধবরা তার কাফেলার সঙ্গে মিশে যায়। একটা দৃষ্টিনন্দন মিছিল সঙ্গে নিয়ে বাসায় ফেরে সে। বন্ধুদের এমন ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে ভ্রমণজনিত ক্লান্তি দূর হয়ে যায় তার।

বিদেশ থেকে কেউ এলে তাকে শুভেচ্ছা জানাবার জন্য বৈদেশিক সম্পর্কের মন্ত্রণালয় থেকে একজন প্রতিনিধি পাঠানো হয়। এই প্রতিনিধি তাদের থাকা, খাওয়া এবং পর্যাপ্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করে।

নতুন রাষ্ট্রদূতকে সামরিক মর্যাদায় রিসিভ অভ্যর্থনা জানানো হয়। মন্ত্রীসভার একজন প্রতিনিধি তাঁকে সাদা চাদর উপহার দেন। লাসায় অতিথিদের থাকার জন্য বিশেষ কোয়ার্টার আছে। বিদেশি অতিথিকে এরকম উষ্ণ অভ্যর্থনা পৃথিবীর আর কোনও দেশ দেয় কিনা সেটা আমার জানা নেই।

যুদ্ধের সময় ভারতীয় প্লেনগুলো চিনে যাবার সময় রাস্তা হারিয়ে ফেলে। এটা

BanglaBook.org

সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল আকাশপথ। পাইলটকে অসংখ্য শাখা-হিমালয়ের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। যোগ্যতা আর অভিজ্ঞতার সবটুকু ব্যবহার করতে হয় বলে তার নার্ভের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। তার সঙ্গে আবার যোগ হয়েছে নির্ভরযোগ্য ম্যাপের অভাব। একবার পথ হারিয়ে ফেললে আবার ঠিক পথে ফিরে আসাটা তাই খুব কঠিন।

একদিন রাতে পবিত্র নগরী লাসায় ইঞ্জিনের ভারী শব্দ শোনা গেল। সেদিন থেকেই সাধারণ সতর্কতা জারি করল সরকার। দুদিন পর সামই থেকে খবর এল, পাঁচজন আমেরিকান প্যারাসুট নিয়ে সেখানে ল্যান্ড করেছে।

ইন্ডিয়ায় ফিরে যাবার সময় তাদেরকে লাসায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাল সরকার। লাসায় ঢোকার আগেই বিভিন্ন তাঁবু থেকে তাদেরকে যেভাবে অভ্যর্থনা দেওয়া হচ্ছে তাতে অবাক না হয়ে পারলাম না। প্রতি তাঁবু থেকে মাখন চা আর চাদর দিয়ে স্বাগত জানানো হলো তাদেরকে।

লাসায় এসে তারা জানাল, নিয়েনচেনথেংলায় তুষারের ঢালে বাড়ি লাগায় তাদের প্লেনের ডানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অবস্থায় সামনে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, সেটা বুঝতে পেরে প্লেন ঘুরিয়ে নেয় পাইলট। কিন্তু ফুয়েল গজে চোখ পড়তেই আঁতকে ওঠে সে। ইন্ডিয়ায় ফিরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ফুয়েল নেই প্লেনে। বাধ্য হয়ে প্লেন থেকে লাফ দেয় তারা।

দু'এক জায়গায় মচকানো ছাড়া স্থায়ী কোনও ক্ষতি হয়নি পাঁচ আমেরিকানের। যাই হোক, কিছুক্ষণের জন্য লাসায় অবস্থান করে ইন্ডিয়ার ফিরতি পথ ধরল তারা। ইন্ডিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত যাওয়ার জন্য তাদেরকে কিছু ঘোড়া দিল তিব্বত সরকার।

তিব্বতে প্রায়ই প্লেন ক্র্যাশ করে। কিন্তু সবাই ওই পাঁচ আমেরিকানের মতো ভাগ্যবান হয় না। একবার তিব্বতের পুবদিকে একসঙ্গে দুটো প্লেন ক্র্যাশ করেছিল।

প্রথম প্লেনের সবাইকে খুন করা হয়।

দ্বিতীয়টা পাওয়া যায় হিমালয়ের দক্ষিণ দিকের একটা প্রদেশে। ওখানকার বাসিন্দারা সবাই অর্ধনগ্ন অসভ্য জংলি। এরা কেউই বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী নয়। লোকজন বলাবলি করে এসব জংলিরা নাকি বিষ মাখানো তীর ছুঁড়তে ওস্তাদ।

মাঝে-মধ্যে নিজেদের কিছু জিনিস বিনিময় করার জন্য জঙ্গল থেকে বের হয় এরা। একবার এমন কিছু জিনিস তারা নিয়ে এল যেগুলো শুধু আমেরিকানদের প্লেনেই থাকার কথা। এরপর আর প্লেন ক্র্যাশ নিয়ে কোনও কথা শোনা গেল না। প্লেন দুটো যেখানে ক্র্যাশ করেছে সেখানে যেতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু দূরত্ব খুব বেশি হওয়ায় আর যাওয়া হয়নি।

তিব্বতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দিন দিন খুব খারাপ পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে পিকিং-এ চিনারা ঘোষণা দিয়েছে যে তিব্বতকে তারা মুক্ত করবে। এই ঘোষণাকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনও উপায় নেই। এমন কি লাসার মানুষও ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিয়েছে, কারণ ওরা জানে চিনারা কোনও কাজ হাতে নিলে সেটার শেষ দেখে ছাড়ে।

একজন মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে আর্মিকে ঢেলে সাজাবার কাজ শুরু করল সরকার।

BanglaBook.org

তিব্বতের স্থায়ী সামরিক বাহিনী আছে। প্রতি জেলার নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে হয়। সংখ্যাটা নির্ধারণ করা হয় জেলার মোট বাসিন্দার সমানুপাতিক হারে।

সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য যাকে ডাকা হয় ইচ্ছে করলে সে না গিয়ে তার বদলে অন্য কাউকে পাঠাতে পারে। কিন্তু সেজন্য তাকে টাকা দিয়ে বিকল্প কাউকে রাজি করাতে হয়। অনেক সময় বিকল্প হিসাবে যাওয়া মানুষগুলো সারাজীবন সামরিক বাহিনীতে থেকে যায়।

তিব্বতের মিলিটারি প্রশিক্ষকরা আগে ইন্ডিয়ায় চাকরি করেছেন। যার ফলে কীভাবে আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করতে হয় সে-ব্যাপারে তাদের ধারণা আছে। এতদিন তিব্বতীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হতো হিন্দি আর ইংরেজি ভাষায়। কিন্তু নতুন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ক্ষমতায় এসেই ঘোষণা দিলেন, এখন থেকে নির্দেশ দিতে হবে শুধু তিব্বতী ভাষায়।

'গড সেভ দ্য কুইন'–আগের এই জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন করে নতুন গান রচনা করা হলো। নতুন সঙ্গীতে মূলত তিব্বতের স্বাধীনতার মহিমা আর দালাই লামার প্রতি তাদের শ্রদ্ধার কথাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

পুরো লাসা শহরটাই যেন আর্মি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প হয়ে গেল। নতুন রেজিমেন্ট গঠন করা হয়েছে। জাতীয় পরিষদে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এক হাজার সৈন্যের জন্য অস্ত্র কেনার দায়িত্ব দেওয়া হবে সমাজের ধনিক শ্রেণীকে। শুধু তাই নয়, এই এক হাজার সৈন্যও যোগাড় করতে হবে তাঁদের।

আগের শান্তিপূর্ণ দিনে মানুষ সেনাবাহিনীকে নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাত না। নির্দিষ্ট সময় পর পর জেলার বাসিন্দারা সরকারকে রসদসহ সৈন্য আর কিছু টাকা দিত। কিন্তু এখন কর্তৃপক্ষ একটা সুসংগঠিত সেনাবাহিনীর গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। সৈন্য, রসদ আর টাকা দেওয়ার পদ্ধতিটা এখন আর আগের মতো নেই। অফিসার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ–সবাইকে নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণ জিনিস দিতে হয়।

প্রথমদিকে সেনাদের রসদ দিতে গিয়ে অনেক রকম ঝামেলায় পড়তে হলো। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না হওয়ায় সবাইকে অতিরিক্ত খাটতে হচ্ছে। সৈন্যদের জন্য প্রয়োজনীয় শস্য আনতে হচ্ছে অনেক দূরের গুদাম থেকে। প্রত্যেক এলাকাতেই এই ধরনের গুদাম আছে। স্টোরহাউসগুলো পাথরের তৈরি, ভিতরে জানলার বদলে আছে ভেন্টিলেটর। একটা স্টোরহাউসে প্রচুর শস্য রাখা যায়। বাতাস শুকনো থাকায় এখানে বছরের পর বছর শস্য রাখা হলেও সেগুলে পচে না।

তিব্বতে কে সেনাবাহিনীর অফিসার আর কে সাধারণ সৈনিক সেটা বোঝা খুব সহজ। যার যেমন পদ সে অনুযায়ী তাকে সোনার তৈরি পদক আর অলঙ্কার পরতে হয়। পদ উঁচু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোনার পরিমাণও বাড়তে থাকে। তিব্বতে সামরিক পোশাকের ব্যাপারে কোনও নিয়ম-নীতি নেই।

উদাহরণ হিসাবে একজন জেনারেলের কথা বলা যায়। তাঁর কাঁধে সোনার পদক থাকা সত্ত্বেও বুকে ঝলমলে উজ্জ্বল রঙের কিছু জিনিস লাগিয়েছেন। তিনি সম্ভবত বিদেশি সচিত্র

BanglaBook.org

পেপারে বিভিন্ন দেশের আর্মির অফিসারদের ইউনিফর্ম খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন এবং সেগুলোর অনুকরণে নিজের পোশাকে নানারকম বাড়তি জিনিস যোগ করেছেন।

তিব্বতী সেনারা মেডেল ব্যবহার করে না। বিশেষ কোনও কারণ ছাড়াই সেনাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর সৈন্যরা লুট করার সুযোগ পায়। তিব্বতে এটা একটা সাধারণ নিয়ম। তবে যুদ্ধের পর সৈন্যরা অস্ত্র ফিরিয়ে দিতে বাধ্য।

সৈনিকদের লুট করার সুযোগ দেওয়ায় যুদ্ধে নানারকম বিপদ ঘটে। ডাকাতদের সঙ্গে একবার যুদ্ধ হয়েছিল সেনাবাহিনীর। স্থানীয় পনপোরা তাদের সঙ্গে না পেরে সরকারকে খবর দেয়। সেনাবাহিনীর ছোট একটা দলকে পাঠায় সরকার। ডাকাতরা খুব নির্দয়ভাবে হামলা চালালেও, সৈন্যরা হাল ছাড়তে রাজি নয়। এই কারণে তিব্বতে সেনাবাহিনীর খুব কদর।

তবে ডাকাতদের প্রতিহত করার সময় লুটপাটও চালায় তারা। প্রায়ই দেখা যায়, লুটপাট করতে গিয়ে তারা যুদ্ধের কথা ভুলে গেছে। এর ফলে অনেক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। অকালে প্রাণ হারাতে হয় অনেককে। এরকম একটা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেওয়ায় আমি এসব জানতে পেরেছি।

চিনা কমিউনিস্টরা তুর্কিস্থান দখল করার পর আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ম্যাচিরনান-এর মাথায় যেন বাজ পড়ল। তিব্বত সরকার তাঁকে ট্র্যাভেল ফ্যাসিলিটি দেবে কিনা—এটাই হচ্ছে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। তিনি ইন্ডিয়ার ইউ.এস.এ দূতাবাসকে অনুরোধ করলেন এই ব্যাপারে তিব্বত সরকারের মনোভাব জানার জন্য। সেখান থেকে সবুজ বাতি পেয়ে তিব্বতের পথে রওনা হলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে তিনজন রাশিয়ান এবং একজন তরুণ আমেরিকান ছাত্রও আছে। ছাত্রটার নাম বেসাক।

বিদেশিদের যাতে কোনও রকম হয়রানি করা না হয় এ-ব্যাপারে সীমান্ত চৌকি আর টহলরত পুলিশদের সতর্ক করে দেওয়ার জন্য লাসা থেকে সব সীমান্তে দূত পাঠানো হলো।

আমেরিকান রাষ্ট্রদূত তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে কুয়েন লানের পর্বতের ওপর দিয়ে একটা ছোট ক্যারাভেন নিয়ে এগোচ্ছেন। ভ্রমণের ধকল ভালোই সামলে নিচ্ছে উটচালকরা। তাঁরা যে সীমান্ত দিয়ে তিব্বতে আসবেন দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারের দূত সময়মতো সেই স্পটে পৌঁছাতে পারল না।

এদিকে মাল-পত্রে বোঝাই এক ডজন বাহনের ক্যারাভ্যান দেখে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ফাঁড়ির সৈন্যরা। কারা আসছে বা তাদের উদ্দেশ্য কী ইত্যাদি কিছুই জানার প্রয়োজনবোধ করল না তারা, সরাসরি ক্যারাভ্যানে গুলি করে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আর দুইজন রাশিয়ানকে মেরে ফেলল।

তিন নম্বর রাশান আহত হলেন। একমাত্র বেসাক অক্ষত অবস্থায় কিছুদূর পালাতে পারল। কিন্তু তাড়া করে তাকেও ধরে ফেলল সৈন্যরা। বেসাককে নিয়ে যাওয়া হলো জেলে, আর আহত রাশানকে পাঠানো হলো জেলা সরকারের কাছে। রাস্তায় দুজনকে নানরকম ভয়-ভীতি দেখাল সৈন্যরা। ফিল্ড গ্লাস আর ক্যামেরার মতো দামী

BanglaBook.org

জিনিস দেখে সৈন্যরা আনন্দে আত্মহারা।

সামনের পনপোসে পৌঁছাবার আগেই সরকারী দূতের সঙ্গে দেখা হলো তাদের। বার্তাবাহকের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীও আছে। তারা জানাল বিদেশিদের সঙ্গে অতিথির মতো ব্যবহার করতে হবে।

মুহূর্তের মধ্যে সৈন্যদের আচরণ পাল্টে গেল। বিদেশিদের সঙ্গে কে কত বিনয়ী আচরণ করতে পারে, সৈন্যদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল তারই প্রতিযোগিতা।

তবে যে ক্ষতিটা হয়ে গেছে সেটা অপূরণীয়। জেলা সরকার পুরো ঘটনার বর্ণনা দিয়ে লাসায় একটা রিপোর্ট পাঠালেন। এইরকম আকস্মিক খবরে দিশেহারা হয়ে পড়ল লাসা কর্তৃপক্ষ। ঘটনাটা যে ইচ্ছাকৃত নয় এবং তারা এ-জন্য অনুতপ্ত, সেটা বোঝার জন্য এমন কিছু নেই যা লাসা কর্তৃপক্ষ করছে না।

ইন্ডিয়ার হাসপাতালে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন আর্দালীকে কিছু উপহার দিয়ে পাঠানো হলো বাসাক আর আহত রাশানের কাছে। তাদেরকে লাসায় আমন্ত্রণ জানানো হলো। ক্যারাভ্যানে যে গুলি করেছে তাকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য বাসাক আর আহত রাশানকে সাক্ষী দেয়ার প্রস্তাব দিল কর্তৃপক্ষ।

সামান্য ইংরেজি জানা একজন উঁচুপদের কর্মকর্তা তাদের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বাসাক একজন সাদা চামড়ার মানুষের সঙ্গে কথা বলতে স্বস্তিবোধ করবে—এই ভেবে আমিও তাঁর সঙ্গে যাব বলে ঠিক করলাম। আশা করছি তাকে বোঝাতে পারব যে পুরো ঘটনাটার জন্য তিব্বত সরকার কোনওভাবেই দায়ী নয়। যাই হোক, প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে তার সঙ্গে দেখা করলাম আমরা।

রাস্তার পাশে একটা তাঁবু থেকে তাদেরকে নতুন জুতো আর পোশাক দেয়া হলো। একজন কুক, একজন চাকরসহ একটা বাগান বাড়িতে থাকতে দেওয়া হলো তাদেরকে। সৌভাগ্যই বলতে হবে রাশান ভদ্রলোক খুব বেশি আহত হননি। কিছুদিন পর ক্রাচে ভর দিয়ে বাগানে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করলেন তিনি। পুরো একমাস লাসায় থাকলেন তাঁরা।

এই একমাসে বেসাকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছি আমি। বলা যায় আমরা দুজন বন্ধু হয়ে গেছি। এখন আর আগের মতো তিব্বতের প্রতি তার মনে কোনও ক্ষোভ নেই। তবে জেলা সরকারের কাছে যাওয়ার সময় যেসব সৈন্য তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিল তাদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত বলে মনে করে সে। অপরাধীদের বিচারের সময় তাকে উপস্থিত থাকবার অনুরোধ করা হলো, যাতে সে বুঝতে পারে বিচারে কোনও অনিয়ম বা কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে না।

শাস্তি হিসাবে অপরাধীদের একের পর এক চাবুক মারা হচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে শাস্তি কিছুটা কমাবার কথা বলল সে।

মৃত রাষ্ট্রদূত এবং দুজন রাশানকে শেষ সম্মান জানাবার জন্য পশ্চিমা রীতি-নীতি অনুযায়ী সবকিছু করা হলো। চ্যাঙথ্যাঙে তাঁদের কবরের ওপর কাঠের ক্রুশ বসানো হয়েছে।

বিদায় নেওয়ার আগ মুহূর্তে দালাই লামার সঙ্গে দেখা করল বেসাক। তারপর

BanglaBook.org

সিকিমের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। সেখানে স্বদেশী মানুষের দেখা পাবে সে।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে দেশে খারাপ সময় এলে তিব্বতী সরকার শুধু প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করাটাকে যথেষ্ট বলে মনে করে না। সরকার চান দেশ রক্ষার যুদ্ধে মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তিকেও কাজে লাগাতে।

আগেই বলেছি তিব্বতে ধর্মকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই দিক দিয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এমন কি নতুন অধ্যাদেশ জারি এবং নতুন কর্মচারীদের নিয়োগও দেওয়া হয় ধর্মের কারণে। দল গঠন করার জন্য অফিস থেকে প্রচুর টাকা দেওয়া হয়।

দলটা চিৎকার করে পবিত্র ধর্ম-গ্রন্থ পড়তে থাকে। এই সময় সন্ন্যাসীদেরকে সেখানে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। নতুন প্রার্থনা পতাকা টাঙানো হয় সব জায়গায়। মন্দিরে মন্দিরে উপহার দেওয়ার পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়। তিব্বতীদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ধর্মীর শক্তিই যথেষ্ট। এই সময় হঠাৎ রেডিও পিকিং থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো আর কিছুদিনের মধ্যেই তিব্বত স্বাধীন হয়ে যাবে।

আনন্দে ফেটে পড়ল পুরো লাসা। বলাই বাহুল্য, ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জমকালো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এত বছর হয়ে গেল তিব্বতে আছি, কিন্তু কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এত লোক সমাগম হতে দেখিনি। মনে হচ্ছে দেশের সব মানুষ লাসার সরু গলিগুলোতে এসে ভিড় জমিয়েছে। তবে আমার ধারণা, ধর্মের প্রতি তিব্বতীর জোরালো বিশ্বাস তাদের সোনার দেবতাদেরকে প্রভাবিত করতে পারে না। বাইরে থেকে সাহায্য না এলে তিব্বতীদের ধর্মীয় বিশ্বাস তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না।

যাই হোক, দালাই লামা আবার এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ছবি তুলতে বললেন আমাকে। নববর্ষের বিশাল উৎসবের চার সপ্তাহ পর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটা মাত্র দশদিন চললেও আয়োজনটা এতই জমকালো ছিল যে সেটা নববর্ষের উৎসবকেও ছাড়িয়ে গেল।

পোটালার নিচে শু নামে একটা শহরে প্রিন্টিং প্রেস আছে। প্রেসের দালানটা বেশ উঁচু আর কালো রঙের। ওটার ভিতর থেকে কখনোই কোনও আওয়াজ বাইরে আসে না। যন্ত্রপাতি না থাকায় শুধু সন্ন্যাসীদের কথা এক হল থেকে আরেক হলে প্রতিধ্বনিত হয়। শুধু নতুন কোনও বই ছাপার প্রয়োজন হলেই সন্ন্যাসীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া সারাদিন অলস সময় কাটাতে হয় তাদের।

কোনও মেশিন না থাকায় হাত দিয়ে সব কাজ করতে হয় সন্ন্যাসীদের। প্রথমে কাঠের ওপর হরফ খোদাই করা হয়। তারপর হরফগুলোয় রঙ লাগিয়ে ছাপ দেওয়া হয় বিশেষ ধরনের কাগজের ওপর। কাগজের দুদিকেই লেখা থাকে। ছাপানোর পর বইগুলো বাঁধানো হয় না। দুদিকে কাঠের টুকরো দিয়ে মোড়া থাকে। বইগুলো খুব যত্নসহকারে ব্যবহার করা হয়।

বাসায় এসব বই সিল্কের কাপড় দিয়ে মোড়া থাকে। বেশিরভাগ বইয়ের বিষয়-বস্তু ধর্মীয়, তাই পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য বইগুলো রাখা হয় বেদির ওপর।

BanglaBook.org

তিব্বতীদের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ধর্মকে কেন্দ্র করে। নকশা, ভাস্কর্য, কবিতা, চিত্রশিল্প–সবকিছুতেই প্রতিফলিত হয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস আর মন্দির তথা বৌদ্ধবিহারের শক্তি। তবে এখনও তিব্বতে ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে কোনও বিরোধ সৃষ্টি হয়নি।

কবিতা আর গান মূলত গাছের পাতার ওপর লেখা হয়। কিন্তু এগুলো কখনও সংরক্ষণ করা হয় না। তবে ষষ্ঠ দালাই লামার লেখা কবিতাগুলো ছিল এই নিয়মের ব্যতিক্রম। তাঁর কবিতা ভলিউম আকারে ছাপানো হয়েছিল।

বেশ আগে সেটার একটা কপি কিনেছিলাম আমি। মাঝে-মধ্যে সময় পেলেই পড়ি। ভালোবাসা পাওয়ার জন্য একজন কবির যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা সেটা বেশ ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়। তিব্বতীরা প্রায়ই তাঁর কবিতার প্রশংসা করে। এখন পর্যন্ত যে কয়জন দালাই লামা ক্ষমতায় এসেছেন তাঁদের মধ্যে তাঁকেই সবচেয়ে আদর্শবান বলে মনে করা হয়।

প্রতি বছর শরৎকালে পোটালা রাজপ্রাসাদসহ সব বাড়ি আর মন্দির রঙ করা হয়। রাজপ্রাসাদের উঁচু দেয়ালগুলো রঙ করা খুব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। বছরের পর বছর নির্দিষ্ট কিছু শ্রমিক এই কাজ করে। মোষের লোম দিয়ে তৈরি দড়ির দু-পাশে দুপা ঝুলিয়ে এই কাজ করে ওরা। পাশেই মাটির একটা পাত্রে রঙ থাকে। পাহাড়ের মতো উঁচু রাজপ্রাসাদের সাদা দেয়ালগুলোর দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

এ-সময় দালাই লামা রাজপ্রাসাদ রঙ করার ছবি তুলতে বললেন আমাকে। তাঁর নির্দেশ পেয়ে খুব খুশি হলাম আমি। দেয়াল রঙ করার কিছু ছবি তুললাম। শ্রমিকরা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করছে।

দড়িতে বসে জীবন আর মৃত্যুর মাঝে দুলছে তারা, এরকম কয়েকটা ছবি তুললাম। একশ'জন শ্রমিক টানা চোদ্দো দিন পরিশ্রম করে কাজটা শেষ করল।

ছবি তুলতে গিয়ে রাজপ্রাসাদের সবগুলো ঘরে ঢোকার সুযোগ পাচ্ছি। যুগ যুগ ধরে জানালাগুলো বন্ধ থাকায় বেশিরভাগ ঘরই অন্ধকার। গৌতম বুদ্ধের পুরনো কিছু মূর্তি দেখলাম। সামনে প্রদীপ জ্বালানো তো দূরের কথা, ধুলোর আস্তরণে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে মূর্তিগুলো। অবহেলায় পড়ে থাকা এ-সব মূর্তির সামান্য কিছু অংশ বিশ্বের বিভিন্ন জাদুঘরে দেওয়া হলে নিঃসন্দেহে সেগুলোর গুরুত্ব এবং আকর্ষণ আরও অনেক বাড়বে।

আমার সহকারী পোটালা রাজপ্রাসাদের আরেকটা অদ্ভুত জিনিস দেখাল। ছাদকে মজবুত করার জন্য পিলারের নিচে গোঁজ দেওয়া হয়েছে। পোটালা রাজপ্রাসাদের বয়স কম হয়নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব জিনিসই ক্ষয় হয়। এটাও তার ব্যতিক্রম নয়। ভবনের কিছু অংশ নিচে ডেবে গিয়েছিল। কিন্তু লাসার দক্ষ কারিগররা আবার সেটাকে জায়গামতো নিয়ে এসেছে। ভবন মেরামতের আধুনিক কলাকৌশল কিছুই তাদের জানা নেই, অথচ কাজটা তারা যেভাবে করেছে তাতে তাদের প্রশংসা না করে উপায় নেই।

রাজপ্রাসাদ রঙ করার কিছু দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করেছি আমি। ডেভলপ করার জন্য সেগুলো ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে দিলাম।

একদিন হঠাৎ লবস্যাঙ আমাকে ছবি দেখার জন্য একটা থিয়েটার বানাবার প্রস্তাব

BanglaBook.org

দিল। ইচ্ছেটা মূলত দালাই লামার। এতদিনে আমরা জেনে গেছি লাসায় কাউকে 'না' বলার নিয়ম নেই। এমন কি যে কাজের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে সেটা সম্পর্কে কোনও কিছু না জানলেও 'না' বলা যাবে না।

ইতিমধ্যে অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করতে পারায় 'সব কাজের ওস্তাদ' খেতাব জুটে গেছে আমাদের কপালে। দালাই লামার প্রজেক্টর চালাতে কতটুক বিদ্যুৎ লাগবে আর স্ক্রিন থেকে ওটা কতদূরে রাখতে হবে, হিসাব করে এ-সব জানার পর লবস্যাঙকে বললাম, কাজটা হাতে নেওয়ার জন্য আমি তৈরি।

দালাই লামা নরবুলিংকায় আসার বেশ আগেই থিয়েটার বানাবার কাজ শেষ করলাম আমি। ওটা তাঁর পছন্দ হবে কিনা সে ব্যাপারে খুব চিন্তায় আছি। লবস্যাঙের কাছ থেকে এ-ব্যাপারে সব খবর পাব। প্রথমবার ছবি দেখার সময় সে অবশ্যই থিয়েটারে উপস্থিত থাকবে।

এই প্রথম দালাই লামা ছবি দেখবেন, তাই একটা উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়েছে নরবুলিংকায়। ইতিমধ্যে পোটালা থেকে রওনা হয়েছেন তিনি।

মিছিলের ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা হাতে তৈরি হয়ে আছি আমি। খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

মিছিল নিয়ে নরবুলিংকায় পৌঁছে গেছেন দালাই লামা। পাশ কাটাবার সময় তাঁর একটা ছবি তুললাম। ব্যাপারটা খেয়াল করে আমার উদ্দেশে হাসলেন তিনি।

আমার ধারণা নিজের ছবি তোলার দৃশ্য দেখে খুব খুশি হয়েছেন দালাই লামা। জানি আমার এই ধারণা অন্য কারও সঙ্গে মিলবে না। চোদ্দো বছর বয়সের নিঃসঙ্গ একটা ছেলে নিজের ছবি তোলার দৃশ্য দেখে হাসবে–এটাই তো স্বাভাবিক। তবে সহকারীর চেহারার বিনয়ী আর নম্রভাব আমাকে মনে করিয়ে দিল আমি ছাড়া তিব্বতের সবাই বিশ্বাস করে দালাই লামা নিঃসঙ্গ একটা ছেলে নন, তিনি একজন সৃষ্টিকর্তা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চোদ্দো

দালাই লামার শিক্ষক

কুনদিনের মুখোমুখি / বন্ধু এবং শিক্ষক হওয়ার সৌভাগ্য / তিব্বতে লালচিনের হামলার আশঙ্কা / ভূমিকম্প এবং অন্যান্য অশুভ সংকেত

নরবুলিংকায় সিনে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার পর ঘোড়ায় চড়ে বাসায় ফিরছি। আমার বাসা লাসা শহরের কিনারায়।

এ-সময় কয়েকজন দেহরক্ষী এসে দাঁড়াল আমার কাছে। কি কারণে জানি না, তাদেরকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে। আমার খোঁজে এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে তারা যায়নি। এখুনি একবার সামার গার্ডেনে যেতে হবে আমাকে। কিন্তু কী হয়েছে সে-ব্যাপারে কিছু জানাতে পারল না তারা।

প্রথমেই আমার মনে হলো সিনেমার যন্ত্রপাতিগুলো হয়তো ঠিকভাবে কাজ করছে না। তবে এরকম সামান্য একটা ব্যাপারে দালাই লামা আমাকে ডাকছেন, এও ঠিক মেনে নিতে পারছি না।

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে আবার নরবুলিংকা ফিরে গেলাম আমি। সবকিছু শান্তিপূর্ণ আর স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। দূর থেকে দেখলাম হলুদ গেটের পাশে দুজন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি আসার ইঙ্গিত করল তারা।

গেটের কাছে পৌঁছাতেই পথ দেখিয়ে আমাকে ভিতরের বাগানে নিয়ে গেল সন্ন্যাসীরা। সেখানে লবস্যাঙ স্যামটন অপেক্ষা করছিল। আমার হাতে সাদা একটা চাদর ধরিয়ে দিয়ে কানে ফিসফিস করে কী যেন বলল সে, বোঝা গেল না। তবে মনে হচ্ছে, এরপর দালাই লামা স্বয়ং আমাকে রিসিভ করতে আসবেন।

থিয়েটারে ঢোকার জন্য গেট খুলতে যাব, এই সময় ভিতর থেকে খুলে গেল গেটটা। পরমুহূর্তে গৌতম বুদ্ধের প্রতিনিধির সামনে দেখতে পেলাম নিজেকে। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে তাঁকে সম্মান জানিয়ে মাথা নোয়ালাম। তারপর লবস্যাঙের দেওয়া চাদর তাঁর হাতে দিলাম। বাম হাতে চাদর নিয়ে ডান হাত দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করলেন তিনি।

মাথা নিচু করে তিনজন অধ্যক্ষ অপেক্ষা করছেন থিয়েটারে। তাঁরা দালাই লামার

BanglaBook.org

অভিভাবক। তাঁদেরকে আমি ভালোভাবেই চিনি। খেয়াল করলাম খুব ঠাণ্ডা একটা ভাব নিয়ে আমার শুভেচ্ছা ফিরিয়ে দিলেন তাঁরা। নিজেদের রাজ্যে আমার এই অনাহূত প্রবেশকে ভালো চোখে দেখছেন না। কিন্তু দালাই লামার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস তাঁদের নেই।

দালাই লামা খুব ভালো ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে। তাঁর সারামুখে অদ্ভুত এক শিশুসুলভ হাসি খেলা করছে। একের পর এক প্রশ্ন করে আমাকে অস্থির করে তুলছেন তিনি। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে এতদিন তিনি বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে একটা নির্জন জায়গায় বসে একাকী গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। আজকে কথা বলার একজন মানুষ পেয়েছেন সামনে। তাই একবারেই সবকিছু জেনে নেয়ার চেষ্টা করছেন।

প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে কিছুটা ভাবনা-চিন্তার দরকার, কিন্তু তিনি সেই সময়ও আমাকে দিচ্ছেন না। একের পর এক শুধু প্রশ্ন করেই যাচ্ছেন, উত্তর শোনারও ধৈর্য নেই তাঁর। তারপর আমাকে প্রজেক্টরের কাছে ঠেলে দিলেন। একটা ছবি দেখার জন্য অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছেন দালাই লামা।

জাপানের আত্মসমর্পণ করার একটা প্রামাণ্যচিত্র দেখবেন তিনি। আমার সঙ্গে প্রজেক্টরের কাছে এলেন দালাই লামা। আর তিনজন পুরোহিতকে দর্শক হিসাবে থিয়েটারে ফিরে যেতে বললেন।

প্রজেক্টরে কাজ করার সময় নিশ্চয়ই খুব বেশি সময় নিচ্ছিলাম আমি। কারণ দালাই লামা অধৈর্য হয়ে আমাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে নিজেই কাজ শুরু করে দিলেন। আমার চেয়ে তাঁর কাজের গতি অনেক দ্রুত–এটা দেখিয়ে খুব মজা পাচ্ছেন তিনি। কথায় কথায় আমাকে জানালেন পুরো শীতকালটা এসব যন্ত্রপাতি নিয়েই কাটিয়েছেন। শুধু তাই নয়, একটা প্রজেক্টরের সবকিছু খুলে আবার সেটাকে জোড়াও লাগিয়েছেন। বুঝতে পারলাম কোনও জিনিসের সবটুকু যাচাই না করে তিনি ক্ষান্ত হন না। যে-কোনও জিনিসের একেবারে শেষটা দেখা চাই তাঁর।

নতুন কিছু তো আছেই, সেই সঙ্গে অর্ধেক মনে আছে কিংবা বেশিরভাগ ভুলে গেছি–এমন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। তাঁর প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর খুব বুঝে-শুনে দিতে হয় আমাকে। কারণ জানি আমার দেওয়া উত্তরগুলোই পশ্চিমা দেশগুলো সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের ভিত রচনা করবে।

যন্ত্রপাতির ব্যাপারে তাঁর প্রতিভা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। কারও কোনও সাহায্য না নিয়ে প্রজেক্টরের সব কল-কবজা খুলে আবার সেটা ঠিকভাবে লাগানো চোদ্দো বছরের একটা ছেলের পক্ষে অসম্ভব। এমন কি ইংরেজি জানে না বলে কোনও প্রসপেক্টাসের সাহায্য নিতেও পারেননি তিনি।

ছবি খুব ভালোভাবেই চলছে। প্রজেক্টিং রুমে বসে ওয়ালের পিপ হোলে চোখ রেখে ছবি দেখছি আমরা। দেখা আর শোনা, দুটোতেই খুব আনন্দ পাচ্ছেন তিনি। মাঝে-মাঝে উত্তেজিতভাবে আমার হাত চেপে ধরছেন। অরুণ্যের প্রাণবন্ত ভাবটা পরিষ্কার ফুটে

BanglaBook.org

উঠছে তাঁর চোখে-মুখে।

এই প্রথম কোনও সাদা চামড়ার মানুষের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন দালাই লামা, অথচ তাঁর মধ্যে কোনও অস্বস্তি বা জড়তা নেই। রিলে নতুন একটা ছবি দিয়ে আমার হাতে মাইক্রোফোন গুঁজে দিলেন। আমাকে মাইক্রোফোনে কথা বলার অনুরোধ করে পিপ হোল দিয়ে থিয়েটারে কার্পেটের ওপর বসে থাকা তাঁর তিন শিক্ষককে দেখতে লাগলেন।

এতক্ষণে তাঁর উদ্দেশ্য পরিষ্কার হলো আমার কাছে। লাউডস্পিকারে হঠাৎ কারও গলা শুনে পুরোহিতদের কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটাই দেখতে চাচ্ছেন তিনি। তাঁকে হতাশ করতে চাইলাম না। তাই মাইক্রোফোনে ঘোষণা করলাম 'আপনারা যে যেখানে বসে আছেন সেখানেই থাকুন। পরের ছবিতে তিব্বতের সুন্দর কিছু দৃশ্য দেখানো হবে।'

পুরোহিতদের চমকানো আর এদিক-ওদিক মাথা ঘোরানো দেখে হেসে উঠলেন দালাই লামা। এর আগে এই আধ্যাত্মিক নেতার সামনে কখনও এরকম হালকা রসিকতা করা হয়নি। তাঁর চোখের উজ্জ্বল চাহনি দেখে বুঝলাম পরিবেশটা তিনি উপভোগ করছেন।

এবার লাসায় তোলা ছবির দৃশ্য দেখতে চাইলেন তিনি। এ-ব্যাপারে তাঁর মতো আমিও খুব কৌতূহলী। কারণ এটাই আমার জীবনের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি। দক্ষ কেউ থাকলে সে হয়তো কিছু ভুল-ত্রুটি খুঁজে পেত। তবে আমাদের চোখে ছবির সবকিছুই খুব ভালো লাগছে।

ছবিতে নববর্ষের 'ছোট্ট' উৎসবের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। কাঁপা কাঁপা পরদায় নিজেদেরকে দেখে পুরোহিতরা পর্যন্ত তাদের গম্ভীর ভাব ধরে রাখতে পারলেন না।

হঠাৎ একজন মন্ত্রীর পুরো ছবি দেখা গেল পরদায়। অনুষ্ঠানের কথা ভুলে ঘুমাচ্ছেন তিনি। দৃশ্যটা দেখে হো হো করে হেসে উঠল সবাই। তাদের হাসিতে কোনও বিরূপ ভাব নেই। কারণ এই ধরনের দীর্ঘ অনুষ্ঠানে পুরোহিতদেরও ঘুম পায়।

মন্ত্রীর ঘুমিয়ে পড়ার দৃশ্যটা দালাই লামা দেখেছেন–যেভাবেই হোক সমাজের অভিজাতশ্রেণীর মানুষেরা এটা জানতে পারল। এরপর আমি ক্যামেরা নিয়ে কোনও অনুষ্ঠানে গেলেই তাঁরা সবাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পোজ দেন

ছবি দেখাটা আর সবার চেয়ে বেশি উপভোগ করছেন দালাই লামা। তাঁকে সবসময় দেখেছি ধীর-স্থির, শান্তভাবে চলাফেরা করতে। তবে আজকে নিয়মের সব বেড়াজালের কথা ভুলে গেছেন তিনি। তাঁর চলাফেরার মধ্যে স্বাভাবিক তারুণ্যের চঞ্চলতা চোখে পড়ার মতো। ছবি দেখতে দেখতে প্রবল উৎসাহে একের পর এক মন্তব্য করছেন তিনি।

কিছুক্ষণ পর তাঁর নিজের বানানো ছবি চালাবার অনুরোধ করলাম আমি। কিন্তু রাজী হলেন না তিনি। তবে আমিও নাছোড়বান্দা। জানতে ইচ্ছা করছে তাঁর ছবি তোলার বিষয়গুলো কী হতে পারে। যদিও জানি বাছ-বিচার করার মতো খুব বেশি বিষয় তাঁর হাতে নেই।

BanglaBook.org

অনেক জোরাজুরি করাতে নিজের ছবি দেখাতে রাজী হলেন দালাই লামা। লাসা উপত্যকার বিশাল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন নিজের ছবিতে। তবে দৃশ্যটা তিনি ধারণ করেছেন খুব দ্রুত। অভিজাত ঘোড়সওয়ারদের ছবি ভেসে উঠল পরদায়। তারা শু-র মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এরপর পরদায় দালাই লামার কুকের ছবি দেখা গেল। খুব কাছ থেকে ছবি তোলায় তাকে দেখতে হাস্যকর লাগছে। জীবনে এই প্রথম ছবি তুলেছেন তিনি। তারচেয়ে বড় কথা কাজটায় তিনি কারও সাহায্য নেননি।

ছবি দেখানো শেষ হবার পর মাইক্রোফোনে অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার ঘোষণা দিলেন তিনি। তারপর থিয়েটারে ঢুকে পুরোহিতদের বিদায় জানালেন। আমার কাছে আবার পরিষ্কার হয়ে গেল যে এখানে দালাই লামা কারও হাতের পুতুল নন। তিনি একজন সোজা-সাপ্টা, পরিচ্ছন্ন মানুষ। তাই সবার ওপরই তিনি তাঁর প্রভাব খাটাতে পারছেন।

পুরোহিতরা চলে যাওয়ার পর ফ্লিমগুলো পরিষ্কার করে একটা হলুদ কাপড় দিয়ে মেশিনটা ঢেকে রাখলাম। তারপর চমৎকার একটা কার্পেটে পায়ের ওপর পা তুলে বসলাম। ভাগ্যই বলতে হবে এভাবে বসার অভ্যাস আছে আমার। অভ্যাস না থাকলে বেশ সমস্যাতেই পড়তে হতো। কারণ দালাই লামার বাসায় কোনও চেয়ার বা কুশন নেই।

দালাই লামার সামনে মন্ত্রীরাও বসার অনুমতি পান না। তাই তিনি আমাকে বসতে বলাতে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছি। ইচ্ছে হচ্ছে কিছু একটা বলে তাঁর প্রস্তাবটা এড়িয়ে যাই। কিন্তু কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে জামার আস্তিন টেনে বসতে বাধ্য করলেন আমাকে।

কথায় কথায় জানালেন এই ধরনের একটা মিটিং করার জন্য অনেক দিন ধরে ভাবছিলেন। বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে জানতে চান তিনি। তাঁর ধারণা প্রশাসক এই মিটিংটাকে ভালো চোখে দেখবেন না। তবে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। যে করেই হোক, আমার সঙ্গে তিনি আলোচনা চালিয়ে যাবেন।

প্রশাসক প্রতিবাদ করলে তার উত্তরে কী বলবেন সেটাও ঠিক করে রেখেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও সমানভাবে পারদর্শী হবেন। তাঁর ধারণা, এ-ব্যাপারে একমাত্র আমিই তাঁকে সাহায্য করতে পারব।

তিনি জানেন না আগেও আমি শিক্ষকতা করেছি। তা যদি তিনি জানতেন তাহলেও হয়তো খুব একটা প্রভাবিত হতেন না। একসময় আমার বয়স জানতে চাইলেন তিনি।

সাঁইত্রিশ বছর বয়স শুনে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। হলুদ চুল দেখে অনেক তিব্বতীর মতো তাঁরও মনে হয়েছে আমার বেশ বয়স হয়েছে। ছেলেমানুষী কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। আমার লম্বা নাক নিয়ে কৌতুক করতেও ছাড়লেন না।

আসলে ইউরোপিয়ানদের স্বাভাবিক লম্বা নাক সহজেই চ্যাপ্টা নাকঅলা

BanglaBook.org

মঙ্গোলিয়ানদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। তারপর হঠাৎ আমার হাতের উল্টো পিঠে অসংখ্য লোম দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি। বললেন 'হেনরিগ, তোমার শরীর দেখছি বাদরের মতো লোমে ঢাকা!'

দালাই লামার এরকম মন্তব্যে পরিবেশটা আগের চেয়ে আরও সহজ হয়ে গেল। এখন কোনওরকম অস্বস্তি ছাড়া কথা বলছি আমরা। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণটা এখন আমি অনুভব করছি। এর আগেও তাঁর সঙ্গে আমার কয়েকবার দেখা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো ক্ষণিকের জন্য। তখনই তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়েছিলাম।

বেশিরভাগ তিব্বতীর তুলনায় তাঁর মুখের রঙ বেশ উজ্জ্বল। আর ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁর চোখগুলোকে কোনওভাবেই ছোট বলা যাবে না। তারুণ্যদীপ্ত চোখ দুটো সারাক্ষণ চঞ্চল হয়ে আছে। উত্তেজনায় মুখটা লাল। বসার পর সারাক্ষণ একদিক থেকে আরেকদিকে দুলছেন তিনি। তাঁর কান লম্বা। এটা গৌতম বুদ্ধের একটা বৈশিষ্ট্য।

পরে আমি জানতে পেরেছি জন্ম হওয়ার পর এটা দেখেই সবাই বুঝতে পারে তিনি গৌতম বুদ্ধের প্রতিনিধি হিসাবে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন। প্রথা অনুসারে তাঁর মাথায় চুল না থাকারই কথা। সম্ভবত পোটালার প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য ছোট করে হলেও চুল রেখেছেন তিনি। বয়সের তুলনায় তাঁকে লম্বাই বলতে হবে। দেখে মনে হচ্ছে কিছুদিনের মধ্যে বাবা-মাকেও ধরে ফেলবেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে একটানা দীর্ঘসময় চেয়ারে বসে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়াশোনা করতে হয় বলে হাঁটাচলা করতে কিছুটা সমস্যা হয় দালাই লামার। তাঁর হাত দুটো খুব আকর্ষণীয়। লম্বা আঙুলগুলো অদ্ভুত শান্তিময় ভঙ্গিতে ভাঁজ করে রাখেন।

খেয়াল করে দেখেছি কথা বলার সময় কোনও বিষয়ে জোর দেওয়ার জন্য যখন আমি হাত নাড়ি তখন আমার হাতের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন দালাই লামা। উত্তেজিত হয়ে অঙ্গভঙ্গি করা তিব্বতীদের স্বভাবে নেই।

দালাই লামা সবসময় সন্ন্যাসীদের মতো একটা লাল রঙের আলখেল্লা পরে থাকেন। একসময় গৌতম বুদ্ধ এইরকম লাল আলখেল্লা পরতেন। আশ্রমের কর্তাদের পোশাকের সঙ্গে দালাই লামার পোশাকের কোনও পার্থক্য নেই।

খুব দ্রুত সময় পার হয়ে যাচ্ছে। দালাই লামার মনে এতদিন হাজার হাজার প্রশ্ন জমা ছিল। আজকে বাঁধ ভেঙে গেছে। আমাকে তিনি প্রশ্নের বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছেন। শুধু বই আর খবরের কাগজ পড়ে নানা বিষয় সম্পর্কে জানেন তিনি। তাঁর কাছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওপর লেখা সাত ভলিউমের একটা ইংরেজি বই আছে। বইটা তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছেন তিনি।

এ্যারোপ্লেন, কামান আর ট্যাঙ্কের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে তিনি জানেন। চার্চিল, আইসেনহাওয়ার আর মোলোটভের মতো বিখ্যাত লোকের নাম তাঁর জানা আছে। কিন্তু

BanglaBook.org

কাউকে প্রশ্ন করতে না পারায় কী কারণে এঁরা বিখ্যাত হয়েছেন তা তিনি জানেন না। তবে এখন তিনি খুব খুশি। কারণ বছরের পর বছর যে-সব প্রশ্ন নিয়ে তিনি ধাঁধার মধ্যে ছিলেন এখন সেগুলোর উত্তর দেওয়ার মতো একজনকে পেয়ে গেছেন।

যাই হোক, এতক্ষণে নিশ্চয়ই তিনটে বেজে গেছে। এ-সময় স্বপন খেনপো এসে জানিয়ে গেলেন খাবারের সময় হয়েছে। তিনি একটা মঠের অধ্যক্ষ। দালাই লামার শারীরিক দিকটা দেখভাল করাই তাঁর কাজ। তিনি খাবারের কথা বলতেই আমি উঠে পড়লাম। কিন্তু গড কিং আবারও আমাকে টেনে বসিয়ে অধ্যক্ষকে কিছুক্ষণ পর আসতে বললেন।

তারপর একটা ব্যায়ামের বই নিয়ে এলেন আমার কাছে। বইটার প্রচ্ছদে নানারকম ছবি আঁকা। পাতা উল্টে দেখি ল্যাটিন হরফে বড় হাতের অক্ষরগুলোর প্রতিলিপি করা হয়েছে। দালাই লামার জ্ঞানের বিচিত্রতা যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি আমি। কঠিন ধর্মীয় পড়াশোনা, জটিল যন্ত্রপতি নিয়ে গবেষণা, সেই সঙ্গে এখন আবার যোগ হয়েছে আধুনিক ভাষা।

সত্যি অবিশ্বাস্য! দালাই লামার বয়স চোদ্দ বছর—ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে এখন কষ্ট হচ্ছে আমার। কথায় কথায় জানালেন খুব তাড়াতাড়ি আমার কাছ থেকে ইংরেজি শেখা শুরু করতে চান।

সুপন খানপোকে আবার আসতে দেখে বুঝলাম ইতিমধ্যে আরেক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। খাবার জন্য এবার কিছুটা জোর করলেন তিনি। বললেন, তাঁর মালিকের সময়মতো খাওয়া উচিত। ট্রেতে করে কেক, রুটি আর ভেড়ার দুধ দিয়ে বানানো পনির নিয়ে এসেছেন তিনি। দালাই লামা ট্রেটা হাতে নিয়ে আমার দিকে ঠেলে দিলেন। খাবেন না!

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বারণ করলাম। কিন্তু আমার কথায় কান দিলেন না তিনি। একটা সাদা কাপড়ে খাবারগুলো মুড়ে দিলেন যাতে ওগুলো আমি বাসায় নিয়ে যেতে পারি।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে আজকের মতো এখানেই আমাকে ছেড়ে দিচ্ছেন দালাই লামা। খুব নরম সুরে সুপন খানপোকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললেন। একজন স্নেহময়ী পিতার মতো দালাই লামার দিকে তাকালেন সুপেন, তারপর চলে গেলেন। এই প্রবীণ অধ্যক্ষ অনেক দিন ধরেই দালাই লামার পরিবারে আছেন। তেরোতম দালাই লামাকেও একই চোখে দেখতেন তিনি। নতুন কর্তা এলেই পুরনো কাজের লোকদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু সুপেন। বিশ্বস্ততা আর কর্তার ওপর তাঁর আনুগত্য—এই দুটো কারণে এখনও তিনি বহাল আছেন।

গ্রীষ্মের সময় নরবুলিংকায় তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব দিলেন দালাই লামা। বললেন, আমাকে নিয়ে আসার জন্য লোক না পাঠানো পর্যন্ত আমি যেন ওখানে অপেক্ষা করি।

BanglaBook.org

বিদায় নেওয়ার সময় আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন তিনি। এটা একদম নতুন কিছু।

জনমানবহীন শূন্য বাগানের মধ্য দিয়ে হাঁটছি। এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না তিব্বতের গড কিং-এর সঙ্গে পাঁচ ঘন্টা সময় কাটিয়েছি আমি। সামনে একটা গেট পড়ল। সেটা খুলতেই মালির দেখা পেলাম। মালিকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোচ্ছি, এ-সময় শুনলাম মালি বাগানের গেটটা লাগিয়ে দিল। সামনেই একজন গার্ড দেখতে পেলাম। আমি এখানে আসার পর ইতিমধ্যে কয়েকবার গার্ড বদল হয়ে গেছে।

ঘোড়ায় চড়ে লাসায় ফিরে যাচ্ছি আমি। দালাই লামার দেওয়া কেকটার কথা মনে পড়ল। একবার সেটার দিকে তাকালাম। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। আমার বন্ধু-বান্ধবদের কেউ কি বিশ্বাস করবে দালাই লামার সঙ্গে টানা পাঁচ ঘন্টা গল্প করেছি আমি!

বলাই বাহুল্য, দালাই লামাকে পড়াবার যে দায়িত্ব পেয়েছি তাতে আমি খুব খুশি। পশ্চিমা বিশ্বের বিজ্ঞান আর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এমন একজনকে শিক্ষা দিতে হবে যিনি কিছুদিন পরই বিশাল একটা দেশের নেতা হবেন। ফ্রান্স, স্পেন আর জার্মানি অনায়াসে ঢুকে যাবে তিব্বতের ভিতর।

সন্ধ্যের সময় জেট প্লেনের গঠন নিয়ে একটু পড়াশোনা করলাম আমি। আমার ছাত্র জেট প্লেন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চেয়েছিলেন। তবে বেশি কিছু জানা না থাকায় তাঁর সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। কথা দিয়ে আসতে হয়েছে পরে এ ব্যাপারে সব প্রশ্নের উত্তর দেব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানারকম বিষয় নিয়ে পড়তে হচ্ছে আমাকে। এই জ্ঞানপিপাসু ছাত্রকে একটা নিয়ম ধরে শিক্ষা দিতে চাই আমি।

লাসায় আমার জীবনযাত্রা নতুন একটা চেহারা পেয়েছে। এখন একটা উদ্দেশ্য আছে আমার। সবদিক দিয়ে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হচ্ছে।

তবে দালাই লামাকে পড়াতে গিয়ে আমি আমার আগের কাজ ছেড়ে দিইনি। এখনও আমি মন্ত্রণালয়ের জন্য খবর সংগ্রহ করি। এখনও সময় পেলেই ম্যাপ আঁকছি। কীভাবে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে বলতে পারব না। কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় প্রতিটি দিনই খুব ছোট মনে হচ্ছে। ইদানিং প্রায়ই গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করছি আমি। নিজের শখ বা বিনোদনের কোনও ব্যবস্থা করতে পারছি না। তবে দালাই লামা যখন ডাকেন তখন কিছুটা অবসর পাই বটে।

কোনও অনুষ্ঠানের দাওয়াত পেলে আর সবার মতো সকালে না গিয়ে দুপুরের দিকে যাচ্ছি। সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেও খুব ভালো সময় কাটাচ্ছি আমি।

দালাই লামার সঙ্গে গল্প করার সময় অনেক কিছু জানতে পারছি। আলোচনাটা এখন দুজনের জন্যই শিক্ষামূলক। তাঁর কাছ থেকে তিব্বতের ইতিহাস আর গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। এ-সব ব্যাপারে তাঁর চেয়ে ভালো

BanglaBook.org

আর কে জানে! ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যুক্তি দিয়ে বোঝালে আমাকে বৌদ্ধ ধর্মের একজন অনুসারী বানাতে পারবেন তিনি।

কথায় কথায় জানিয়েছেন তিনি এমন কিছু বই পড়েছেন যেগুলোতে প্রাচীন অনেক রহস্যের কথা লেখা আছে। কীভাবে শরীর থেকে আত্মাকে আলাদা করা যায় সে-ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যাবে এ-সব বই থেকে। তিব্বতের ইতিহাসে সিদ্ধপুরুষের অসংখ্য গল্প আছে। এরা নিজেদের শরীর থেকে আত্মাকে বের করে কয়েক হাজার মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন কাজ করতে পারেন। দালাই লামা মনে করেন জোরালো বিশ্বাস আর ঠিকভাবে সব নিয়ম পালন করলে তিনিও তাঁর আত্মাকে বেশ দূরে, যেমন সামইয়েতে নিয়ে যেতে পারবেন।

কিছুদিন প্র্যাকটিস করার পর কাজটাতে দক্ষ হয়ে উঠলে আমাকে তিনি সামইয়েতে পাঠাবেন। তারপর লাসায় বসে সামইয়েতে আমার উদ্দেশে নির্দেশ দেবেন তিনি।

আমি হেসে তাঁকে বললাম, 'ঠিক আছে, কুনদিন, আপনি যখন এই কাজটা করতে পারবেন তখন ধরে নেবেন আমিও বৌদ্ধ ধর্মের একজন অনুসারী হয়ে গেছি।' ব্যাপারটা শুধু আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল। এটা নিয়ে আমরা কোনও পরীক্ষা করলাম না।

এ-সময় হঠাৎ কিছু রাজনৈতিক গোলমাল দেখা দেওয়ায় আমাদের পড়াশোনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হলো।

*

ইংলিশ রেডিও অপারেটর, ফক্সের এখন দম ফেলারও ফুসরত নেই। প্রত্যেক মিলিটারি ইউনিটে কমপক্ষে একটা করে ট্রান্সমিটিং সেট রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

রাজনৈতিক ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয় তিব্বতের জাতীয় পরিষদ। এই পরিষদ পঞ্চাশজন ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং আশ্রম কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত। পরিচালক মোট চারজন। এরা সবাই নিজ নিজ এলাকার আশ্রমের অধ্যক্ষ।

ড্রিবাঙ, সেরা আর গেনডেন—এই তিন জায়গা থেকে এঁদেরকে বাছাই করা হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে সবসময় একজন সন্ন্যাসী আর একজন ফাইন্যান্স সেক্রেটারি থাকে। এছাড়া আরও চারজন সদস্য আছেন। তাঁরা ধর্ম নিরপেক্ষ হতে পারেন, আবার না-ও হতে পারেন। এঁরা বিভিন্ন সরকারী অফিসের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। তবে চারজনের কেউই মন্ত্রিসভার সদস্য নন।

নিয়ম হলো পাশের একটা চেম্বারে বসে জাতীয় পরিষদে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো শুধু শুনবেন তাঁরা। তাতে ভেটো দেওয়ার অধিকার তাঁদের নেই। তবে সব ব্যাপারে দালাই লামার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কোনও কারণে তিনি সিদ্ধান্ত দিতে না পারলে তাঁর পরিবর্তে প্রশাসকের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। উঁচু পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের নেওয়া সিদ্ধান্ত ভালো হলো না মন্দ, সেটা বিচার করা তো দূরের কথা, এটা নিয়ে আলোচনা করবে সেই

BanglaBook.org

সাহসই নেই কারও।

দেশের এরকম কঠিন সময়ে রাষ্ট্রীয় পুরোহিতের সঙ্গে বারবার আলোচনা করা হলো। তাঁর ভাষ্য, দেশে খুব খারাপ একটা সময় আসছে। এ-কথা শুনে মনোবল হারিয়ে ফেলছে তিব্বতীরা।

পুরোহিত পরিষ্কার ভাষায় বলছেন–'উত্তর আর পুবদিকের একদল শক্তিশালী শত্রু আমাদের পবিত্র নগরীর জন্যে হুমকি হয়ে দেখা দেবে।' কিংবা 'আমাদের ধর্ম হুমকির সম্মুখীন।'

এ-সব কথা তিনি গোপনে বললেও মানুষের মধ্যে তা জানাজানি হয়ে গেল। এমন কি ব্যাপারটা নিয়ে এমনই ফিসফাস শুরু হয়ে গেল যে তিব্বতের বাইরেও সেটা ছড়িয়ে পড়ল। যুদ্ধ কিংবা দেশের খারাপ সময়ে যেমনটি দেখা যায়, অদ্ভুত অদ্ভুত সব গুজব ডালপালা মেলতে শুরু করে, তিব্বতেও ঠিক তাই ঘটল। দেশজুড়ে সবসময় সব জায়গায় একই বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। যার যা ইচ্ছে তাই বলছে, আবার অন্যের কথাও বিশ্বাস করছে। শত্রু কে সেটা জানা নেই, অথচ দেখা গেল গুজব ছড়িয়ে পড়েছে তারা অসম্ভব শক্তিশালী।

ভাগ্য গণনাকারীদের জন্য সময়টা এখন পোষমাস। দেশের ভবিষ্যৎ তো আছেই, সেই সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য জানার জন্য সবাই ভাগ্য গণনাকারীদের কাছে ছুটে যাচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিটি ঘটনার ভালো বা খারাপ অর্থ বের করছে। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষেরা ইতিমধ্যে তাদের সম্পদ দক্ষিণদিকে কিংবা দূরবর্তী কোনও এস্টেটে পাঠিয়ে দিয়েছে। বেশিরভাগ মানুষের ধারণা এই বিপদ থেকে সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে রক্ষা করবেন। তাদের বিশ্বাস তিনি এমন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটাবেন যার ফলে দেশে যুদ্ধ লাগবে না।

জাতীয় পরিষদ শেষ পর্যন্ত বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারল। পরিচালকরা বুঝতে পেরেছেন অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে দেশ মারাত্মক বিপদে পড়তে পারে। এখনই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ার উপযুক্ত সময়। পুরো বিশ্বকে জানাতে হবে তিব্বত স্বাধীনতা চায়।

চিন দাবী করছে তিব্বত তাদের এলাকার একটা অংশ। তাদের এই দাবীর বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনও প্রতিবাদ করা হয়নি। খবরের কাগজ আর প্রচার মাধ্যমগুলো যা ইচ্ছা তাই বলতে পারে, কিন্তু তিব্বত থেকে কখনোই কিছু বলা হয় না।

বাইরের বিশ্বের সঙ্গে তিব্বতের কোনও সম্পর্ক নেই। সরকার একরকম ইচ্ছে করেই কোনও বিবৃতি দেয় না। এই রকম বোবা সেজে থাকার ফল ভালো হয়নি তিব্বতীরা এখন সরকারী বিবৃতির গুরুত্ব বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছে। বোবায় পর আর দেরি করেনি।

রেডিও লাসা থেকে হিন্দি, তিব্বতি আর ইংরেজি ভাষায় নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার

BanglaBook.org

করছে তারা। সরকারের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো পিকিং, ওয়াশিংটন, দিল্লি আর লন্ডনে লোক পাঠানো হবে। এই অভিযানের সদস্যরা হলেন আশ্রমের কর্মকর্তা আর অভিজাতশ্রেণীর কিছু তরুণ। এরা সবাই ইন্ডিয়া থেকে ইংরেজি শিখেছে। ভাগ্য ভালো যে সরকারের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর অন্যান্য রাষ্ট্রের বাধা-বিঘ্নের কারণে তারা শুধু ইন্ডিয়া পর্যন্ত যেতে পারল।

দালাই লামা পরিস্থিতির গুরুত্ব ভালোই বুঝতে পারছেন। তবে তিনি আশা করেন শেষপর্যন্ত একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান বেরিয়ে আসবে। আমি খেয়াল করেছি প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনায় এই ভবিষ্যৎ শাসকের খুব কৌতূহল।

আমি আর দালাই লামা বেশিরভাগ সময় সিনেমা থিয়েটারে বসে আলোচনা করি। ইতিমধ্যে তাঁর কয়েকটা আচরণে বুঝতে পেরেছি আমার দেখা পাওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে থাকেন। আমি আসছি এটা বুঝতে পেরে শুভেচ্ছা জানাবার জন্য প্রায়ই নিজের সিংহাসন ছেড়ে দৌড়ে বাগানে চলে আসেন তিনি। বলা যায় একরকম তাঁর বন্ধুই হয়ে গেছি আমি।

তিব্বতের ভবিষ্যৎ-রাজা হিসাবে আমিও তাঁকে যথেষ্ট সম্মান দেখাই। পাটিগণিত, ভূগোল, আর ইংরেজি শেখার ওপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি। তাছাড়া তাঁর সিনেমারও যত্ন নিতে হচ্ছে আমাকে। পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে সে-ব্যাপারে প্রতিদিন আলোচনা হচ্ছে। নিজের ইচ্ছায় আমার বেতন বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। যদিও নির্দেশ দেওয়ার অধিকার এখনও তিনি পাননি। তিনি শুধু নিজের ইচ্ছেটা প্রকাশ করতে পারেন।

তাঁর বোঝার ক্ষমতা, ধৈর্য, আর পরিশ্রম দেখে আমি অবাক না হয়ে পারছি না। হয়তো বাড়ির কাজ হিসাবে দশটা বাক্য অনুবাদ করতে দিয়েছি, কিন্তু গিয়ে দেখি তিনি বিশটা করে বসে আছেন। এইরকম প্রায়ই ঘটে। বেশিরভাগ তিব্বতীর মতো তিনিও খুব দ্রুত ভাষা শিখছেন।

তিব্বতে অভিজাতশ্রেণীর মানুষ আর ব্যবসায়ীরা মঙ্গোলিয়ান, নেপালি, চিনা আর ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারে।

দালাই লামাকে ভাষা শেখাতে গিয়ে অদ্ভুত এক সমস্যায় পড়লাম। আমার ছাত্র কোনওভাবেই ইংরেজি অক্ষর 'এফ' এর উচ্চারণ করতে পারছেন না। এর কারণ তিব্বতী ভাষায় কথা বলার সময় কখনোই 'এফ' শব্দটা উচ্চারিত হয় না। আমি ইংরেজিতে মোটেও দক্ষ নই, তাই বহনযোগ্য একটা রেডিওতে ইংরেজি খবর শোনার অভ্যাস করলাম। খবর পাঠক ধীরে ধীরে ডিকটেশন স্পিডে খবর পড়ছেন। এতে বেশ সুবিধা হচ্ছে আমার।

আমি জানতে পারলাম সরকারী কোনও একটা অফিসে স্কুলে পড়ানো হয় এমন কিছু বই সিল করা কেসে রাখা আছে। মন্ত্রণালয়কে সামান্য ইঙ্গিত দিতেই সব বই নিয়ে আসা হলো নরবুলিংকায়। থিয়েটারে ছোট-খাট একটা লাইব্রেরি বানালাম আমরা। নিজের

BanglaBook.org

একটা লাইব্রেরি হওয়ায় যার-পর-নাই খুশি হলেন দালাই লামা। তিব্বতে লাইব্রেরি দেখে কেউ খুশি হয় না। কারণ এখানকার কেউই দালাই লামার মতো জ্ঞানপিপাসু নয়। জ্ঞানের প্রতি দালার লামার তৃষ্ণা দেখে নিজের দুরন্ত, ছন্নছাড়া শৈশবের কথা মনে পড়ে গেল। কিছুটা লজ্জিতও হলাম।

তেরোতম দালাই লামা ইন্ডিয়া আর চিনে ভ্রমণ করে অনেক কিছু শিখেছিলেন। আমার ছাত্র অবশ্য এখনই ভ্রমণ করার সুযোগ পাচ্ছেন না। কিন্তু তাই বলে ভূগোলের প্রতি তাঁর কৌতূহল কমেনি। কিছুদিন পর বুঝতে পারলাম এটা তাঁর পছন্দের বিষয়গুলোর মধ্যে একটি।

তাঁর জন্য এশিয়া, তিব্বত আর পৃথিবীর ম্যাপ আঁকলাম। একটা গ্লোব আছে দালাই লামার। সেটার সাহায্যে তাঁকে বোঝালাম কেন রেডিও নিউ ইয়র্ক লাসার সময়ের চেয়ে এগার ঘন্টা পিছিয়ে আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড় আছে তিব্বতের সীমান্তে–এটা জানার পর গর্ববোধ করলেন দালাই লামা। তাঁকে জানালাম তিব্বত খুব বড় দেশ। আকারের দিক দিয়ে একে ছাড়িয়ে যাবে পৃথিবীতে এমন দেশের সংখ্য খুব কম। আমার কথা শুনে বেশিরভাগ তিব্বতীর মতো তিনিও অবাক হয়ে গেলেন।

ভালোই সময় কাটছে আমাদের। যা যা জানার দ্রুত সেটা আমার কাছ থেকে জেনে নিচ্ছেন দালাই লামা। কিন্তু গ্রীষ্মের সময় লাসায় একটা দুর্ঘটনা ঘটল। আগস্ট মাসের পনেরো তারিখে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল পবিত্র নগরীতে। এটা বুঝি আরেকটা অশুভ সংকেত!

তিব্বতীরা ধূমকেতু দেখলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাদের ধারণা ধূমকেতু খারাপ কিছু বয়ে আনে। গত বছর কোনও এক সময়ে দিন রাত সবসময় আকাশে ঘোড়ার লেজের মত উজ্জ্বল রঙের ধূমকেতু ছুটে যেতে দেখেছে লাসার মানুষ। বৃদ্ধ মানুষেরা মনে করিয়ে দিলেন গত বছর শেষ যে ধূমকেতুটা দেখা গেছে সেটা ছিল চিনের সঙ্গে তিব্বতের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বলক্ষণ।

ভূমিকম্প হলো একেবারে হঠাৎ। আগে থেকে কিছুই বোঝা গেল না। হঠাৎ লাসার বাড়িগুলো কাঁপতে লাগল, সেই সঙ্গে কমবেশি একটানা পনেরোটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেলাম। সবাই বুঝতে পারল আওয়াজটা মাটিতে ফাটল ধরার।

দক্ষিণের মেঘমুক্ত আকাশে উজ্জ্বল রক্তিম একটা আভা দেখা যাচ্ছে। আফটার শকটা কয়েকদিন ছিল। রেডিও ইন্ডিয়া রিপোর্ট করল আসাম প্রদেশে বিশাল একটা ভূমিধস হয়েছে। জায়গাটা তিব্বতের সীমান্ত সংলগ্ন। সেখানে পাহাড় আর উপত্যকাগুলো নিজেদের জায়গা থেকে সরে গেছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর একটা পাহাড় পড়ে যাওয়ায় বিশাল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

তিব্বতে কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা জানা গেল এক সপ্তাহ পর। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল তিব্বতের দক্ষিণে। পাথর দিয়ে বানানো আশ্রমের নিচে চাপা পড়ে কয়েকশ' সন্ন্যাসী

BanglaBook.org

আর সন্ন্যাসিনী মারা গেছেন। কাছাকাছি জেলা কর্মকর্তার কাছে খবরটা পৌঁছে দেবে এমন কেউ বেঁচে ছিল না। টাওয়ারগুলো মাঝখান থেকে ভেঙে গেছে। ধ্বংসস্তূপের মাঝে পড়ে আছে অসংখ্য মানুষের লাশ। দেখে মনে হচ্ছে একটা দানব তার হাত দিয়ে সবকিছু টেনে নিয়েছে, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেছে হঠাৎ বিশাল ফাঁক হয়ে যাওয়া মাটির ভিতর।

দালাই লামা ভূমিকম্পের সব খবরই পাচ্ছেন। বাকি সবার মতো কুসংস্কারে ভুগলেও, এ-সব ব্যাপারে আমার মতামত কী সেটা শুনতে চাইলেন তিনি।

আলোচনার করার জন্য বিষয়ের কোনও অভাব হচ্ছে না আমাদের। সে তুলনায় সময় খুব কম পাচ্ছি আমরা। অবসর সময়টা আমার সাথেই কাটাচ্ছেন দালাই লামা।

খুব কম মানুষই জানে অবসর সময়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করে বিভিন্ন বিষয়ে নিজেকে এগিয়ে রাখছেন তিনি। নিজের রুটিনের একচুল এদিক-ওদিক করেন না দালাই লামা। হয়তো দেখা গেল আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, কিন্তু কোনও কারণে আমি আসতে পারলাম না। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করবেন তিনি। ঘড়ি দেখে যখন বুঝবেন আলোচনার সময় শেষ হয়ে গেছে তখন আর অপেক্ষা করবেন না। কারণ তিনি জানেন এখন তাঁর ধর্মীয় শিক্ষক অন্য একটা প্যাভিলিয়নে অপেক্ষা করছেন।

ঘটনাক্রমে জানতে পারলাম আমার সঙ্গে আলোচনার জন্য কতটা উদগ্রীব হয়ে থাকেন তিনি। একবার নরবুলিংকায় নানা রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। আমাকে ডাকা হবে না ধরে নিয়ে শহরের পাশে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একটা পাহাড়ী পথে হাঁটছিলাম।

তবে দালাই লামার কথা কিছুই বলা যায় না। হয়তো আমাকে হঠাৎ করে ডেকে বসবেন। তাই চাকরকে আগেই বলে রেখেছি দালাই লামা ডাকলে সে যেন একটা আয়না দিয়ে আমাকে সংকেত দেয়।

পাহাড় বেয়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর হঠাৎ সংকেত দেখতে পেলাম। যত দ্রুত সম্ভব শহরে চলে এলাম আমি। দেখি একটা ঘোড়া নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে চাকর। ঘোড়া ছুটিয়ে নরবুলিংকায় পৌঁছালাম।

কিন্তু ততক্ষণে দশ মিনিট দেরি হয়ে গেছে। দৌড়ে কাছে এসে উত্তেজিতভাবে আমার হাত দুটো ধরে ফেললেন দালাই লামা। বললেন, 'এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? তোমার জন্য আমি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি, হেনরিগ।' আমার জন্য গত কয়েক ঘন্টা খুব খারাপ কেটেছে দালাই লামার–এটা বুঝতে পেরে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলাম আমি।

সেদিনই দালাই লামার মা আর তাঁর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো। তাদেরকে দালাই লামার বানানো আঠারোটা ছবির মধ্যে একটা ছবি দেখালাম। দালাই লামার সঙ্গে তাঁর মাকে দেখে খুব ভালো লাগছিল আমার। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে গৌতম বুদ্ধের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচিতি পাওয়ার পর থেকে নিজের পরিবারের কাছ থেকে দূরে সরে যান। তাঁর মা বা ভাই, পরিবারের কেউই তাঁকে নিজেদের আপন বলে দাবি করতে

BanglaBook.org

পারেন না।

দেখে মনে হচ্ছে না দালাই লামার মা তাঁর সন্তানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। দামী পোশাক আর অলঙ্কার পরে একেবারে অনুষ্ঠানিকভাবে এসেছেন তিনি। চলে যাবার সময় দালাই লামার উদ্দেশে মাথা নোয়ালেন। দালাই লামাও মার মাথায় হাত দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। এটাই বলে দিচ্ছে মার সঙ্গে দালাই লামার সম্পর্ক কেমন। নিজের মাকেও দুই হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন না। কারণ নিয়ম অনুসারে শুধু সন্ন্যাসী আর উচ্চপদস্থ কর্তাদেরকে দুই হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে হবে।

দালাই লামার সঙ্গে আলোচনার সময় কেউ আমাদেরকে বিরক্ত করে না বললেই চলে।

একদিন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি, এই সময় প্রকাণ্ডদেহী একজন সন্ন্যাসী এলেন। হাতে একটা চিঠি। ঘরে ঢুকে প্রথমেই তিনবার হাঁটু গেড়ে মেঝেতে মাথা ঠুকলেন তিনি। সৌজন্য দেখাতে গিয়ে শ্বাস টানার সময় হাঁপানোর শব্দ করছেন। তারপর চিঠিটা দালাই লামার হাতে দিয়ে পিছন হেঁটে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে গেটটা নিঃশব্দে লাগিয়ে দিয়েছেন। হঠাৎ মনে পড়ল এ-সব নিয়মের কোনওটাই আমি মানি না, কিংবা হয়তো এ-সব আমার জন্য প্রযোজ্য নয়।

আমার ধারণা চিঠিটা দালাই লামার ছোট ভাই তাগৎসেল রিমপোচির কাছ থেকে এসেছে। তিনি কুমবুম আশ্রমের অধ্যক্ষ। আশ্রমটা চিনা প্রদেশ চিংঘাইয়ে (chinghai)। ওখানে ইতিমধ্যে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় চলে এসেছে। এখন তাদের আশা ট্যাগেটসেলের মাধ্যমে দালাই লামাকে নিজেদের পক্ষে প্রভাবিত করবে। চিঠিতে জানানো হয়েছে ট্যাগেটসেল লাসায় আসছেন।

*

আজকেই দালাই লামার পরিবারের সঙ্গে দেখা হলো আমার। দেরি করে আসার কারণে আমাকে তিরস্কার করলেন দালাই লামার মা। মার চোখে ঠিকই ধরা পড়ে গেছে তাঁর সন্তান আমার জন্য কতটা ব্যাকুল হয়ে থাকেন। তিনি নিশ্চয় এটাও খেয়াল করেছেন যে আমার আসার সময় হলেই দালাই লামা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকেন। দেরি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করলাম আমি।

যেভাবেই হোক, তাঁকে বোঝাতে পারলাম ব্যাপারটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। তাঁকে বিদায় জানিয়ে চলে যাওয়ার সময় আমাকে কিছু উপদেশ দিলেন তিনি। মনে রাখতে বললেন দালাই লামার আনন্দ করার সময় খুব কম।

আমার কাছে পড়ার সময়টা দালাই লামার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটা তিনি বুঝতে পারায় খুব ভালো লাগছে আমার। এর কয়েকমাস পর লাসার কারও আর বুঝতে বাকি থাকল না দুপুরবেলা ঘোড়ায় চড়ে আমি কার কাছে কী কাজে যাচ্ছি। যেরকম ভয় করেছিলাম, সন্ন্যাসীরা ইতিমধ্যে আমার সমালোচনা শুরু করে দিয়েছেন। তবে দালাই লামার মা তাঁর সন্তানের ইচ্ছের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেলেন।

BanglaBook.org

একদিন দালাই লামাকে পড়াতে যাবার সময় বাগানের মধ্য দিয়ে হাঁটছি। ওপরে তাকাতে মনে হলো দালাই লামা তাঁর জানালা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। কারণ আমি যাকে দেখছি তিনি চশমা পরে আছেন। কিন্তু দালাই লামাকে কখনো চশমা ব্যবহার করতে দেখিনি।

ভিতরে গিয়ে দেখি আমার অনুমানই সত্যি।

বেশ কিছুদিন হলো তিনি চশমা ব্যবহার করছেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে জানালেন কিছুদিন ধরে চোখের সমস্যায় ভুগছেন তিনি। এখন তাই পড়াশোনা করার সময় তাঁকে চশমা পরতে হয়। তাঁর ভাই ইন্ডিয়ান লিগেশন থেকে একজোড়া চশমা এনে দিয়েছেন।

সম্ভবত ছোটবেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিস্কোপ ব্যবহার করায় চোখের বারোটা বাজিয়ে ফেলেছেন দালাই লামা। তা ছাড়া পোটালায় গোধূলির সময় একনাগাড়ে অনেকক্ষণ পড়াশোনা করায়ও তাঁর চোখের ক্ষতি হয়েছে।

একদিন একটা অনুষ্ঠানে দেখলাম দালাই লামা তাঁর পোশাকে কিছুটা পরিবর্তন এনেছেন। আলখেল্লার ওপর একটা লাল জ্যাকেট চাপিয়েছেন তিনি। জ্যাকেটার নকশা করেছেন নিজেই। সেজন্য তাঁর গর্বের শেষ নেই। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী অবসর সময় ছাড়া অন্য কোনও সময় এটা পরতে পারেন না।

মজার ব্যাপার হলো ওই জ্যাকেটে পকেট আছে। এখন পর্যন্ত তিব্বতীদের কোনও পোশাকে পকেটের কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি আমি। রঙিন খবরের কাগজ, আর আমার পোশাকে পকেট দেখে দালাই লামা বুঝতে পেরেছেন এগুলো সত্যি খুব কাজের। এখন তিব্বতের বাইরে তাঁর সমবয়সী অনেক ছেলের মত তিনিও পকেটে ছোট ছুরি, স্ক্রু-ড্রাইভার, মিষ্টি, রঙ পেন্সিল, ফাউনটেন পেন ইত্যাদি রাখতে পারেন।

বিভিন্ন ধরনের ঘড়ি সংগ্রহ করা দালাই লামার শখ। উত্তরাধিকার সূত্রে তেরোতম দালাই লামার কাছ থেকে কিছু ঘড়ি পেয়েছেন। ওমেগা কোম্পানির একটা ক্যালেন্ডার ক্লক কিনেছেন দালাই লামা। জিনিসটা তাঁর খুব প্রিয়। তিব্বতের শাসক হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি শুধু তাঁর সিংহাসনের নীচে উপহার হিসাবে পাওয়া টাকা খরচ করতে পারবেন। ক্ষমতায় বসার পর পোটালা আর গার্ডেন অফ জুয়েলের ট্রেজার ভল্টগুলো খোলা হবে, আর তখন তিব্বতের শাসক হিসাবে তিনি হবেন পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষদের একজন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পনেরো

তিব্বতে হামলা

দালাই লামাকে ক্ষমতা দেওয়া হোক / পুনর্জন্ম লাভ করার ঘটনা / লালচিনের তিব্বত আক্রমণ / দালাই লামার তিব্বত ছাড়ার প্রস্তুতি

এই প্রথম তিব্বতের জনগণ দালাই লামাকে ক্ষমতায় বসানোর ব্যাপারে কথা বলতে শুরু করেছে। তারা চায় প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই তিনি ক্ষমতায় আসুন। দেশের এই কঠিন সময়ে জনগণ সিংহাসনে একজন তরুণ, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নেতাকে দেখতে চায়।

বর্তমান প্রশাসককে একটা স্বার্থান্ধ দুষ্টচক্র এবং দুর্নীতি ঘিরে রেখেছে। এটা থেকে মুক্তি চায় জনগণ। বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন দেবে তিব্বতে এরকম মানুষ একটাও পাওয়া যাবে না। চিনের সঙ্গে যুদ্ধের যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সেটার জন্য এই সরকারকেই দায়ী করছে তারা।

এই সময় লাসায় একটা নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল। একদিন সকালে রাস্তার পাশে, দেয়ালে একটা পোস্টার দেখা গেল। লেখাটার তরজমা করলে এরকম দাঁড়ায় 'দালাই লামাকে ক্ষমতায় বসাও।' দেখা গেল এই পোস্টারের সমর্থনে জনগণ বর্তমান প্রশাসকের বিরুদ্ধে একের পর এক প্রশ্ন তুলছে।

স্বাভাবিকভাবেই পরদিন সকালে দালাই লামার সঙ্গে এই পোস্টারের ব্যাপারে কথা বললাম আমি। তিনি ভাইয়ের কাছ থেকে আগেই খবরটা পেয়েছেন। তাঁর ধারণা, কাজটা সেরার সন্ন্যাসীদের। দেশের জনগণ তাঁকে ক্ষমতায় বসাতে চাইছে, এতে তাঁর খুশি হওয়ার কথা।

কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে না তিনি তেমন খুশি হয়েছেন। দালাই লামার ধারণা সিংহাসনে বসার মতো যোগ্যতা এখনও তাঁর হয়নি। তিনি জানেন তাঁর আরও অনেক কিছু শেখা বাকি। এই কারণে ওই পোস্টারকে মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তারচেয়ে আজকে কি কি বিষয়ে পড়াশোনা করা যায় সে-ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠতে দেখা গেল তাঁকে।

দালাই লামা জানেন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম বয়সে তাঁকে একটা দেশের

BanglaBook.org

ক্ষমতায় বসতে হবে। পৃথিবীর আর কোনও দেশে এত কম বয়সে কেউ ক্ষমতায় যায় না। তাই তাঁকে অনেক জ্ঞানী হতে হবে। তাঁর জ্ঞান আর পশ্চিমা দেশের স্কুলপড়ুয়া সমবয়সী একজন ছাত্রের জ্ঞান এক হলে চলবে না।

ক্ষমতায় বসার পর তাঁকে অনেক দেশে ঘুরতে হবে। হয়তো দেখা গেল তিনি ইউরোপে গেছেন, কিন্তু সেখানকার কোনও কিছুর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। এ-সব ব্যাপার নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় আছেন তিনি।

তাঁকে বোঝালাম সাধারণ মানুষের চেয়ে তাঁর মেধা এক ধাপ উঁচুতে। ইউরোপিয়ান স্কুলপড়ুয়া ছাত্ররা যা জানে সেগুলো খুব সহজেই শিখে ফেলবেন তিনি।

শুধু দালাই লামা নন, তিব্বতের সবাই নিজেদেরকে খুব ছোট করে দেখে। তিব্বতীদের মুখে সবসময় লেগে আছে, 'আমরা কিছু জানি না। আমরা গাধা-গরু!' কিন্তু দেখা যায় যারা এসব কথা বলে তারাই বেশি চালক।

তিব্বতীদের আর যাই হোক, কোনওভাবেই ভোঁতা বলা যাবে না। শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধিমত্তাকে গুলিয়ে ফেলার কারণেই তারা নিজেদেরকে গাধা-গরু ভাবে।

ইন্ডিয়ান রাষ্ট্রদূতের কার্যালয়ে আমার যাওয়া-আসা আছে। থিয়েটারে দেখার জন্য ওখান থেকে কিছু নাটক এনেছিলাম। দালাই লামা খুশি হবেন, তাই পুরোদস্তুর তথ্যবহুল একটা ছবি বানাবার ইচ্ছে আমার। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের কার্যালয় থেকে আনা নাটকগুলোর মধ্যে সবার আগে হেনরি ভি নাটকটা দালাই লামাকে দেখালাম। উদ্দেশ্য এতে তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হয় দেখা।

নাটকটা দেখার সময় আশ্রম থিয়েটারে থাকার অনুমতি দিলেন তিনি। অন্ধকার গাঢ় হতেই বাগানের মালী আর রাঁধুনি চুপিসারে থিয়েটারে ঢুকে পড়ল। সবাই থিয়েটারের মেঝেতে পাতা কার্পেটে বসে ছবি দেখছে।

দর্শক হল থেকে প্রজেকশন রুমে যাওয়ার একটা সিঁড়ি আছে। আমি আর দালাই লামা সেই সিঁড়িতে বসেছি। নাটকের চরিত্রগুলো কথা বলার সময় পরদায় ইংরেজি লেখা আসছিল। ফিসফিস করে দালাই লামাকে সেগুলো তিব্বতে অনুবাদ করে শোনাচ্ছি আমি। সেই সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তরও দিতে হচ্ছে। ভাগ্য ভালো যে আগে থেকে এই তাৎক্ষণিক অনুবাদ করার কাজটা প্র্যাকটিস করেছিলাম। তা না হলে খুব সমস্যায় পড়তে হতো। কারণ একজন জার্মানির পক্ষে শেক্সপিয়ারের ইংরেজি তাৎক্ষণিক তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করা মোটেও সহজ কাজ নয়।

খেয়াল করে দেখলাম নিচে বসে থাকা দর্শকরা নায়ক-নায়িকার ঘনিষ্ঠ দৃশ্য দেখে লজ্জা পাচ্ছে। পরে ওই দৃশ্যগুলো কেটে দিয়েছিলাম। কয়দিন অবশ্য ওই দৃশ্যগুলোর ব্যাপারে খুব কৌতূহলী। রাজা-বাদশা তো বটেই, সেই সঙ্গে পৃথিবীর সব মহৎ মানুষের জীবনী নিয়েও দালাই লামার অসম্ভব কৌতূহল। বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং তাঁদের গৌরবময় কীর্তি জানার তীব্র আকুতি আছে দালাই

BanglaBook.org

লামার মধ্যে। মহাত্মা গান্ধিকে নিয়ে করা একটা তথ্যবহুল ছবি আছে তাঁর কাছে। ছবিটা তিনি কয়েকবার দেখেছেন। মহাত্মা গান্ধিকে খুব সম্মান করা হয় তিব্বতে।

এরকম একজন ছাত্রের পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব না দিয়ে উপায় কি! একদিন দালাই লামাকে সঙ্গে নিয়ে ছবি বাছাই করতে বসলাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে কমিকস আর বিনোদনমূলক ছবিগুলো আলাদা করে ফেললেন তিনি। বললেন, এগুলোর বদলে শিক্ষামূলক কিছু ছবি আনতে। শিক্ষা, সশস্ত্র বাহিনী আর সংস্কৃতি–এসবেই তাঁর আগ্রহ।

তাঁকে খুশি করার জন্য একটা ঘোড়ার ছবি এনেছিলাম। কিন্তু খুশি হওয়া তো দূরের কথা, তিনি ব্যাজার হলেন। বললেন, 'তেরোতম দালাই লামা ঘোড়ার ভক্ত ছিলেন। ব্যাপারটা খুব হাস্যকর। ঘোড়ার ব্যাপারে আমার মোটেও কৌতূহল নেই।'

দালাই লামা খুব দ্রুত বেড়ে উঠছেন। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি একটু কাচা থাকে। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি। একবার এক্সপোজার মিটার হাত থেকে ফেলে দিলেন তিনি। ছোট ছেলে তার একমাত্র খেলনা ভেঙে ফেলার পর যেমন মন খারাপ করে থাকে, তাঁর অবস্থাও ঠিক তেমন মনে হলো। তাঁকে আমি মনে করিয়ে দিলাম তিনি বিশাল একটা দেশের শাসক হতে চলেছেন। চাইলেই যত ইচ্ছে এক্সপোজার মিটার কিনতে পারবেন।

দালাই লামার জীবনটা কঠোর নিয়মে বাধা। সেই সঙ্গে তিনি খুব একাও। প্রায়ই তাঁকে উপবাস থাকতে হয়, কিন্তু এ-ব্যাপারে কাউকে কিছু বলেন না তিনি। নির্বিকারভাবে সবকিছু সহ্য করে যান।

একমাত্র লবস্যাঙ স্যামটেন পুরোপুরি স্বাধীনভাবে তাঁকে সঙ্গ দিতে পারে। বয়সে বড় হলেও মানসিকতার দিক থেকে দালাই লামার চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে সে। শুরুর দিকে আমাদের আলোচনায় লবস্যাঙকেও রাখতে চেয়েছিলেন দালাই লামা। কিন্তু লবস্যাঙ কিছুতেই রাজী হয়নি। বরং আমাকে অনুরোধ করেছে কোনও একটা অজুহাত দেখিয়ে তার না আসার কারণ দালাই লামার কাছে ব্যাখ্যা করতে। প্রশ্ন করেছিলাম কেন সে আলোচনায় আসতে চায় না। উত্তরে বলল, আমাদের আলোচনার বিন্দু-বিসর্গ কিছুই সে বুঝতে পারবে না।

তবে বিভিন্ন সরকারী কাজ বেশ ভালোভাবেই সামলে নিচ্ছে সে।

যাই হোক, দালাই লামা বড় ভাইয়ের অজুহাতকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলেন। লাবস্যাঙের মাধ্যমে জানতে পারলাম ছোটবেলায় দালাই লামা অল্পতেই রেগে যেতেন। এখন আর ওই বদভ্যাসটা তাঁর নেই। বরং বলা যায় বয়স অনুযায়ী তিনি অতিরিক্ত সংযমী আর সিরিয়াস।

কিন্তু যখন হাসেন তখন একটা শিশুর মতোই প্রাণখুলে হাসেন তিনি। বিভিন্ন ধরনের কৌতুক শুনতেও খুব ভালোবাসেন দালাই লামা। এখানেই শেষ নয়, আমার সঙ্গে মাঝে-মধ্যে বক্সিং খেলার ভান করাতেও কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই তাঁর। এমন কি কথায় কথায়

BanglaBook.org

আমাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও ছাড়েন না।

পশ্চিমা চিন্তাধারা দালাই লামাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করলেও, অফিসের শত বছরের পুরনো ঐতিহ্য তিনি ভুলে যাননি। দালাই লামা ব্যক্তিগত যেসব জিনিস ব্যবহার করেন সেগুলোকে শারীরিক অসুস্থতা আর অশুভ আত্মার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর প্রতিষেধক হিসাবে ধরা হয়। তাঁর বাসার রান্নঘর থেকে কিছু কেক আর ফল এনেছিলাম আমি। এগুলো পাওয়ার জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছিল আমার বন্ধুরা। কিন্তু আমি তাদেরকে হতাশ করেছি।

দালাই লামার খুব আশা একদিন তাঁর দেশের মানুষ অন্ধকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে আসবে। দেশের উন্নতি আর ভবিষ্যৎ সংস্কারের ব্যাপারে অনেক আলোচনা হচ্ছে আমাদের মধ্যে। ইতিমধ্যে একটা পরিকল্পনাও করেছি।

ছোট, নিরপেক্ষ দেশগুলো থেকে কিছু দক্ষ লোক আনা হবে। তাদের সাহায্য নিয়ে তিব্বতে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। সেই সঙ্গে এ-সব ব্যাপারে প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে তিব্বতীদের।

আফশেনেইটরের জন্যও একটা বিশাল কাজ ঠিক করেছি। একজন এ্যাগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে তিব্বতে অনেক কিছু করার আছে তার। আফশেনেইটর নিজেও এই ব্যাপারে খুব আগ্রহী।

আমি ব্যক্তিগতভাবে তিব্বতের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করতে চাই। জানি কাজটা খুব কঠিন হবে, তবু স্বপ্ন দেখি তিব্বতে একটা বিশ্ববিদ্যালয় বানাবার কাজ হাতে নিয়েছি আমি।

তিব্বত নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন থাকলেও বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। সামনে খুব কঠিন সময় অপেক্ষা করছে তিব্বতের জন্য। এই ব্যাপারটা আর কেউ বুঝুক আর নাই বুঝুক, আমি আর আফশেনেইটর বেশ ভালোই বুঝতে পারছি। নিজেদেরকে মিথ্যে আশা দিয়ে কী লাভ! একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে লালচিন তিব্বতে হামলা করবেই। তখন তিব্বতের স্বাধীনতার বন্ধু, আমার আর আফশেনেইটরের কোনও স্থান থাকবে না এখানে।

ইতিমধ্যে দালাই লামার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছি আমি। একদিন তাঁর কাছে জানতে চাইলাম তিনি যে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন সেটা বোঝা গেল কীভাবে।

১৯৩৫ সালের ৬ জুন প্রতিবেশী দেশ, লেক কুকু-নুর-এ জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি।

জন্মদিনে একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ তাঁকে অভিনন্দন জানাল না। তিব্বতে জন্মদিন কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না। অভিনন্দন জানানো তো দূরের কথা, কার জন্মদিন কবে সেটাই কেউ জানে না। ভাবী রাজার জন্মদিন তাদের কাছে খুব মামুলি একটা ব্যাপার।

তিব্বতীরা মনে করে দালাই লামা চেনরিজের প্রতিনিধি হিসাবে পৃথিবীতে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন। আর চেনরিজ হচ্ছেন গড অফ মার্সি–এক হাজার জীবন্ত গৌতম বুদ্ধের

BanglaBook.org

একজন। মানবজাতিকে সাহায্য করার জন্য তিনি নির্বাণ অস্বীকার করেছিলেন। তিনিই তিব্বতীদের সহায়তাকারী ঈশ্বর। চেনরিজের প্রতিনিধি হিসাবে যারা পৃথিবীতে আসেন বা পুনর্জন্ম লাভ করেন তাঁরাই 'বো'-এর রাজা। এই 'বো' বলতে তিব্বতকেই বোঝানো হয়েছে। তিব্বত নামটা এখানকার বাসিন্দাদেরই দেওয়া।

মোঙ্গলিয়ানের শাসক আলটান খান বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। যারা পুনর্জন্ম লাভ করছেন তাঁদের নাম কী হবে সেটা ঠিক করেছিলেন তিনিই। দালাই লামা–এই নামটার জন্ম হয় এভাবেই। আগেই বলেছি বর্তমানে যিনি দালাই লামা তিনি হচ্ছেন চৌদ্দতম। তিব্বতীরা তাঁকে একজন রাজা হিসাবে যতটা না সম্মান দেখায়, তারচেয়ে বেশি সম্মান দেখায় জীবন্ত গৌতম বুদ্ধের প্রতিনিধি এবং প্রতিমূর্তি হিসাবে।

এই তরুণ দালাই লামার ওপর তিব্বতীদের অনেক আশা। তাদের সবার সন্তুষ্টি লাভ করা দালাই লামার জন্য সহজ কাজ হবে না। তিব্বতীরা তাঁর কাছ থেকে দেবতাসুলভ বিচার আশা করে। তাঁর নির্দেশ আর কাজ সবই হতে হবে ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে। তাঁর সব কাজ আর নির্দেশ তিব্বতের ইতিহাসের অংশ হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে পুরো সপ্তাহ ধরে ধ্যান করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন দালাই লামা। তা ছাড়া অফিসের গুরুদায়িত্ব পালনে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য ধর্মীয় বিষয়ে আরও বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। তেরোতম দালাই লামার চেয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাস কিছুটা কম। তেরোতম দালাই লামার চরিত্র ছিল কর্তৃত্বসুলভ।

এ-ব্যাপারে সারঙ আমাকে একটা ঘটনার কথা বলেছেন। একবার নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেন তেরোতম দালাই লামা। তখন তাঁর রক্ষণশীল সফরসঙ্গীরা বিরোধিতা শুরু করেন। নতুন আইনের ব্যাপারে পঞ্চম দালাই লামা কী বলেছিলেন সেটা তেরোতম দালাই লামাকে মনে করিয়ে দিলেন তাঁরা।

তাঁদের উদ্দেশ্যে তেরোতম দালাই লামা বলেছিলেন, 'সাবেক পঞ্চমটা কে?' এই প্রশ্নের উত্তরে সন্ন্যাসী দালাই লামাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে হাঁটু গেড়ে মেঝেতে মাথা নুইয়েছিল তাঁরা। তেরোতম দালাই লামার প্রশ্নটা তাঁদেরকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। আর সবার মতোই তেরোতম দালাই লামাও পুনর্জন্ম লাভ করেছিলেন। তাই তিনি শুধু তেরোতম নন, আগের সব দালাই লামার সমষ্টিও।

এই গল্প শোনার পর আমার হঠাৎ মনে হলো তিব্বতীরা আসলে খুব ভাগ্যবান। কারণ তিব্বতীদের কখনো আইভান কিংবা নিরোর মতো ভয়ংকর শাসকের খপ্পরে পড়তে হয়নি।

তবে তিব্বতীদের ভাবনা-চিন্তায় একটা ব্যাপার কখনও আসেনি। সেটা হলো গড অফ গ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে পুনর্জন্ম লাভ করার পর একজন দালাই লামা ভালো ছাড়া খারাপ হন কীভাবে?

দালাই লামার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কীভাবে বোঝা গেল তিনি পুনর্জন্ম লাভ করেছেন। এ-ব্যাপারে তিনি কোনও সদুত্তর দিতে পারলেন না। কারণ ওই সময় তিনি খুব

BanglaBook.org

ছোট ছিলেন। অস্পষ্টভাবে কিছু কিছু জিনিস তাঁর মনে আছে। তবে সেটা আমার কৌতূহল মেটাবার জন্য যথেষ্ট নয়। এ-ব্যাপারে আমার খুব আগ্রহ দেখে একজন অভিজাতশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দিলেন তিনি।

অনেকেই ঘটনাটা নিজ চোখে দেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেঁচে আছেন অল্প কয়েকজন।

আর্মির কমান্ডার-ইন-চিফ, ডিযাযা কুনস্যাঙ্গতসি-র সঙ্গে দেখা করলাম। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাকে ঘটনাটা খুলে বললেন তিনি।

তেরোতম দালাই লামা ১৯৩৩ সালে মারা যান। মারা যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে নিজের পুনর্জন্মের ব্যাপারে কিছুটা আভাস দিয়েছিলেন তিনি। গৌতম বুদ্ধ যেভাবে বসে থাকেন ঠিক সেভাবে তাঁর মৃতদেহ পোটালায় বসিয়ে রাখা হয়েছিল। মুখটা ছিল দক্ষিণদিকে। একদিন সকালে দেখা গেল তাঁর মাথা পুবদিকে ঘুরে গেছে।

দেরি না করে রাষ্ট্রীয় পুরোহিতের সঙ্গে আলোচনায় বসা হলো। তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় একটা সাদা চাদর পুবদিকে ছুঁড়ে দিলেন। কিন্তু পরবর্তী দুই বছর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় এমন কোনও ঘটনা ঘটল না।

এরপর প্রশাসক চু খোর গাই লেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সবাই বলাবলি করে এই লেকের পানির দিকে তাকালে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

অনেক প্রার্থনা করার পর প্রশাসক লেকের পানির দিকে তাকালেন। পানিতে একটা তিনতলা আশ্রমের ছবি ভেসে থাকতে দেখলেন তিনি। আশ্রমের ছাদ আবার সোনার তৈরি। পাশেই চিনা কৃষকের একটা বাড়ি। বাড়িটার চাঁদওয়ারি পাথর দিয়ে বানানো। জায়গাটার প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লাসায় ফিরে এলেন প্রশাসক।

তারপর শুরু হলো ওই আশ্রম খোঁজার প্রস্তুতি। পুরো জাতি ব্যাপারটা নিয়ে মেতে উঠল। আমার একটা ভুল ধারণা ছিল। ভাবতাম একজন দালাই লামার মৃত্যুর পরপরই আরেকজন দালাই লামাকে চিহ্নিত করা হয়। ব্যাপারটা আসলে এত সহজ নয়। গৌতম বুদ্ধের মতবাদ অনুযায়ী স্বর্গীয় জগৎ ছেড়ে সৃষ্টিকর্তা মানুষের রূপ ধরে কখন পৃথিবীতে আসবেন সেটার কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। কখনো কখনো এক্ষেত্রে কয়েক বছরও লেগে যেতে পারে।

প্রশাসকের দেখা জায়গাটা ১৯৩৭ সালে খোঁজা শুরু করে অনুসন্ধানকারী দল। পবিত্র শিশুর খোঁজে পুবদিকে যাত্রা শুরু করে তারা। অনুসন্ধানকারীরা কয়েকটা দলে বিভক্ত ছিল। দলের সদস্যরা সবাই সন্ন্যাসী। তবে প্রতি দলে একজন করে ধর্ম-নিরপেক্ষ কর্মকর্তাও ছিলেন। প্রত্যেক্যের সঙ্গে তেরোতম দালাই লামার ব্যবহার করা বিভিন্ন জিনিস-পত্র ছিল।

ডিযাযা কুনস্যাঙ্গতসি এই রকম একটা দলের সদস্য ছিলেন। দলটার প্রধান ছিলেন কাইসেঙ রিমপোচি। তাঁর নেতৃত্বে দলটা চিনা প্রদেশ চিংঘাই-এর জেলা আমডো পর্যন্ত

BanglaBook.org

গেলেন।

বিখ্যাত লামা বিশেষজ্ঞ এবং সংস্কারক টিসঙ কাপা এখানে জন্ম নেওয়ায় এই এলাকায় অসংখ্য আশ্রম আছে। এখানকার কিছু মানুষ তিব্বতী। তারা শান্তিপূর্ণভাবে মুসলমানদের সঙ্গে বসবাস করে। অনুসন্ধানকারী দল অনেক ছেলেকেই দেখল, কিন্তু লক্ষণগুলো মিলছে না। দলটা ইতিমধ্যে ভয় পেতে শুরু করেছে তাদের মিশন না ব্যর্থ হয়ে যায়।

তারপর অনেক খোঁজাখুজির পর সোনার ছাদঅলা একটা তিনতলা আশ্রম দেখতে পেল তারা। সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসকের কথা মনে পড়ল তাদের। আশ্রমের পাশেই পাথরের তৈরি চাঁদওয়ারিসহ একটা কটেজ দেখা যাচ্ছে। দেখেই বোঝা গেল বাড়িটা একজন কৃষকের।

উত্তেজিতভাবে চাকরদের সঙ্গে নিজেদের পোশাক বদল করল সন্ন্যাসীরা। এটা একটা কৌশল। উঁচু পর্যায়ের কর্তাদের সামনে লোকজন সহজ হতে পারে না। যার কারণে পরিবেশটা আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। যাই হোক, বাড়িটাতে ঢোকার পর চাকরদেরকে সবচেয়ে ভালো ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। আর ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীরা স্থান পেলেন রান্নাঘরে। সম্ভবত সেখানেই বাচ্চাটাকে খুঁজে পেলেন তাঁরা।

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীরা বুঝতে পারলেন এখানে কাঙ্ক্ষিত সেই পবিত্র শিশুকে পাবেন। কাউকে কিছু না বলে চাপা একটা উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা।

এই সময় দুবছরের একটা ছেলে দৌড়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এলো। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে হঠাৎ একজন সন্ন্যাসীর জামা টেনে ধরল সে। সন্ন্যাসীর গলায় একটা জপমালা ছিল। জপমালাটা ব্যবহার করতেন তেরোতম দালাই লামা। হঠাৎ ছেলেটা কোনওরকম ইতস্তত না করে 'সেরার সন্ন্যাসী, সেরার সন্ন্যাসী!' বলে চিৎকার শুরু করল।

ব্যাপারটা সত্যিই বিস্ময়কর! দুই বছরের একটা শিশু চাকরের পোশাক পরে থাকা একজন সন্ন্যাসীকে কীভাবে চিনছে! এখানেই তো শেষ নয়, এই সন্ন্যাসী যে সেরার আশ্রম থেকে এসেছে সেটাও অবলীলায় বলে দিল সে।

এরপর দেখা গেল ছেলেটা সন্ন্যাসীর গলায় ঝুলে থাকা জপমালাটা ধরে টানাটানি করছে। যতক্ষণ না ওটা তাকে দেওয়া হলো ততক্ষণ টানাটানি করল সে। হাতে দিতেই নিজের গলায় পরে ফেলল ছেলেটা।

ইতিমধ্যে সন্ন্যাসীরা নিশ্চিত হয়েছেন যে তাঁরা দালাই লামাকে পেয়ে গেছেন। তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে সম্মান দেখাবার একটা তীব্র আকুতি কাজ করছে সন্ন্যাসীদের মধ্যে। কিন্তু এখনই সেটা করতে পারবেন না তাঁরা। প্রথা অনুযায়ী নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে কাজটা করতে হবে। কিন্তু এ-ব্যাপারে কঠোর হতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে তাঁদের।

BanglaBook.org

কৃষক পরিবারকে বিদায় জানিয়ে লাসায় চলে এলেন সন্ন্যাসীরা। কিছুদিন পর আবার গেলেন। তবে এবার তাঁরা ছদ্মবেশ নেননি। প্রথমে ছেলেটার মা-বাবার সঙ্গে কথা বললেন। কথায় কথায় জানা গেল ইতিমধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করায় অন্য একটা ছেলেকে আশ্রমে পাঠানো হয়েছে।

দালাই লামা ওই সময় ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুম থেকে উঠিয়ে তাঁকে প্রার্থনা-ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। চারজন সন্ন্যাসী এখানে তাঁর পরীক্ষা নেবেন।

সন্ন্যাসীরা প্রথমে তাঁকে চারটে জপমালা দেখালেন। দালাই লামাকে কিছু বলতে হলো না। চারটের মধ্য থেকে একটা জপমালা হাতে নিয়ে ঘর জুড়ে নাচতে লাগলেন তিনি। তাঁর নেওয়া জপমালাটা ছিল তেরোতম দালাই লামার।

এখানেই শেষ নয়, কয়েকটা ড্রামও বাছাই করলেন তিনি। তেরোতম দালাই লামা এ-সব ড্রাম বাজিয়ে চাকরদের ডাকতেন। তারপর পুরনো একটা ছড়ি হাতে নিলেন। এটাও তেরোতম দালাই লামা ব্যবহার করতেন। সন্ন্যাসীরা পরীক্ষা করে দেখলেন চেনরিজের প্রতিনিধি হিসাবে যে-সব চিহ্ন থাকার কথা তার সবই আছে শিশু দালাই লামার শরীরে।

দুবছরের এই শিশুই যে দালাই লামা, এ-ব্যাপারে সন্ন্যাসীদের মনে আর কোনও সন্দেহ নেই। গোপন কোড ব্যবহার করে চিন আর ভারতের মধ্য দিয়ে লাসায় টেলিগ্রাম পাঠাল তারা। লাসা থেকে নিরাপত্তাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো তাদেরকে।

খবরটা ছড়িয়ে পড়লে তাঁদের মিশন ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা আছে। চারজন সন্ন্যাসী থাংকার সামনে নীরব থাকার শপথ নিলেন। থাংকা একটা মূর্তি। মূর্তিটাতে চেনরিজের প্রতিবিম্ব নকশা করা।

শপথ নেওয়ার পর আরও কিছু ছেলেকে পরীক্ষা করতে রওনা হলেন সন্ন্যাসীরা। যদিও সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে এই ছেলেটাই চোদ্দতম দালাই লামা, তারপরও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হলে অন্য কোনও ছেলের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আছে কিনা দেখা দরকার।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে দালাই লামাকে পাওয়া গেছে চিনাদের এলাকায়। তাঁকে লাসায় নিয়ে যাবার সময় খুব সতর্ক থাকতে হবে। বলা যায় না, দালাই লামাকে পাওয়া গেছে, এটা শোনার পর চিনারা হয়তো তাঁর সঙ্গে সেনাবাহিনী পাঠাতে চাইতে পারে।

সন্ন্যাসীরা প্রাদেশিক গভর্নর মা পুফ্যাঙ-এর কাছে দালাই লামাকে লাসায় নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। জানালেন, সেখানে গিয়ে আরও অনেক ছেলের মতো তাঁকেও পরীক্ষা করবেন। সুযোগ পেয়ে এক লাখ চিনা ডলার দাবী করলেন মা পুফ্যাঙ।

সন্ন্যাসীরা কোনওরকম দর কষাকষির মধ্যে গেলেনই না। সঙ্গে সঙ্গে টাকা পরিশোধ

BanglaBook.org

করে দিলেন তাঁরা। এবং এখানেই তাঁদের ভুলটা হলো।

চিনা দুরভিসন্ধি তখনও বুঝতে পারেননি চার সন্ন্যাসী। মা পুফ্যাঙ জানেন এই ছেলে তিব্বতীদের যক্ষের ধন। কাজেই সুযোগ যখন পাওয়া গেছে তখন কেন তিনি সেটার সদ্ব্যবহার করবেন না! আরও তিন লক্ষ চিনা ডলার দাবী করে বসল ওরা।

এতক্ষণে চিনাদের চালাকি ধরতে পারলেন সন্ন্যাসীরা। ঝামেলা এড়াবার জন্য অর্ধেক, অর্থাৎ দেড় লক্ষ ডলার দিলেন তাঁরা, তারপর বললেন, বাকিটা লাসায় পৌঁছাবার পর দেওয়া হবে।

স্থানীয় মুসলমান ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকাটা ধার করতে হলো সন্ন্যাসীদের। ঠিক হয়েছে সন্ন্যাসীদের কাফেলার সঙ্গে লাসা পর্যন্ত যাবেন ব্যবসায়ীরা। এদের হাতেই দেওয়া হবে বাকি দেড় লাখ ডলার। মা পুফ্যাঙ সন্ন্যাসীদের এই প্রস্তাবে রাজী হলেন।

১৯৩৯ সালে গ্রীষ্মের শেষ দিকে চারজন সন্ন্যাসী, তাদের চাকর, ব্যবসায়ী, পবিত্র দালাই লামা আর তাঁর পরিবার–সবাই লাসার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন। লাসার সীমান্তে পৌঁছাতে কয়েক মাস লেগেছিল তাঁদের।

সীমান্তে একজন মন্ত্রী অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ছেলেটাকে একটা চিঠি দিলেন। চিঠিতে লেখা আছে তাঁকে সরকারী দালাই লামা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রথম সবাই তাঁকে দালাই লামা হিসাবে শ্রদ্ধা জানাল। তাঁর মা-বাবাও এটা আশা করেননি। তাঁরা ধারণা করেছিলেন তাঁদের ছেলে নিশ্চয়ই অনেক বড় কোনও মানুষ হিসাবে পুনর্জন্ম লাভ করেছে। চিঠিটা দেখে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের ছেলে তিব্বতের শাসক হবে।

ওই দিন থেকেই দালাই লামা সবাইকে আশীর্বাদ করা শুরু করলেন। আগে কখনও একসঙ্গে এত লোক দেখেননি তিনি। অনেক দিন পর চেনরিজের প্রতিনিধিকে খুঁজে পাওয়া গেছে। তাই শহরের সব মানুষ তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে। এখানকার বাসিন্দারা এতদিন যেন এতিম ছিল।

তেরোতম দালাই লামা মারা যাওয়ার পর ইতিমধ্যে ছয় বছর পার হয়ে গেছে। ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দালাই লামার সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আবার যোগ হয়েছে নতুন বছরের উৎসব। সব মিলিয়ে লাসার সব মানুষ আনন্দে ভাসছিল তখন।

কয়েক ঘন্টা ধরে চলা এই অনুষ্ঠানে দালাই লামার ভাবগাম্ভীর্য দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। তেরোতম দালাই লামার বেশ কিছু চাকর ছিল। চৌদ্দতম দালাই লামার সেবার জন্য তাঁদেরকেই বহাল রাখা হয়েছে। চাকরদের সঙ্গে তিনি এমন ব্যবহার করলেন যেন এরা তাঁর অনেকদিনের পরিচিত।

ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে যে লালচিন তিব্বতে আক্রমণ করবে। বসন্তের শুরুতেই আমার আর দালাই লামার আলোচনা প্রায় গতি হারিয়ে ফেলল। সামনে তিব্বতের জন্য কঠিন একটা সময় আসছে। জুয়েল গার্ডেনের নিরিবিলি পরিবেশে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময়ও সেটার আভাস পাচ্ছি আমরা। পরিস্থিতি দিন দিন

BanglaBook.org

আরও খারাপের দিকে যাওয়ায় বিভিন্ন সরকারী কাজে বেশি সময় দিতে হচ্ছে দালাই লামাকে। তেমন কোনও ঘটনা ঘটলেই যাতে দ্রুত দালাই লামার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় সেজন্য ইতিমধ্যে জাতীয় পরিষদকে নরবুলিংকায় নিয়ে আসা হয়েছে। অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও ত্রুটিপূর্ণ সরকারী নীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি যে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিলেন তা দেখে কর্মকর্তারা সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। কোনও সন্দেহ নেই তিব্বতের ভাগ্য আর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে সংকট আরও গভীর হয়েছে। তিব্বতের পুবদিক থেকে খবর এল চিনা অশ্বারোহী আর পদাতিক বাহিনী সীমান্তে জড়ো হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনী পাঠানো হলেও, সবাই পরিষ্কার বুঝতে পারছে শত্রুবাহিনীকে ঠেকানোর ক্ষমতা এদের নেই। কূটনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানের একটা চেষ্টা করেছিল সরকার, কিন্তু বিশ্বব্যাপী নিজেদের ব্যাপারে প্রচারণা চালানোর জন্য প্রতিনিধিরা ভারত পর্যন্ত গিয়ে আটকে যাওয়ায় সেই চেষ্টাও গেছে রসাতলে। বাইরে থেকে সাহায্য পাওয়ার কোনও আশা নেই তিব্বতের।

কোরিয়ায় কী হয়েছে সেটা সবারই জানা। তাই বলাই বাহুল্য, জাতিসংঘ তিব্বতকে সমর্থন দিলেও রেড আর্মিকে আটকে রাখা সম্ভব হবে না। তিব্বতীরা পরাজয় একরকম মেনেই নিয়েছে।

১৯৫০ সালের ৭ অক্টোবর তিব্বত সীমান্তের ছয় জায়গায় একসঙ্গে হামলা চালাল রেড আর্মি। এই প্রথম সংঘাত শুরু হলো তিব্বতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লাসায় খবরটা পৌঁছাল দশদিন পর। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে যখন তিব্বতীরা মারা যাচ্ছে, তখন লাসায় চলছে আনন্দ উৎসব। এখনও লাসার মানুষ আশা করছে যে অলৌকিক কিছু ঘটবে, এবং যুদ্ধ হবে না।

প্রথম পরাজয়ের খবর পাওয়ার পর তিব্বত সরকার বিখ্যাত সব পুরোহিতকে লাসায় আসতে বললেন। নরবুলিংকায় নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হলো। বিভিন্ন আশ্রমের প্রধান আর প্রবীণ সন্ন্যাসী পুরোহিতদেরকে অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন প্রয়োজনের সময় প্রস্তুত থাকেন। দালাই লামার উপস্থিতিতে পুরোহিতরা ভবিষ্যৎ বলতে পারেন এমন সন্ন্যাসীদের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ ভিক্ষা চাইছেন পুরোহিতরা।

এই সময় রাষ্ট্রীয় পুরোহিত ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দালাই লামার সামনে দড়াম করে পড়ে গিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'তাঁকে রাজা বানাও!'

অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও একই কথা বলছেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল দালাই লামাকে সিংহাসনে বসাবার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

ইতিমধ্যে চিনা সেনাবাহিনী তিব্বতের কয়েকশ' মাইল ভিতরে ঢুকে পড়েছে। আত্মসমর্পণ করেছেন কয়েকজন তিব্বতী কমান্ডার। এরকম শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে ঠেকানোর ক্ষমতা তাঁদের নেই—এটা বুঝতে পেরে বাকি কমান্ডাররাও হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

পুব তিব্বতের সরকারপ্রধান লাসায় অয়ারলেস সেটে ম্যাসেজ পাঠিয়ে চিনা সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার অনুমতি চাইলেন। তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করল জাতীয় পরিষদ। কিছুক্ষণ পর খবর পাওয়া গেল তাঁর অস্ত্রভাণ্ডার উড়িয়ে দিয়েছে চিনারা।

BanglaBook.org

আর কোনও উপায় না থাকায় ইংরেজ রেডিও অপারেটর ফোর্ডকে নিয়ে লাসায় পালাবার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। কিন্তু খুব বেশিদূর যেতে পারলেন না তাঁরা। দুদিন পর চিনা সেনাবাহিনী তাঁদের আটক করল।

তিব্বতের জাতীয় পরিষদ এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য জরুরি আবেদন জানাল ইউ.এন.ও-র কাছে। বলল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তিব্বতে হামলা করা হয়েছে। অজুহাত হিসাবে লালচিনের সেনাবাহিনী বলছে, তিব্বতে সাম্রাজ্যবাদী কোনও শক্তিকে তারা মেনে নেবে না। কিন্তু বিশ্ববাসী জানে, তিব্বত বৈদেশিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এখানে কখনোই কোনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সমর্থন করা হবে না। এখানকার মানুষ সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবে বিশ্বাসী নয়। পৃথিবীতে কোনও জাতি যদি ইউ.এন.ও-র সাহায্য আশা করতে পারে, তবে সেটা তিব্বত।

এই আবেদনে কোনও কাজই হলো না। জাতীয় পরিষদের আবেদনকে অগ্রাহ্য করল ইউ.এন.ও। শুধু বলল, তারা আশা করে তিব্বত আর চিন একটা শান্তিচুক্তিতে আসবে।

ইতিমধ্যে সবচেয়ে বোকা মানুষটাও বুঝে গেছে বাইরে থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না। খুব শিগগিরই তিব্বত তার স্বাধীনতা হারাবে। জিনিস-পত্র গোছগাছ শুরু করেছে সবাই। আমার আর আফশেনেইটরের সময়ও শেষ হয়ে এসেছে। চলে যাওয়ার কথা ভাবলেই তিক্ততায় ভরে যাচ্ছে আমাদের মন। কিন্তু যেতে তো হবেই।

তিব্বত আমাদেরকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজ পেয়েছি। আমরাও মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলাম সে-সব কাজে। পড়াতে গিয়ে দালাই লামার সঙ্গে বন্ধুর মতো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। বিভিন্ন ইউরোপিয়ান পত্রিকায় দাবী করা হয়েছে আমরা নাকি তিব্বতী সেনাবাহিনীর নানারকম কাজে জড়িত ছিলাম। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বানোয়াট। আমরা কখনোই তিব্বতী সেনাবাহিনীর সঙ্গে জড়িত ছিলাম না।

আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে দালাই লামা খুব দুশ্চিন্তা করছেন। তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করলাম আমি। তিনি বললেন, এখনই চলে যাওয়া উচিত আমাদের।

অনেক আগে থেকেই চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম আমি। এখন দালাই লামার সমর্থন থাকায় নির্ভয়ে পথ চলতে পারব। কারও বাধার মুখে পড়তে হবে না আমাকে। কিছুদিনের মধ্যেই দালাই লামা পোটালায় চলে যাবেন। সেখানে আমার কাছে পড়ালেখা করার সময় পাবেন না তিনি। আমার প্ল্যান হচ্ছে প্রথমে দক্ষিণ তিব্বতে গিয়ে শিগাসটি শহরটা দেখব। তারপর সেখান থেকে চলে যাব ইন্ডিয়া।

এই সময় সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল দালাই লামা লাসায় থাকবেন, নাকি পালিয়ে যাবেন। কঠিন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আগের দালাই লামা কী করেছেন সেটা অনুসরণ করা হয়। সবারই মনে আছে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে চিনা আক্রমণ শুরু হওয়ার আগেই তেরোতম দালাই লামা লাসা ছেড়ে পালিয়েছিলেন। তাঁর জন্য সেটা ভালোই হয়েছিল।

কিন্তু চোদ্দতম দালাই লামার কী করা উচিত? সে সিদ্ধান্ত সরকারের একার পক্ষে নেয়া সম্ভব নয়। বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রেও ভাগ্য পরীক্ষা করা হলো দালাই লামার। একটা

BanglaBook.org

কাগজে 'হ্যাঁ' আরেকটা কাগজে 'না' লিখে লটারি করা হলো। জিতল 'হ্যাঁ' লেখা কাগজ। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো দালাই লামা লাসা ছেড়ে চলে যাবেন।

দালাই লামার প্ল্যান কী সেটা জানার জন্য আরও কিছুদিন লাসায় থাকার ইচ্ছে আমার। তা ছাড়া এই দুঃসময়ে তাঁকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু লাসা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য দালাই লামা রীতিমতো আমার ওপর জোর খাটাচ্ছেন। দক্ষিণে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে, এই কথা বলে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন তিনি।

যাই হোক, যত দ্রুত সম্ভব দালাই লামার যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হলো। মানুষজন যাতে জানতে না পারে সেজন্য সবকিছুই করা হচ্ছে খুব গোপনে। চিনারা এখনও পুব লাসার চেয়ে কয়েকশ' মাইল দূরে আছে। খবর পাওয়া গেছে ওখানেই থেমে আছে তারা। কিন্তু হঠাৎ তারা যাত্রা শুরু করলে লাসায় আসতে খুব বেশি সময় লাগবে না। সেক্ষেত্রে দালাই লামা দক্ষিণে পালাবার সুযোগ পাবেন না।

প্রতিদিন মালপত্রে বোঝাই করা একের পর এক ক্যারাভ্যান দালাই লামার দেহরক্ষীরা কড়া পাহারায় শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যতই চেষ্টা করা হোক, এটা কোনওভাবেই গোপন করা সম্ভব নয়। দালাই লামা যে লাসা ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন সেটা আর কারও কাছে অজানা রইল না। এখন অভিজাতশ্রেণীর মানুষদের মধ্যেও আর কোনও পিছুটান নেই। তাঁরাও তাঁদের পরিবার আর সম্পদ নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিচ্ছেন।

বাইরে থেকে লাসার জীবনযাত্রা স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। মালিকরা তাদের ভারবাহী পশুগুলোকে নিজের কাজে ব্যবহার করায় পরিবহন ব্যবস্থায় কিছুটা বিশৃঙ্খলা চোখে পড়ছে। বাজার দর সামান্য বেড়েছে।

এখনও বিভিন্ন জায়গা থেকে তিব্বতী সৈনিকদের দুঃসাহসিক যুদ্ধের খবর আসছে। কিন্তু তাতে কেউই খুব একটা খুশি হচ্ছে না। কারণ সবাই জানে কিছুদিনের মধ্যেই তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

তেরোতম দালাই লামার সময়, ১৯১০ সালে, চিনারা লাসায় এসে লুট আর অগ্নিকাণ্ডে মেতে উঠেছিল। আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে, এই ভয়ে লাসাবাসী আতঙ্কে দিশেহারা। তবে এখানে বলে রাখা ভালো, এবারের যুদ্ধে যথেষ্ট সংযম আর শৃঙ্খলার পরিচয় দিচ্ছে চিনা সেনাবাহিনী। কিছু তিব্বতীকে কয়েকদিন আটকে রাখার পর ছেড়ে দিয়েছে তারা। ছাড়া পাওয়ার পর তারা সবাই বলল, চিনা সেনাবাহিনী তাদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছে।

BanglaBook.org

ষোল

বিদায় তিব্বত

বিদায় লাসা / দালাই লামা পালালেন / যুদ্ধবিরতির শর্ত / তিব্বতে আমার শেষ দিন / পোটালায় কালো মেঘ

১৯৫০ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি লাসাকে বিদায় জানাই আমি। তবে চলে যাওয়ার আগে কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে ছিলাম। একটা নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগ পেয়ে যাওয়ায় আর দেরি করলাম না।

আফশেনেইটরও আমার সঙ্গে যাবে বলে ঠিক করেছে। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে মনস্থির করতে পারছিল না ও। ওকে কয়েকদিন পর আসতে বলে ওর ব্যাগটা নিয়ে আমি রওনা হয়ে গেলাম।

লাসা ছেড়ে চলে যেতে কতটুকু খারাপ লাগছে সেটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। এতদিন যে বাসায় ছিলাম সেটা আমার নিজের বাড়ি বলে মনে হচ্ছে। চলে আসার ঠিক আগের মুহূর্তে চাকররা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকল। সবাই মাথা নিচু করে আছে, চোখে পানি।

নিজস্ব কিছু বই এবং টাকা ছাড়া বাকি সবকিছু ওদের জন্য রেখে যাচ্ছি আমি। রাস্তায় রাস্তায় আমার জন্য উপহার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধুরা। তাদেরকে একটু সময় দেওয়ার জন্য কিছুটা ধীরগতিতে এগোতে হচ্ছে। দক্ষিণ তিব্বতে যাওয়ার পর আবার হয়তো বন্ধুদের দেখতে পাব। আমার এই চিন্তা অনেকটা নিজেকে মিথ্যে প্রবোধ দেওয়ার মতো।

আমার বন্ধুদের অনেকেই বিশ্বাস করে চিনা সেনাবাহিনী লাসা পর্যন্ত আসবে না। তাই তাদের আশা, আমি চলে যাওয়ার পর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আবার একদিন লাসায় ফিরে আসতে পারব। কিন্তু আমার মনে সেরকম কোনও আশা নেই। তাই শেষবারের মতো আমার পছন্দের কিছু জায়গায় ঘুরলাম। একদিন ক্যামেরা হাতে একের পর এক ছবি তুললাম। ভবিষ্যতে কোনও এক সময়ে এই ছবিগুলো দেখলে পুরনো সুখময় স্মৃতিগুলো আমার মনে ফিরে আসবে। আর অন্য অনেকে হয়তো ছবি দেখে এই সুন্দর

BanglaBook.org

আর আশ্চর্য শহরটার জন্য সহমর্মিতা বোধ করবে।

লাসাকে বিদায় জানিয়ে বোটে চড়লাম আমি। কোইচু নদী হয়ে ব্রহ্মপুত্রের মোহনা পর্যন্ত যাব। কমবেশি ছ'ঘন্টার পথ। কিন্তু স্থলপথে গেলে কমপক্ষে দুদিন সময় লাগত। আমার ব্যাগেজ অবশ্য স্থলপথেই যাচ্ছে।

বোট ছেড়ে দিয়েছে। বন্ধু আর চাকররা তীরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে আমার উদ্দেশে। ক্যামেরা তৈরিই ছিল। তড়িঘড়ি একটা ছবি তুলে ফেললাম। এই সময় স্রোতের টানে হঠাৎ দ্রুত এগোতে শুরু করল বোট। তীরে দাঁড়িয়ে থাকা চাকর আর বন্ধুরা ধীরে ধীরে দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে গেল।

এখনও পোটালা রাজপ্রাসাদ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। এক মুহূর্তের জন্যও চোখ সরাতে পারছি না ওদিক থেকে। জানি চোখে টেলিস্কোপ সেঁটে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন দালাই লামা।

সেদিনই স্থলপথ ধরে আসা আমার ক্যারাভ্যানের দেখা পেলাম। চাকর আর আমার জন্য দুটো ঘোড়া দেওয়া হয়েছে। এরপর পায়ে হেঁটে এগোতে হবে। নইমি আমার সঙ্গে থাকার জন্য জেদাজেদি শুরু করল। অনেকদিন পর আবার পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পার হচ্ছি। এক সপ্তাহ টানা হাঁটার পর জ্ঞানেৎসি পৌঁছালাম। জ্ঞানেৎসির প্রশাসক বাড়ির একজন অতিথি হিসাবে আমাকে স্বাগত জানালেন। দালাই লামার সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে বিশাল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হলো। কিছুক্ষণের জন্য হলেও তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভুলে আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে উঠল তিব্বতীরা।

সবকিছুই হলো, কিন্তু দেরি করে। দালাই লামা খুব খারাপ সময়ে ক্ষমতা পেয়েছেন। ভাগ্যের সহায়তা পাওয়া তো দূরের কথা, নিয়তি যেন তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ মাসেই তিব্বতের দ্বিতীয় বড় শহর শিগাসটি দেখতে গেলাম আমি। শহরটা বিখ্যাত ট্র্যাসহিলোহুনপো নামের একটা আশ্রমের জন্য। এই এলাকার মানুষ পালাবার কথা চিন্তা করছে না। কারণ ওই আশ্রমের প্রধান হচ্ছেন প্যানচেন সন্ন্যাসী।

চিনারা এই বহুবছর ধরে প্যানচেন সন্ন্যাসীকে দালাই লামার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সমর্থন জানিয়ে আসছে। ইনি বর্তমান দালাই লামার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। লেখাপড়া শিখেছেন চিনে। একদিন হঠাৎ পিকিং থেকে তাঁকে তিব্বতের শাসক হিসাবে ঘোষণা করা হলো।

বাস্তবে তিব্বতের শাসক হওয়ার কোনও অধিকারই তাঁর ছিল না। তিনি শুধু ট্র্যাসহিলোহুনপো আশ্রম আর এর জমির দাবিদার হতে পারেন, তার বেশি কিছু নয়।

শিগাতসে যাওয়ার পথে আশ্রমটা দেখার জন্য থামলাম। এখানে আরেকটা বড় শহরের দেখা পেলাম আমি। কয়েক হাজার সন্ন্যাসী বসবাস করেন এই শহরে। সবার

BanglaBook.org

অলক্ষ্যে কিছু ছবি তুললাম আমি। একটা বৌদ্ধবিহারে ঢুকে আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। সোনার পাত দিয়ে গিলটি করা একটা বিশাল মূর্তি দেখতে পেলাম। মূর্তিটার উচ্চতা হবে নয়তলা বিল্ডিংয়ের সমান।

শিগাতসে শহরটা লাসার চেয়ে একটু উঁচুতে। লাসার তুলনায় ঠাণ্ডা এখানে বেশি। দেশের সবচেয়ে ভালো শস্য ফলে শিগাতসেতে। দালাই লামা আর লাসার অভিজাতশ্রেণীর মানুষ এখান থেকেই তাঁদের আটা, ময়দা ইত্যাদি কেনেন।

কিছুদিন পর গাইনেসটি যাওয়ার ফিরতি পথ ধরলাম। সেখানে পৌঁছাতেই শুনলাম দালাই লামা গাইনেসটি হয়ে তাঁর গন্তব্যে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ায় শহরে হইচই শুরু হয়ে গেছে। দালাই লামার আগমন উপলক্ষে রাস্তা-ঘাট সব ঠিক করা হচ্ছে। কোথাও কোনও খুঁত রাখা চলবে না। ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি দালাই লামা ১৯ ডিসেম্বর লাসাকে বিদায় জানিয়েছেন। এই মুহূর্তে তিনি এদিকেই আসছেন।

জ্ঞানেৎসি হয়ে যাওয়ার সময় দালাই লামার মা, বোন আর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো আমার। দালাই লামার সঙ্গে শুধু লবস্যাঙ আছে।

দালাই লামার পরিবারের কাফেলা খুব সাধারণ। মহীয়সী মাতাকে পালকি দেওয়া হলেও সেটাতে তিনি চড়ছেন না। আর সবার মতো ঘোড়ায় চড়ে এগোচ্ছেন। আমি আর স্থানীয় প্রশাসক দালাই লামার সঙ্গে দেখা করার জন্য রওনা হলাম। আমরা যাত্রা শুরু করার আগেই মহীয়সী জননী তাঁর ছেলেমেয়ে আর চাকরদের নিয়ে দক্ষিণদিকে রওনা হয়ে গেলেন।

লাসার রাস্তা বরাবর তিন দিন হাঁটার পর কারো পাসে পৌঁছালাম আমরা। এখানে দালাই লামার অগ্রবর্তী কাফেলার সঙ্গে দেখা হলো। গিরিপথ দিয়ে এগোবার সময় নিচে কাফেলার বিশাল লম্বা সারি দেখতে পেলাম। দালাই লামার কাফেলার চল্লিশজন অভিজাতশ্রেণীর মানুষ এবং মেশিনগান ও ছোট পিস্তলসহ বাছাই করা দুশ' গার্ড আছে। চাকর আর রাঁধুনিরা পিছনে। সব শেষে আছে দেড় হাজার ভারবাহী পশু।

কাফেলার মাঝখানে দুটো পতাকা উড়ছে। একটা তিব্বতের জাতীয় পতাকা, আরেকটা দালাই লামার ব্যক্তিগত ব্যানার। এই পতাকা দুটো দেখে বোঝা যায় কাফেলার সঙ্গে তিব্বতের শাসক আছেন।

ধূসর রঙের একটা ঘোড়ায় চড়ে গিরিপথ দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে আসছেন দালাই লামা। তাঁকে দেখে প্রাচীন একটা ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে পড়ে গেল আমার। লাসাবাসী প্রায়ই নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে এটা নিয়ে আলোচনা করত।

একজন পুরোহিত অনেক আগে ঘোষণা করেছিলেন, তেরোতম দালাই লামাই হবেন সর্বশেষ। এখন আমার মনে হচ্ছে পুরোহিত ঠিকই বলেছিলেন। চার সপ্তাহ পার হয়ে গেছে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, কিন্তু এখনও ক্ষমতার লাগাম হাতে

BanglaBook.org

নিতে পারেননি। শত্রুবাহিনী দেশ দখল করে নেওয়ায় দালাই লামা চলে যাচ্ছেন।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়; দেশ ছেড়ে তাঁকে পালাতে হচ্ছে, এটা তাঁর দুর্ভাগ্যের প্রথম ধাপ। সামনে আরও কত কী বিপদ যে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে কে জানে!

আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে সম্মান জানাতে হ্যাট খুলে ফেললাম। তিনিও আমার উদ্দেশে হাত নাড়লেন। দালাই লামাকে শুভেচ্ছা জানাবার জন্য গিরিপথের ওপরে ধূপ পোড়ানো হচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ একটা বিস্ফোরণে প্রার্থনা পতাকাগুলো নড়ে উঠল। দেরি না করে পরবর্তী যাত্রাবিরতিতে গিয়ে থামল কাফেলা। সেখানে ভ্রমণকারীদের জন্য গরম খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা প্রতিবেশী আশ্রমে দালাই লামা রাত কাটালেন।

আমিও ঘুমাবার প্রস্তুতি সেরে ফেললাম। ভাবছি কী একটা খারাপ পরিবেশেই না রাত কাটাতে হচ্ছে দালাই লামাকে। হয়তো কিছু নোংরা, ধুলো-মাখা মূর্তির সঙ্গ পাচ্ছেন তিনি। ওরকম একটা আশ্রমের অতিথি-ঘরে এরচেয়ে ভালো কিছু কী আর থাকতে পারে। আশ্রমের জানালাগুলো কাগজ দিয়ে মোড়া। ঠাণ্ডা আর ঝড়ের বিরুদ্ধে ওগুলো কতটুকু কাজে আসবে সেটা সহজেই অনুমেয়। নিজেকে গরম রাখার জন্য কোনও স্টোভও পাবেন না তিনি।

দালাই লামা তাঁর ছোট্ট জীবনে পোটালা আর জুয়েল গার্ডেন ছাড়া আর কোথাও থাকেননি। এখন নিয়তি তাঁকে নিয়ে খেলা করায় কিছুটা হলেও নিজের দেশ সম্পর্কে জানতে পারছেন তিনি।

বিপদের ওপর বিপদ। হঠাৎ জানতে পারলাম দালাই লামার ভাই লবস্যাঙের হার্ট অ্যাটাক করেছে। তাঁর অবস্থা খুবই শোচনীয়।

অসুস্থ ঘোড়াকে সুস্থ করে তুলতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় লবস্যাঙের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যবস্থা নিয়েছেন ডাক্তাররা। শুনে আঁতকে উঠলাম আমি। যাত্রা শুরুর দিন তিনি কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন। এই সময় দালাই লামার ব্যক্তিগত ডাক্তার এসে অদ্ভুত পদ্ধতিতে তাঁর জ্ঞান ফেরান। পশুদের গায়ে চিহ্ন দেওয়ার জন্য যেভাবে লোহা গরম করে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়, লবস্যাঙকেও ঠিক সেইভাবে ছ্যাঁকা দিয়ে জাগানো হয়।

দালাই লামা পালাচ্ছেন, এটা সবার কাছেই গোপন রাখা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ চায়নি জনগণ বিরক্ত হোক, তা ছাড়া তাঁরা ভয় পাচ্ছিলেন খবরটা ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন আশ্রমের সন্ন্যাসী দালাই লামার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করবেন। দালাই লামাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য অফিসের উচ্চপদস্থ কিছু কর্মকর্তাকে বাছাই করা হয়েছে। যাত্রা শুরুর আগের দিন রাতের বেলা তাঁদেরকে জানানো হয় যে পরদিন দুপুর দুটোর সময় দালাই লামা রওনা হবেন।

নীরবে পোটালে থেকে বেরিয়ে রওনা হলেন তাঁরা। প্রথম যাত্রবিরতি নেওয়া হয়

BanglaBook.org

নরবুলিংকায়। সেখানে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করলেন দালাই লামা। পুরো একটা দিন পার হওয়ার আগেই তাঁর পালোনোর খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। জাং আশ্রমের কয়েক হাজার সন্ন্যাসীর বাধার মুখে পড়তে হলো দালাই লামাকে। তারা দালাই লামার ঘোড়ার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। বলছেন তিনি চলে গেলে তাঁরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়বেন। তখন চিনাদের দয়া-মায়ার ওপর নির্ভর করে চলতে হবে তাঁদের। কোনওভাবেই দালাই লামাকে যেতে দিতে রাজী না তাঁরা।

কর্মকর্তারা ভয় পেলেন এখানেই বুঝি দালাই লামাকে থেমে যেতে হবে। এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে মানসিক দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিলেন দালাই লামা। সন্ন্যাসীদেরকে বোঝালেন, শত্রুদের হাতে না পড়লে দেশের জন্য অনেক ভালো কিছু করতে পারবেন তিনি। তাই পরিস্থিতি বিবেচনায় এখন তাঁর চলে যাওয়াই উচিত। সঙ্গে আরও যোগ করলেন, চিনের সঙ্গে একটা সুবিধাজনক চুক্তি করেই যত দ্রুত সম্ভব আবার তিব্বতে ফিরে আসবেন। তাঁর কথা মেনে নিয়ে পথ ছেড়ে দিলেন সন্ন্যাসীরা।

যাই হোক, ইতিমধ্যে গাইনেসটিতে দালাই লামার আসার খবর ছড়িয়ে পড়েছে। অশুভ আত্মাকে দূরে রাখার জন্য রাস্তার পাশে ছোট ছোট সাদা পাথর বিছানো হয়েছে। সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী আর হাজার হাজার সাধারণ মানুষ তাঁকে শুভেচ্ছা জানাবার জন্য অপেক্ষা করছেন। এখান থেকে কিছুদূর গেলেই ভারতীয় সৈন্যদের দেখা পাওয়া যায়। তারাও দালাই লামাকে সম্মান জানাবার জন্য এসেছে। এরপর বড় কোনও জায়গায় গেলেই কাফেলাটা বিশাল একটা মিছিলের আকার ধারণ করছে।

ধূলিঝড় এড়াবার জন্য মাঝরাতের পর আমাদের যাত্রা শুরু করতে হচ্ছে। কিন্তু রাতে আবার প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ছে। দালাই লামা সিল্কের চাদর দিয়ে শক্ত করে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। শিয়ালের চামড়া দিয়ে তৈরি একটা ক্যাপ তাঁর মাথা আর কান ঢেকে রেখেছে।

অধ্যক্ষরা কেউ সাহায্য করার আগে দালাই লামা নিজেই ঘোড়া থেকে নেমে দ্রুত পা চালিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন।

লাসা থেকে চলে আসার ষোলদিন পর চুমবি পৌঁছালাম আমরা। এখানে চুমবির জেলা সরকারের হেডকোয়ার্টার আছে। দালাই লামাকে একটা হলুদ চেয়ারে করে গভর্নরের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো।

কর্মকর্তারা সবাই কৃষকদের বাড়িতে চলে গেলেন। এখানে তাঁদেরকে নিজেদের আরাম-আয়েশের কথা ভুলে থাকতে হবে। দালাই লামার সঙ্গে প্রত্যেক সরকারী অফিসের একজন করে প্রতিনিধি আছেন।

খুব শিগগির একটা অস্থায়ী সরকার গঠন করা হলো। সরকারী সব কাজ রুটিন অনুসারে হচ্ছে। এমন কি মাঝে-মধ্যে মিটিংও হচ্ছে। কুরিয়ারের সাহায্যে লাসার সঙ্গে এই অস্থায়ী সরকারের যোগাযোগ স্থাপন করা হলো। দালাই লামা সঙ্গে করে সিল নিয়ে

BanglaBook.org

এসেছেন। এই সিল দিয়ে লাসা কর্তৃপক্ষের নেওয়া সিদ্ধান্তকে বৈধতা দিচ্ছেন তিনি। বার্তবাহকেরা অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে খবর আনা-নেওয়া করছে। তাদের মধ্যে একজন প্রায় ৫০০ মাইল পথ পাড়ি দিল মাত্র নয় দিনে। বার্তাবাহকেরা মূলত লাসায় গিয়ে চিনের সর্বশেষ অবস্থান সম্পর্কে জানছে। কিছুদিন পর যন্ত্রপাতিসহ চুমবিতে এলেন ফক্স। তাঁর সাহায্যে একটা রেডিও স্টেশন স্থাপন করা হলো।

অফিসারদের বউ-বাচ্চাদের ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। চুমবিতে তাদের থাকার জায়গা নেই।

একজন অফিসার বন্ধুর অতিথি হিসাবে আমি চুমবিতে আছি। এখানে আমার তেমন কোনও কাজ নেই। কিন্তু কোনওভাবেই বন্ধুকে বিদায় জানাতে পারছি না আমি। নিজেকে একটা নাটকের দর্শক বলে মনে হচ্ছে আমার। নাটকের শেষ পরিণতি যে এমন করুণ হবে সেটা আমি আগে থেকেই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। এখন চুমবিতে বসে নিরুপায় হয়ে নাটকের শেষ দৃশ্যটা দেখার অপেক্ষায় আছি।

ছোট্ট একটা অফিসিয়াল কাজ অবশ্য আমাকে করতে হচ্ছে। অয়ারলেস সেট থেকে পাওয়া বিভিন্ন খবর ফরেন মিনিস্ট্রিতে পাঠাচ্ছি আমি। একদিন জানতে পারলাম চাইনিজরা আর এগোচ্ছে না। তারা এখন তিব্বতী সরকারকে পিকিং-এ আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সেখানে বসে একটা সমঝোতায় আসতে চায় তারা।

দালাই লামা আর সরকারের কর্তাব্যক্তিরা আলোচনা করে ঠিক করলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী একটা প্রতিনিধি দলকে পিকিং-এ পাঠানো হবে।

চিনাদের আক্রমণ ঠেকাবে, এমন প্রতিরোধ ব্যবস্থা তিব্বতের নেই। কাজেই সরকার দালাই লামাকে তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করছে। তারা জানে চিনাদের মূল ভয় দালাই লামার তিব্বতে ফিরে আসা নিয়ে। সর্বস্তরের জনগণের প্রতিনিধিরা চুমবিতে এসে দালাই লামাকে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করছে। পুরো তিব্বত এখন হতাশায় ডুবে আছে। দালাই লামার প্রতি জনগণের নিখাদ ভালোবাসা দেখে বুঝতে পারলাম শাসকের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কত গভীর। দালাই লামার আশীর্বাদ ছাড়া তিব্বতের উন্নতি নেহাত কষ্টকল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

শেষ পর্যন্ত কোনও উপায় না দেখে চিনাদের শর্ত অনুসারে লাসায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন দালাই লামা। দীর্ঘ আলোচনার পর পিকিং-এ দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। চুক্তি অনুসারে দালাই লামা দেশের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবেন। তিব্বতীদের ধর্মকে সম্মান দেখানো হবে এবং প্রার্থনাকারীদের স্বাধীনতায়ও চিনারা হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। উত্তরে চিনারা বলল, তিব্বতের বৈদেশিক সম্পর্ক আর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। সেই সঙ্গে তিব্বতে যত ইচ্ছা সৈন্য পাঠাবার অধিকারও দিতে হবে তাদেরকে।

চুমবি উপত্যকায় ১৯৫১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত থাকলাম আমি। তারপর সিদ্ধান্ত

BanglaBook.org

নিলাম ইন্ডিয়ায় চলে যাব। লাসায় ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যাই হোক, এখনও আমি তিব্বত সরকারের একজন কর্মকর্তা। তাই চলে যাওয়ার আগে আমাকে অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে।

মন্ত্রীসভার সুপারিশে ছয় মাস মেয়াদী একটা পাসপোর্ট দেওয়া হলো আমাকে। সেখানে ইন্ডিয়ান সরকারের উদ্দেশে বলা হয়েছে তিব্বতে ফিরে আসতে চাইলে আমাকে যেন সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়। কিন্তু আর কখনোই তিব্বতে ফেরা হবে না আমার। কারণ আমি জানি আগামী ছ'মাসের মধ্যে দালাই লামা লাসায় ফিরে যাবেন। সেখানে তাঁকে চেনরিজের প্রতিনিধি হিসাবে সম্মানও করা হবে, কিন্তু শাসকের মর্যাদা আর কখনোই ফিরে পাবেন না তিনি।

এবার নিজের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমি। অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম ভারতেই যাব। আফশেনেইটরের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। সেও আমার মতো ইন্ডিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এখন না। যতদিন সম্ভব তিব্বতেই থাকতে চায় ও।

তাকে বিদায় জানাবার সময় ভুলেও ভাবিনি আগামী কয়েক বছর একে অপরকে আমরা দেখতে পাব না।

যাই হোক, ওকে বিদায় জানিয়ে কালিমপং-এ চলে এলাম। সঙ্গে আফশেনেইটরের ব্যাগেজ নিয়েছিলাম। সেটা ওখানে জমা রাখলাম।

এরপর পুরো একবছর আফশেনেইটরের কোনও খবর পেলাম না। মানুষটা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকের ধারণা আফশেনেইটর বেঁচে নেই।

ইউরোপে পৌঁছে আফশেনেইটরের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম আমি। সে এখনও তিব্বতের কাইরঙে আছে। চিনারা না আসা পর্যন্ত তিব্বতেই থাকবে বলে জানিয়েছে আমাকে।

বিষণ্ন মন নিয়ে তিব্বতকে বিদায় জানালাম। তবে মনের এই বিষণ্নতা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। তার জায়গায় দুশ্চিন্তা গ্রাস করল আমাকে। শেষ পর্যন্ত দালাই লামার কী হবে সেটা সত্যিই খুব চিন্তার বিষয়।

***

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org